যশাইতলার ঘাট

বেদুইন

যশাইতলার ঘাট

এক

হিসাবটা বঙ্গাব্দের। তখন ইংরেজি বছর গণনা প্রচলন ছিল না। মুসলমান সুলতান বাদশাহ ও নবাবরা হিজরী সনের হিসাব করত চান্দ্রমাস অনুসারে, সাধারণ মানুষ সাল-সন হিসাব করত বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত সৌর মাস অনুসারে। সেটাই হল বঙ্গাব্দ।

সেটা ছিল এগারশত উনপঞ্চাশ সাল।

বাংলার নবাব সুজা খাঁ গতায়ু, পুত্র সরফরাজ খাঁ গিরিয়ার মাঠে নিহত হয়েছেন। নবাবী তক্তে বসেছেন আলিবর্দী খাঁ। মারাঠার আক্রমণে বাংলার নবাব-নাজিম তথা সুবেদার আলিবর্দীর রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে। বাংলার নরনারী ও নবাব নাজিম উদ্বাস্ত।

যশাইগাছের কাহিনী সেদিনের আবছা ইতিহাসের পাতায় হয়ত সামান্য উল্লেখ আছে। ছোট একটা সোঁতার ধারে যশাইগাছ। সবাই বলে যশাইয়ের ঘাট। এই ঘাটেই এই কাহিনীর উৎপত্তি।

আরও দুশো বছর অতিক্রান্ত। এই দুশো বছরের ইতিহাস যেমন করুণ তেমনি বিচিত্র। বাংলার বুকের ওপর দিয়ে সহস্র সহস্র পরিবর্তন চলে গেছে। নবাবী আমল লোপ পেয়ে ইংরেজ কোম্পানীর আমল এসেছে, কোম্পানী পাততাড়ি গুটিয়ে মহারানীর হাতে তুলে দিয়েছে বাংলার ভাগ্য। অনেক এসেছে, অনেক গেছে কিন্তু যশাই যেমন ছিল তেমনিই আছে। এর অতীত ও পুরাতন ইতিবৃত্ত যে কি তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। বংশ পরম্পরায় শোনা কথা উপকথার মত ছড়িয়ে রয়েছে আশে পাশের দশবিশখানা গাঁয়ে। বোধহয় পদ্মার ভাটিতেও নেমে গেছে যশাইয়ের গরিমা—বাংলার শেষ প্রান্ত অবধি।

ঘাট থাকলে ঘাটোয়াল থাকে।

ঘাটোয়াল শওকত বেপারি। পদ্মার ছোট সোঁতায় পারাপারের ইজারাদার। ঘাটের মালিক শহরের কোন বড় জমিদার। ইজারাদারী দেয় স্থানীয় নায়েব নিতাই দাস। নিতাই দাসের কিছু দুর্বলতা আছে শওকতের জন্য। বিশেষ করে শওকতের সততা ছিল মূলধন।

নৌকা লাগল যশাইতলার ঘাটে।

সাঁঝের আবছা আঁধারে যশাইতলার জামগাছের ঝোপে বোশেখীর কালো মেঘের মত ঘুরঘুট্টি আঁধার জমেছে। পাশের মানুষকেও চেনা যায় না। কাশবনের মাঝখানটায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো জামের কয়েক গণ্ডা গাছ, কেউ কোনদিন যত্ন করে চাষ করেনি, গাছও লাগায়নি, আপনা থেকে ফেলে দেওয়া বিচি

থেকে বেরিয়েছে অজানা দিনে। মহাকালের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃশব্দে। সোঁতার জলে আঁধার রাতেও আকাশের তারাগুলো চিকমিক করে। তাকে ঢেকে দেয় গাছের ছায়া। সোঁতার পেছনের ঝোপ বাদারের ওপাশটার গ্রামের সবচেয়ে উঁচু সিমুলগাছটাও ঝাপসা হয়ে গেছে। আঁধারি রাত না হলে তার ছায়া এসে পড়ে সোঁতার দক্ষিণকোণায় সজাগ প্রহরীর মত।

নৌকা ভিড়তেই কাস্মু লাফিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়।

শওকত ছইয়ের ভেতর থেকে মুখ উঁচিয়ে হেঁকে উঠল, গড় করিস কাস্মু। ভুলিস না।

এর মধ্যে কাস্মু মিলিয়ে গেছে যশাইতলার ঝোপের ওধারে। শুধু ক্ষীণ জবাব ভেসে এল, হু।

কাস্মুর জবাবটা ঠিকমত শওকতের কানে পেঁছাল কিনা বোঝা গেল না। সে শুধু নিজের মনে বিড়-বিড় করে কি যেন বলতে থাকে। তার বড় ভয়, এই সব এলেমদার বুঝনদার ছেলেদের নিয়ে। ওরা পীর-দরগা, দেবতা কিছুই মানতে চায় না। শওকতও তো তা পারে না। সে নিজের চোখে দেখেছে লতিফ মিঞার বেহাল। লতিফ মক্তব-মাদ্রাছায় পড়ে এলেমদার হয়েছিল, ভেবেছিল দুনিয়াটা বুঝি তার ধলাট গাঁয়ের চৌহদ্দি। দুনিয়াটা যে অনেক বড়। অনেক কিছু জানা বাকি তা সে গ্রাহ্য করত না। চাষার ছাওয়াল, এলেমদার হয় কোথায় হবি হাফিজ ক্কারি, তা নয় হতে গেল মুছুন্দি। একেই বলে বদ-নসিব।

খাগের কলম কানে গুঁজে শহরের আদালতে যেত, বটতলায় মুহুরীগিরি করত, তার সঙ্গে আসত নগদানগদ কড়ি। হঠাৎ গাঁয়ে এসে ফতোয়ার দিল, যশাই হিঁদুর ঠাকরেণ, মুসলমানের শিন্নি চড়ানো গুনাহ।

চ্যাংড়া-ছোঁড়ার দল জুটল। তারা নেচে উঠল লতিফের ফতোয়াতে। নানা-গাঁয়ের মুরুব্বী মোড়ল ডেকে ওয়াজ করল নিজের স্বপক্ষে। কেউ বুঝল না। যারা বুঝল তারাও ভাবল অনেক, যারা বুঝল না তারা লতিফকে বিশ্বাস করল না। কিন্তু যশাইয়ের শিন্নি বন্ধ হল না। কেউ সাক্ষাতে কেউ অসাক্ষাতে পাল পরবে শিন্নি চড়াতে ত্রুটি করত না। লতিফ মনে মনে গর্জায়, ছোঁড়ার দল তড়পায়, তবুও যশাইতলায় ভীড় জমে, শিন্নি বন্ধ হয় না।

লতিফ চুপ করে থাকার লোক নয়। সেও তক্কে তক্কে ছিল। সেদিন ফইম চৌকিদারের বিধি নুরীর সাথে মুখোমুখি দেখা। তার নাতির আঁখিকা, মানত আছে, তাই শিন্নি চড়াতে যাচ্ছিল। পড়বি তো পড় একেবারে লতিফের সামনে। যুক্তি তর্কের ধার ধারে না নুরীবিবি, তার বিশ্বাস ছিল অটুট, লতিফও ছাড়বার বান্দা নয়। যুক্তির চেয়ে শক্তি বড়। শরা-শরীরত আর হদিসের অবোধ্য শব্দগুলো যখন নুরীর মনস্পর্শ করতে পারল না তখন শিন্নির মালসা ছিনিয়ে নিল লতিফ। জুতো দিয়ে মালসা গুঁড়িয়ে দিল।

নুরীবিবি ঘরে ফিরল কাঁদতে কাঁদতে। সেই রাতেই লতিফ শহর থেকে ফিরল ভেদবমি নিয়ে। রাত না পোহাতে লতিফের জানমালের পর্বশেষ। সবাই বুঝল

যশাইয়ের দয়া। যশাই জাগ্রত দেবী, কারও খাস মহলের প্রজা নয়, সবার দেবতা, হিন্দু মুসলমানের এমন কি পিরজিপাড়ার সাওতাল কেরেস্তানদেরও।

শওকত নিজের চোখে দেখেছে। লতিফের এন্তেকাল যে কত বড় সর্বনাশ ঘটাল লতিফের ঘরে তাও জেনেছে। এরপরও যখন শোনে ফলানা গাঁয়ের ফলানা লোক যশাইয়ের শিন্নি চড়ায়নি, যশাইকে ঠাট্টা ব্যঙ্গ করেছে তখন তার বুক আপনা থেকেই কোন অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে, ভক্তিতে না হলেও,—ভয়ে।

কাম্মুর চলে-যাওয়া পথ পানে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। হুঁকোর মাথা থেকে কল্কেটা নামিয়ে শুলকাতে থাকে।

কিছুকাল থেকেই সে ভাবছে দশজনার শলা পরামর্শে কাম্মুকে মক্তব-মাদ্রাছায় না পাঠালেই ভাল হত। সেই শয়তান লতিফের মত কানে খাগের কলম গুঁজে মাঝে মাঝেই আজকাল ছয়পোয়া পথ হেঁটে শহরে যাচ্ছে। শওকত জাত মাঝি অথচ কাঠের নৌকার বৈঠা কাম্মুকে আটকে রাখতে পারেনি, ভিন্ন নৌকার হাল ধরতে তার ব্যাটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কাম্মু যেন থামতে চায় না।

শওকতের কথা সে গ্রাহ্যই করে না।

কদিন আগে একরার দিয়ে আদালতে গিয়ে নিজের নামটাও বদলে এসেছে। বাড়িতে ফিরেই শওকতকে ডেকে বলল, নাম বদল করে এলাম বা'জান।

এমন আজগুবি কথা শওকত কখনও শোনেনি। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তার দুই চোখে বিস্ময়। বার বার কাম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল তার বিশ বছরের মদ্দ জওয়ান ছেলে, কোথায় ডিঙির মাথায় সিনা উঁচিয়ে বসবে, হালের টানের গাঙের জল ছলছলিয়ে উঠবে, তা নয় তার লায়েক ছেলে শহরে গিয়ে সে কি-না নাম বদল করে এল! ঐটে যেন সবচেয়ে বড় কাজ যা না করলে তার বাপ দাদার রোজ কিয়ামতে জবাবদিহী করবার কেউ থাকত না। কিসের নাম, কার নাম আর বদলই বা কিসের। অনেক প্রশ্ন করে বসল তাকে।

নির্বিকার ভাবে কাম্মু বলল, আমার নাম। আজ থেকে আমার নাম হল কমরুদ্দিন।

কাম্মু কমরুদ্দিন হল, তাইতো।

হু, আজ থেকে লোকে বলবে, শওকত বেপারির বেটা আসল মুসলমান। কি নাম যে তুমি রেখে ছিলে, খোদা মালুম। কাম্মু! দুনিয়ার কেতাবে ও নাম কেউ লিখেছিল কি। কাম্মু, হ, দুনিয়ায় আল্লাহতাল্লা আর নাম দেয়নি তোমার মগজে!

শওকত গর্জে উঠল,—তোর বাপের দেওয়া নাম, সেটা হল বেয়া। ওরে শয়তান আল্লাহ কি তোকে বাপ-মাকে ছোট করতে বলেছে কখনও। আমাদের ছোট করে নাম পাল্টে এলি, একবার শুধাতেও তো পারতি!

বাপের মেজাজ সে ভালই জানে, কাম্মু ভয়ে চুপসে গেল। রাগ না চণ্ডাল।

কখন বৈঠা তুলে ঘা কতক বসিয়ে দেবে তারই ঠিক কি ! বেমক্কা কথা বলার শাস্তি
পাবার ভয়ে সম্মুখ থেকে হটে দাঁড়িয়ে কাম্মু যেন বেঁচে গেল। আজকাল তা
অনেক মুরুব্বি, তাদের পরামর্শে এই কাজ করলেও প্রথমে সে রাজি হয়নি
ফজলু চাচার বেটা লচ্ছু যখন তার নাম বদলে লোকমান হল তখন কাম্মু আ
থাকতে পারেনি।

শওকত ভাবতে পারে না, এত বড় অন্যায়টা তার ছেলে করল কি করে। নাম তে
নাম, নাম বদলালে তো মানুষ বদল হয় না। কাম্মু আজ কমরুদ্দিন হলেও শওকত
তার বাপ, এরফান তার দাদা, এসব কি রাতারাতি বদল হয়ে যাবে নাম বদলের
সাথে। তা যখন নয় তখন বাপ-দাদার মুখে কালি না দিলেই কি চলত না।

ছেলের চালচলন ভাবগতিক ভাল নয়। আবার কখন কি যে করবে তা বুঝ
ভার।

শওকত সাবধান হল।

রাতের বেলায় বিবি পরীজানের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ঘাটের ইজারাদারী থেকে
ঘরের বদনা পর্যন্ত সব কিছু পরীজানের নামে দানপত্র করে দিল। কাম্মুর মতিগতি
ভাল নয়, কবে কি বলবে, কি করবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। সে মরলে পরীজানের
কপালে ভাত-কাপড় জুটবে কিনা সন্দেহ।

শওকত শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ফেলে আসা দিনের কথা। সে প্রায় বিশ বছর
আগের কথা।

নাম তো সামান্য। এই নামের পেছনে রয়েছে কত বড় মিতালির ইতিহাস তা
জানে শুধু শওকত আর সরকার বাড়ির যোগিন্দর। শওকত ভেবেছিল, সরকার
বাড়ির সাথে তার পাঁচ পুরুষের সম্পর্ক মিতালির সুতো দিয়ে বাঁধলে পাঁচ পুরুষের
সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। মনের সুতোয় যা বাঁধা যায়নি, তুলোর সুতোয় তা
বাঁধা যায় না! বিশ্বাস না করলেও শেষ পর্যন্ত তুলোর সুতো ছিঁড়ে গেছে, মনের
সুতোটা তখনও ছেঁড়েনি!

শওকত আশা করত হয়ত কোনদিন ছেঁড়া সুতোয় গেরো দেওয়াবে, তা হলে তার
সেই যৌবনের মিতালি যে দরদ দিয়ে গড়ে উঠেছিল তা ব্যর্থ হবে না।

সরকার বাড়ির জলে ভাতে পাঁচপুরুষ ধরে শওকতের গোষ্ঠী বেঁচে আছে। এই
সত্যটা শওকত কোন সময় ভোলে না। প্রথম বয়সে কোঁচড়ে মুড়ি বেঁধে ওরা করে
রাখালি, বয়স বাড়লে মুনিষ, তারপর গায়ে গতরে বাড়লে নিজ নিজ ধান্দা খুঁজে
নেয়। সম্পর্কে কেউ চাচা, কেউ কাকা, কেউ মামু, কেউ মামা, এমনি ধারা চলে
আসছে কয়েক পুরুষ ধরে, আজও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। অথচ নতুন জমানায়
ছেলেরা এই মধুর সম্পর্কটা যেন নষ্ট করতে চায় অকারণে।

বিশ বছর আগের কথা মনে পড়ল শওকতের!

সেটা ছিল ভাদ্রমাস। অবিরাম বৃষ্টি। এই অশ্রান্ত বর্ষণে সোঁতার বাঁধ
ভেঙ্গেছে। শওকত গেছে জমির আল বাঁধতে। সরকার বাড়ির ছোট তরফের

মাঝখান কর্তা যোগিন্দির আর সে ঝপাঝপ কোদাল মারছে আলের ডগায়। জলে কাদায় সারা দেহ কাদা মাখা, মুখেচোখে মাথায় কাদা, চেনবার উপায় নেই। এমন সময় নতুন রাখাল জসিম এসে খবর দিল, শওকত আর যোগিন্দির দুজনের স্ত্রী-ই প্রসব করেছে ছেলে।

শওকত জসিমকে বলল, সত্যি তো।

হাঁ চাচা।

যোগিন্দির বলল, সত্যি তো।

হাঁ কাকা।

দুজনের মুখেই ফুটে উঠল পরিতৃপ্তির হাসি, কে যে প্রথম সম্ভাষণ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। শওকত তাকায় যোগিন্দিরের দিকে, যোগিন্দির তাকায় শওকতের দিকে।

অকস্মাৎ তাদের নীরবতা ভঙ্গ হল। যোগিন্দির হাতের কোদাল ঝপাস্ করে ফেলে দিয়ে শওকতকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে বলল, দেখ ঈশ্বরের কি করুণা। আজই আমরা বাপ হলাম, আজ থেকে তুই হলি আমার মিতা।

শওকতের এলেম না থাকলেও একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ নয়, সে আবেগের সঙ্গে বলল, খোদার কুদরত কে বলতে পারে। আমরাই মিতা নই আমাদের ছেলেরাও হবে মিতা।

মিতালির আলিঙ্গন।

এই আলিঙ্গন কত মধুর আর পরিতৃপ্তিদায়ক তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করল দুজনই। অনেকক্ষণ শওকত যোগিন্দিরের বুকে এলিয়ে থাকার পর খেয়াল হল ছেলের মুখ দেখার।

সোঁতার কিনারায় হিন্দু-মুসলমানদের পবিত্র স্থান যশাইকে সাক্ষী রেখে সেই জন্মদিনে তারা ছেলের নাম রাখল। যোগিন্দিরের ছেলে কানু আর শওকতের ছেলে হল কাস্মু। জাতের ফারাক তাই নামের সামান্য ফারাক রাখতে হল, মিতালির সুতো বেঁধে দিল দুই শিশুর হাতে।

দিন কাটে, মাস কাটে, চোখ কচলাতে কচলাতে বছর কাটতে থাকে। কানু-কাস্মু জোড়ে বড় হয়ে ওঠে। পাঠশালা ছেড়ে কানু গেল শহরের ইস্কুলে আর মক্তব ছেড়ে কাস্মু গেল মাদ্রাছায়। মিতার ছেলের সঙ্গে তাল রেখে শওকত চেষ্টা করছিল ছেলেকে বড় করে তুলতে। কানু ও কাস্মু দুজনেই বুঝেছিল লেখাপড়া শিখেই তাদের বড় হতে হবে। তারাও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল।

শনিবার হলেই কানু ছুটে আসত শহর থেকে। ছুটির দিন কাটাতো দুই মিতা একই সঙ্গে। প্রথম প্রথম ছুটির দিন গুনত কাস্মু। সরকার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিত কানু কবে গ্রামে আসবে। মাঝে মাঝে অনুযোগও করত। বলত, শনিবার শনিবার মিতা ইচ্ছে করলেই তো বাড়ি আসতে পারে। তা কেন সে করে না। মাস-খানেক কানু না এলে অদর্শনের ব্যথায় কাস্মু কেমন বেমনা হয়ে যেত।

কানু এসেই কাস্মুর খোঁজে গিয়ে হাজির হত শওকতের বাড়িতে। পরীজানকে জিজ্ঞেস করত, চাচিমা, কাস্মু কোথায় ?

রান্নাঘরের পেছন থেকে হঠাৎ হাজির হয়ে বলত, এই যে আমি। তুই এতদিন বাড়ি আসিসনি। তোর জন্য বসে বসে বাত হয়ে গেল কোমরে।

কানু এসেছে কাম্মুর মুখে হাসি ফুটেছে। দুই মিতা সেই যে বের হল আর তাদের খুঁজে বের করা হত কঠিন। কোথায় আমগাছতলায়, কোথায় জামগাছতলায়। কোথায় সোঁতার ঘাট, আর কোথায় ঝোপদিঘী, সকাল সন্ধ্যায় দুই মিতা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত কথা কত আলোচনা। সঙ্গী আর কেউ নয়।

এমনি করেই বোধহয় দিন কাটত তাদের।

প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কানু-কাম্মুর কচি মনে পরিবর্তন এল, অতি স্বাভাবিক ভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে। তবে এর জন্য যতটা দায়ী কানু তার শতগুণ বেশি দায়ী কাম্মু। লতিফের মত কিছু মুরুব্বি জুটেছিল কাম্মুর। তাদের পাল্লায় পড়ে মিতালির পবিত্রতায় কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল।

শওকত কাম্মুর পরিবর্তন লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন। আগে কাম্মু বন্দরে বন্দরে মাল পৌঁছাত, হাটের কড়ি, পারের কড়ি গুনে নিত। পদ্মার উজান ভাটিতে ডিঙির মাথায় সাদা বাদাম তুলে ভেসে বেড়াতে সে খুবই ভালবাসত। ডিঙিতে বসে ভাবত ভূগোলে-পড়া সাত সমুদ্দর তের নদীর পার হতে যদি সে পারত তা হলে ডিঙির মাঝি খুশী হত, আর খুশী হত তার জিজ্ঞাসু প্রাণটা। এখন সেই কাম্মু আর ডিঙি ভাসায় না। এসব আর তার ভাল লাগে না। কানু এলে সে পালিয়ে বেড়ায়। বৈঠাতে হাত দিতে সে নারাজ। অথচ এক বছর আগেও তারা যুক্তি করেছিল গল্পে পড়া মার্কোপোলোর মত দুই বন্ধু ডিঙি ভাসিয়ে অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। সেই কাম্মু বদলে গেছে। কোথায় সে আজকাল যায়, খুঁজেও পাওয়া যায় না।

শওকত ওদের হালচাল লক্ষ্য করত। কেন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ তা ভেবে পেত না।

কানু কাম্মুকে খুঁজে বেড়ায়। নিরাশ হয়ে ফিরে আসে, কানুর শুকনো মুখ দেখে শওকতের বুক ফেটে যায়। মিতালির সুতো অজ্ঞাত রহস্যের ধাক্কায় ছিঁড়ে গেছে, সে সুতো জোড়া দেবার চেষ্টা বোধহয় সফল হবে না। মিতালির শেষ চিহ্নটুকুও ফেলে দিয়েছে বাপের দেওয়া নামটা বদলে! তবুও শওকত বুঝি আশা করে। একদিন তাদের ভুল বোঝাবুঝির শেষ হবে। ফিরে আসবে তাদের পুরানো জীবনের সৌন্দর্য আবার তাদের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি পড়বে, তার সঙ্গে যোগিন্দিরের মত কাম্মু-কানু পরস্পরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দিন যায়, হতাশা দেখা দেয় মাঝে মাঝে তবুও আশা যায় না।

অর্ধসুপ্ত মনের কোণায় আশার ক্ষীণ দীপটি কখন যে ঝাপটা বাতাসে নিভে গেছে জাগ্রত মন নিয়ে সে নিজেও তা অনুভব করতে পারেনি। লেখাপড়া এলেমকারীর পরিণাম দেখে শওকত মনে করল, মাকাল ফলের মত বাহিরের জৌলুষ ভেতরের তিক্ততা গোপন করতে পারেনি। সবই স্বপ্ন, বাস্তব বড় রূঢ়! আজকাল সহজে সরকার বাড়ি মুখো হতে সাহস পায় না। হয়তো সে মুখ দেখাতেই পারত না।

ঘটনায় গতি বদল হল। নইলে শওকতের লজ্জার কোন পর্দা থাকত না।

যোগিন্দির কাজ পেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেল আসাম মুল্লুকে। যদি সে না যেত তা হলে সালিয়ানা যশাইয়ের মেলার কথা ভেবে তার বুকে রক্তের আঁচড় কেটে দিত। কাম্মু হয়েছে কামারুদ্দিন, যশাই হয়েছে হিঁদুর দেবতা, এ দুটোই শওকতের আবালা বিশ্বাসকে চরম আঘাত দিয়েছিল! শওকত মুখ ফুটে বলতে পারত না কাউকেই।

বছর বছর যশাইয়ের মেলা বসে। মেলার কটা দিন পারঘাটার কাজটা কাম্মুকে দিয়ে শওকত নতুন ধান্দায় বসত। পারঘাটার নগদ কড়ির চেয়েও লোকসানের দোকান সাজাতো মেলায়। তার লাখো কাজ থাকলেও লোকসানের খাঁতয়ান মাথায় নিয়ে দোকান সাজায় মেলায়। শাঁখা-সিঁদুর নোয়া বেচতে বসে। তার বিশ্বাস, যশাইয়ের মাটিতে বসে নোয়া সিঁদুর বেচলে ছোয়াব হবে। এ বিশ্বাস তার জন্মা-বধি। এত অল্প পরিশ্রমে আর অল্প পুঁজিতে নেক পাওয়া সহজ কথা নয়। এই সুযোগ হেলায় হারাতে চায় না শওকত।

যোগিন্দির নেই, কানু নেই কিন্তু মেলা বসেছে। মেলায় শওকতও দোকান সাজিয়ে বসেছে। খদ্দেরকে সস্তায় পুণ্যলাভের হিসেব দিয়ে প্রতি বছরের মত বসেছে শাঁখা-সিঁদুর নোয়া বেচতে।

অন্যান্য বছরে পেছন থেকে কানু এসে জিজ্ঞেস করত। শওচাচা, আজ তোমার নাও বন্ধ ?

শওকত মুখ না তুলেই বলত, না বাপু, কাম্মু আছে পারঘাটায়।

আচ্ছা বলে কানু ঘাটের দিকে যেত। এবার আর কানু এসে প্রশ্ন করবে না।

সামনে খরিদ্দারের ভীড়। ভীড়ের মাঝে কানুর সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা এবার আর দেখা গেল না। শওকত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যোগিন্দির চলে গেছে, কানু আর আসবে না।

গ্রাম গ্রামান্তর থেকে হিন্দু-মুসলমান মেয়ে মদ্দ আসে যশাইয়ের মেলায়। সেবার বারোহাটের নফর মাঝির বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে মানতের শিন্নি দিতে এসেছিল। নফরের ঘরে তিন-তিনটে ছেলে বছর না ঘুরতেই পেঁচোর দয়া পেয়েছে! অনেক শিন্নি মানত করে নাক ফুঁড়িয়ে এবারে কোলের কুচোটা ষষ্ঠীর কৃপায় দেড় বছর পেরিয়েছে। এই কচিটা বেঁচে আছে যশাইয়ের দয়ায়। তারই মানত। চালন-ডালায় কলা আর মণ্ডা সাজিয়ে নিয়ে এসেছে আড়াই পোয়া রাস্তা হেঁটে। সতী যশাইয়ের নোয়া-সিঁদুর-শাখা হলেই পুরো মানত হাসিল হবে।

নফর গিন্নী জিজ্ঞেস করল, কি গো পাটনীর পো নোয়ার কি দর ?

শওকত মৃদু হেসে বলল, পয়সা জোড়া। সিঁদুর নিলে আলাদা পয়সা দিতে হবে মা।

নফর গিন্নী মাথার ঘোমটা একটু আলগা করে টেনে দিয়ে অবাক হয়ে বলল, একটা ডবল দিতে হবে। বল কি গো! তোমাদের জুলুমে মা যশাইয়ের পুজো শিন্নি বন্ধ হবে দেখছি।

শওকতের মুখে কেমন যেন আপ্যায়ণের হাসি ফুটে উঠল, বলল, পয়সা বেশি মনে করলে বিনি পয়সাতেই দেব মাঝির বিটি। মা তো শুধু তোমার নয়। মা যে সবার।

নফর গিন্নির আর কিছু বলার ছিল না। বোকার মত তাকিয়ে আঁচল থেকে দুটো পয়সা বের করে সওদাগুলো ডালায় সাজিয়ে নিল।

শওকত যেমন মাথা নীচু করে ছিল, তেমনি রইল।

এই রকম বেচা কেনা প্রতিবছর করতে হয় শওকতকে। মেলার শেষে হিসেব করে দেখে মূল পয়সা ফিরে এলেও লাভ হয়ে অতি সামান্য।

সেবার কানু যখন কাম্মুর খোঁজে গিয়েছিল তখন বুঝতে পারেনি কানু ফিরে আসবে। শওচাচা ডাক শুনেই চমকে উঠেছিল। অশ্রান্ত বর্ষার কতকগুলো ঝাপসা মেঘ যেন ছিল কানুর মুখের ওপর। ব্যর্থ মিতালির শ্মশানে যে কানুর বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস হাঁপসে বেড়াচ্ছিল, কেমন গুমোট মনে হয়েছিল শওকতের। সে মাথা উঁচু করতে পারছিল না।

এরপর একদিন কানু এসে বলেছিল, আমরা এদেশ থেকে চলে যাচ্ছি চাচা। বাবা আসাম যাচ্ছেন, আমরাও যাচ্ছি।

বিচ্ছেদটা এভাবে আসবে তা ভাবতেও পারেনি শওকত।

মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লেও এমন ভাবে আহত হত না শওকত। জবাব না দিয়ে হাতের কাছে যা ছিল সব গুটিয়ে উঠে পড়ল। কয়েক গণ্ডা বছরের অভ্যাস থেকে সে আপনা আপনি মুক্তি পেতে চাইল তার ছোট মনিহারী দোকানের পাট উঠিয়ে।

কানু এমনটা আশা করেনি। সেও পথ ধরল।

এসব বাহ্যিক, ভেতরে যে প্রবল ঝড় তা জানা গেল শওকতের হঠাৎ পরিবর্তনে।

পারঘাটার ডিঙিতে বসেই চঞ্চল হয়ে যেত। মাঝে মাঝে ভিন বন্দরে মালটানার ঠিকা পেলে বাদাম গুনের দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকায় চুপটি করে বসে। কাম্মুকে পার ঘাটে বসতে বলে না। ফেরীর ডিঙিতে মুনীষ বসিয়ে সে ডিঙি নিয়ে বের হয়। ডিঙির গলুইতে বসে মাঝে মাঝেই সে ভাবে পুরানো দিনের কথা। কেমন করে সরকার বাড়ির সাথে তার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে ক'পুরুষ ধরে, কেমন করে বেড়ে উঠল সরকার বাড়ির চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্য, কোথা থেকে এল সব পুবা চাষীর দল যমুনার ভাঙন থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে! সবই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দা-কাটা কড়া তামাকের ধোঁয়ার সাথে তার মনটা ঝিমিয়ে যায়, ভেসে যায় কোন অতীতে। মনের গহনে যে ব্যথা তার অভিব্যক্তি কোথাও নেই।

তারপর কত বছর কেটে গেছে।

কাম্মু কমরুদ্দিনের হাব ভাব মোটেই ভাল মনে হয় না। তাই কাম্মুকে নিয়ে শওকতের যত ভাবনা। সেদিন যশাইয়ের ঘাটে নামতেই শওকত কাম্মুকে হুঁসিয়ার করলেও ফায়দা যে কিছু হবে না তা শওকত জানে। ততক্ষণে কাম্মু যশাইয়ের ঝোপ পেরিয়ে মিশে গেছে বেনা ঝোপের অন্ধকারে। আঁধারে দেখা যাচ্ছে না। যশাইয়ের অসম্মান শুনলে শঙ্কায় দুরদুর করে ওঠে শওকতের প্রাণ।

যশাইয়ের সঠিক ইতিহাস জানা নেই কারও। যশাইগাছের বয়স হয়েছে ক'শ

বছর তার চিহ্ন কালের বুকে আঁচড় রেখে যায়নি একটুকুও। একটা গাছ ধীরে ধীরে বহু গাছের সৃষ্টি করেছে। বিরাট জঙ্গলে পরিণত হয়েছে যশাইতলা। কোনটা যশাইয়ের আদি গাছ তা জানা নেই কারও। যশাইয়ের ঝোপে সাঐলের ডাকাত জমিদাররা কালীপুজো করেছে দু'শ বছর আগে। এইটে হল প্রবাদ। আরও কত কাহিনী রয়েছে এর গা জড়িয়ে। কাহিনী থাকলেই উপকাহিনী থাকে জমিদারদের মোশাহেবের মত। সবটাই বিশ্বাস্য নয়। কত জামগাছ ভেঙেছে বোশেখী ঝড়ে তারও কোন হিসাব নেই, সবার ডালপালা গজিয়েছে আবার ভেঙ্গেছে। আবার গজিয়েছে সেই গাছের গুঁড়ি থেকে, তবুও সমানে ফুল বেলপাতা শিন্নি শাঁখা সিঁদুর জুগিয়ে চলেছে বিশটা গাঁয়ের লোক যশাইয়ের পায়ের তলায় কৃপালাভের আশায়। যশাইয়ের যশ ছড়িয়ে পড়েছে দূর দূরান্তের গ্রামে গঞ্জে শহরে, পদ্মার উজানে ভাটিতে।

ইতিহাস নয় জনশ্রুতি। শ্রুতিরোচক আবার বেদনাবহ।

নবাবীতে সবে ঘুন ধরেছে। তবুও ঠাট বজায় আছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় ফৌজদার রয়েছে, রয়েছে নবাবী ফৌজ। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে ফৌজদারের পেশকার ছিল আসমত চৌধুরী। খোটান অথবা কান্দাহার থেকে আসমতের বাবা-দাদা এসেছিল ফৌজদারের নকরি করতে। সে সময় ছিল লাঠির জামানা। লাঠি আর কাম-কামাইয়ের দৌলতে জমি জিরেত হল, আর বাড়ল ইজ্জত। তিন পুরুষ পর লাভ হল পেশকারি। মওলবী পড়াত আসমতকে। বৃথাই চেষ্টা, আসমতের নিরেট মাথায় গুলিস্তান আর বোস্তানের পেরেক বসাতে না পেরে তার বাপকে ডেকে বলল, বড়ে মিঞা. ইয়ে বাচ্চা আপকা খেলাপ একদম মোচি হ্যায়! আসমতের লেখা পড়ায় ইতি। সেই থেকে আসমতকে 'মুচিমিঞা' বলেই সবাই জানে। আসমতের ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সে হল ফৌজদারের পেশকার, নসীবের দরওয়াজা খুলে গেল।

আসমতের সঙ্গে যশাইয়ের আসল নকল কাহিনী জড়িয়ে আছে।

পদ্মার ভাটিতে আসছিল নায়েব নবাব। সুবে বাংলার অধিশ্বর। অভ্যর্থনার ভার পড়েছে চর মণ্ডলে। আসমত পাকা লোক। সুযোগ তার সামনে।

আরবী খচ্চরের পিঠে চেপে জোর কদমে ছুটে গিয়েছিল আসমত নায়েব নবাবকে সেলাম—নজরানা দিতে। ফেরবার পথে শেরওয়ানীর জেবে নতুন জমিদারীর সনদ নিয়ে খুশী মনে হাল্কা চালে আসছিল আসমত। সোঁতার বাঁকে বেলা গড়িয়ে গেল। পড়ন্ত বেলায় আছরের নমাজ পড়তে বসল সোঁতার কিনারায়।

সোঁতার ঘাট তখন সরগরম। ঘাটে রূপের হাট বসেছে। কলসী কাঁখে গাঁয়ের মেয়েরা এসেছে সোঁতার জলে গা ধুতে, জলকেলি চলছে। হাসি, কাশি, ফিসফিসানি, সোরগোল সব মিলিয়ে বিকেলের সোনালী বেলায় রূপোলি ঢেউ উঠেছে সোঁতার জলে। এই ঘাটে পুরুষ আসা মানা। তাই আবহমানকাল ঘাট নিরাপদ সেই কারণে নির্লজ্জ ভাবে মেয়েরা স্নানের সঙ্গে মনের কথা কইতে পারে।

চৌধুরী বাড়ির বুড়ো ঠাকরেন, ঘোষ বাড়ির ন'বৌঠান, তলাপাত্তরদের ছোটবউ, মাঝিদের মুংলি মাঝি, নেয়ামতের তৃতীয় পক্ষ আরও কত বউ ঝি নেমেছে সোঁতার ঘাটে। আসমত চৌধুরী নমাজ সেরে উঠে দাঁড়াতেই তার নজর পড়ল ঘোমটা টানা

তল্লাপাত্তরদের ছোটবউ যশোমতীর ওপর। যশোমতীর রাঙামুখে তখন পড়ন্ত সূর্যের আলো যেন আগুনের আলপনা এঁকে দিয়েছিল। বিকেলের সোনালী রোদ আর মন মাতানো ফুর ফুরে বাতাস নবীনাদের চোখে আবেশ এনে দিয়েছিল। আসমত দূরে থেকে দেখছিল যশোমতীকে। নিষ্পাপ এই সব ফুটন্ত কুঁড়ির ওপর চোখ পড়তেই আসমত চমকে উঠেছিল। সবার অলক্ষ্যে আসমত ফিরে গেলেও এখানেই ঘটনার যবনিকা নেমে আসেনি।

তারপর কি হল তা কেউ জানে না। যারা জানত তারাও ফৌজদারের ভয়ে 'রা কাড়ল না। পরদিন সকালে আসমত চৌধুরীর লাশ পাওয়া গেল সোঁতার কিনারায় আর যশোমতীর লাশ পাওয়া গেল পাটুলির ঘাটে।

কেউ বলল ডাকাতে মেরেছে, কেউ বলল গাঁয়ের লোক শোধ নিয়েছে, কেউ বলল বর্গী এসেছিল। আসল কথা চাপা পড়ে গেল। আজও কেউ জানতে পারেনি পারবেও না। ছুটে এল আসমতের বিবি, স্বপ্নে পেয়েছে যশাইমায়ের আদেশ। সবার সন্দেহ ঘুচল, সেদিন থেকে সবাই জানল সতীমায়ের তেজে আসমত পুড়ে মরেছে।

প্রথম সিন্নি এল চৌধুরী বাড়ি থেকে, পাল্কী চেপে সিন্নি দিতে এল আসমতের খাস বিবি নূরীবেগম। গাঁয়ের মানুষ অবাক হয়ে দেখছিল নূরীকে। সুন্দর তো বটেই। বাগদাদের গোলাপ বাগিচায় নূরীর জন্ম। বাপ এসেছিল নবাব সরকারের খান-সামান হয়ে। সরকারী অস্থাবর সম্পত্তির জিম্মাদার। খাজাঞ্জিখানায় মালগুজারি দিতে এসেছিল আসমত, সেখানে নূরীর বাবার সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়টাই শুধু নয়, খোটানী অথবা ইউসুফজাহী রক্ত, টকটকে রং। ঝক্‌ঝকে চেহারা, জোয়ান বয়স, পালোয়ানী দেহ। বয়স অল্প হলেই বা কি হবে। পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ে আসমত। খান-সামান খুশীতে নেচে উঠল, বকশিস করল নিজের মেয়ে নূরীর সাথে বে'দিয়ে। সেই নূরীবেগম এল যশাইতলায় প্রথম সিন্নি চড়াতে। অবাক কাণ্ড সেই থেকে সবাই জানল যশাইয়ের মহিমা। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসে যশাইয়ের জয়গান করে যাচ্ছে দুশ বছর ধরে।

ঘেন্না নিয়ে মরেছে যশোমতী, নিন্দা নিয়ে মরেছে আসমত। দুজনের নাম ঝাপসা হলেও তার সঙ্গে শুধু বেঁচে আছে রাজা-নবাবদের কেচ্ছা। কোনটা তেতো কোনটা মিঠে। রসাল দিয়ে এই কাহিনী লোক মুখে চলে আসছে দুশ বছর ধরে।

যেখানে ছিল কালো কচুর ঝোপ, দেখতে দেখতে সেখানে বেড়ে উঠেছে আকাশ ছোঁয়া কালো জামের ঝোপ, নিন্দে আর ঘেন্নাকে আবরণ দিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েক শ'বছর ধরে।

আরও অনেক অনেক কেচ্ছা ও কাহিনী জড়িয়ে আছে যশাইয়ের ঘাটকে কেন্দ্র করে সে সব কথা বলতে গেলে পাঁচো মানিকপীরের পুঁথি তৈরি হত অনেক আগেই।

শওকত বড় হয়েছে এই সব কেচ্ছা কাহিনী শুনতে শুনতে, ওসব গা-সহা হয়ে গেছে। যতই বছর কাটে ততই নানা কেচ্ছা-কাহিনী জুড়ে যায় লোক প্রবাদের সঙ্গে কিছুটা বিশ্বাস্য অথবা সবটাই অবিশ্বাস্য। শওকতের মনে ওসব কোন রেখাপাত করে না।

শওকত ভাবে আর ঘন ঘন তামাক সেজে সুখটান দেয়।

কাম্মু চলে যেতেই ডিঙির গলুই থেকে সরে এসে পাটাতনের তলা থেকে সকালের ভাত-তরকারীর হাঁড়ি টেনে বের করে। সেই বিহানে কাম্মুকে সাথে করে রামেশ্বরপুরের হাটে গিয়েছিল শানদারদের মাল নিয়ে। সারাদিন বৈঠা টানতে টানতে হাঁড়ির ভাত মুখে দেবার সময় পায়নি। শানদারদের সাথেই নাস্তাপানি করে সকালের ঝামেলা মিটিয়েছে। তারপর টানা উপোস।

নামবার আগে কাম্মু বলেছিল, বাড়ি থেকে গরম ভাত নিয়ে আসব।

শওকত মানা করেছে। ভাত আনতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

কাম্মু নেমে যেতেই সে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে হুঁকোয় সুখটান দিতে লাগল। গাঙের জলের মত নিস্তব্দ নিস্তরঙ্গ তারও মন। বোধহয় পড়ন্ত জীবনের শেষ অধ্যায়ের একখানা পৃষ্ঠা ফেরেস্তার হাতে সবার অলক্ষ্যে উল্টে গেল।

তামাক টেনে পাটাতনের ওপর দেহ এলিয়ে দিল। চেয়ে রইল আকাশের মিটমিটে নক্ষত্রের দিকে।

দুই

চারিদিক নিস্তব্ধ।

রাত গড়িয়ে মাঝ রাতে এসে গেছে। সেই নিশুতি রাতে শওকত ডিঙির রশি শক্ত করে খুঁটোয় বেঁধে ছইয়ের তলায় ভাল করে গা এলিয়ে দিল। আধো ঘুমের ঘোরে শুনতে পেল সোঁতার জলে খলখল শব্দ। এরকম শব্দ মাঝে মাঝেই তার ঘুম ভাঙ্গায়। আজও শুয়ে শুয়ে হাঁকিল, খোলসানে মাছ আছে মিঞা, তাড়িও না।

রাতে ফেরী পারাপার করা বে-আইনী। শওকতকে আইনের কথা বললে হেসে বলে, আইনটা আমাদের ভালর জন্য, কিন্তু আইনে ইনসাফি করতে তো মানা করে না। বিপদ আপদে ফেরী পার না করলে তা হবে আল্লার চোখে গুনাহ্। আইন অমান্য করেই রাতের যে কোন সময় ফেরী পারাপার করে শাওকত।

আজ কান খাড়া করে শুয়েছিল শওকত। তার গলার আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতাকে ব্যঙ্গ করে ফিরে এল, সেই সাথে ভেসে এল চেনা গলার প্রশ্ন, শওকত জেগে আছিস। অতি পরিচিত গলার শব্দে শওকতের ঘুমের ঘোর কেটে যায়।

হ-কাকা, বলেই শওকত ধরমরিয়ে উঠে বসল।

তুই আছিস, নইলে গায়ের মানুষ রাতের বেলায় এপার-ওপার করতে পারত না। চল ওপারে।

সরকার বাড়ির বড়কর্তা ফিরেছে শহর থেকে। আজ শনিবার, শওকত ভুলেই গেছে। শনিবার মাঝরাতে হপ্তার কাজ শেষ করে বাড়িতে বিশ্রাম করতে ফিরে আসে বড়কর্তা। অদ্ভুত মানুষ বড়কর্তা মণি সরকার। ঝড়বৃষ্টি রাত বিরেত কিছুই সে মানে না। শহরে থাকে পাঁচটা দিন। শহুরে কায়দায় রস খাওয়াটা অভ্যেস হয়ে

গেছে, কিন্তু কখনও পা কাঁপে না। রূপো বাঁধানো বাঁশের ছড়ি হাতে নিয়ে রসে নেশায় বুঁদ হয়ে রেসের ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে এসে দম নেয় যশাইয়ের ঘাটে সোঁতা পার করে শওকত।

নৌকায় বসে এক একদিন এক এক রকম গল্প শোনায় বড়কর্তা, কোন কোন দি শওকতও বলে গাঁয়ের পাঁচদিনের খবরাখবর।

নাসিম আলির বেটি ভেদ বমির কথা শওকত সব সময় স্মরণ রাখে। নাসি আলি শহর থেকে ডাক্তার এনেছিল। রাতের বেলায় ফিরতে তার বড়ই কষ্ট হ ভেবে সারারাত ডাক্তারকে ছইয়ের তলায় শুইয়ে রেখে সকালবেলায় তাকে শহ পেঁৗছে দেবার ব্যবস্থা করেছিল।

শওকত মাঝে মাঝে সাবধান করে। নয়নজুলি পেরিয়ে আসতে হয় তাকে নয়নজুলির বাঁধে ফি—বছর একটা-না-একটা খুন হয়ই হয়। তাতে বড়কর্তা ভ্রূক্ষেপ নেই। ভয়ের কথা বললে জবাব না দিয়ে হাসে। তবুও অনেক রাতে আসবেই আসবে। রাতবিরেত মাঝরাত শেষরাত সব সমান তার কাছে। সাপ খোপেরও তো ভয় আছে। বড়কর্তাকে বললে জবাব দেয় না হাসে। কোন সম বলে, মরব তো একবার।

সোঁতার ঘাটে পা ধুয়ে কম-সে কম একটা পয়সা যশাইতলায় না দিয়ে আ আড়াইগণ্ডা সেলাম না ঠুকে কখনও এগোয় না।

আজ শনিবার, বড়কর্তা যখন এসেছে তখন রাতও নিদেন পেরিয়ে এসেছে। ডিং থেকে নেমে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে বড়কর্তা জিজ্ঞেস করল, মাছ আছে রে?

আছে কাকা। তবে রুচবে না।

বড়কর্তা হো-হো করে হেসে বলল, গন্ধ তো পাব, তাতেই হবে। খিড়কির ঘা পোনা ছেড়েছি, এ বছর মাছের বড় অভাব। পোনা বড় হতেও ছয় মাস এক বছর তা বলে তপস্বী হতে পারব না বাপু। দে দেখি কয়েক হালি। তোর কাকির আবা নজর উঁচু।

আন্দাজমত বড় বড় কটা নাছমাছ নৌকার খোল থেকে টেনে তুলে শওক জিজ্ঞেস করল, কিসে নেবেন?

পকেট থেকে রুমাল বের করে দিল বড়কর্তা। সিল্কের রুমাল থেকে মিঠে খুশ বায় এসে লাগল শওকতের নাকে। একটু আমতা আমতা করে বলল, দামী উমাল নষ্ট হবে কাকা, সুতলী দিয়ে বেঁধে দি।

হোক নষ্ট। তুই বেঁধে দে?

মাছ বাঁধতে বাঁধতে শওকত বলল, নাজা ভেঙ্গে নাও কাকা।

কেন রে, ওনাদের উৎপাত হয়েছে বুঝি?

যশাইয়ের ঘাটে কারুর ট্যাঁ-ফুঁ করার ক্ষমতা আছে। মায়ের চরণ দেওয়া জমিন সে জমিনে সেলাম জানালে দোজখের ভয় থাকে না। সেখানে আসবে ওনারা, হঃ তবে এ-জমিন পেরোলেই ভয়। সেদিন পটলা বাগদীর পেছনে লেগেছিল ঐ মোল্লার ভিটের তফাতে। পটলা তো 'রাম রাম' করতে করতে কোনরকমে রেহাই পেয়েছিল

তারপর তিন দিন তার তারাসে জ্বর। তাই বলছিলাম সাবধান হওয়া ভাল।

বড়কর্তা হেসেই বাঁচে না। তার উৎকট হাসির শব্দে যশাইয়ের ঝোপ থেকে একদল শেয়াল সর্-সর্ করে দৌড়ে পালাল।

মা যশাইয়ের কাছে যেমন ট্যাঁ-ফোঁ চলে না, তেমন চলে না এই শর্মার কাছে। মণি সরকার ওসব জিন-পরী, ভূত-পেত্নী, মামদো-বিচনির পরোয়া করে না কোন দিন। সে সব তো তুই জানিস। এই তো সেদিনের কথা।

সরকার বাড়ির কর্তা এমনিতে কথা বলে কম, রসের নেশা চাপালে তখন কথার মাত্রা থাকে না, বকতে বকতে শ্রোতাকেও হয়রান করে দেয়। শওকত গল্পের মওকা পেয়ে বলল, একটু দেরি হবে মনে হচ্ছে। উঠে এস কাকা। বিহানে চাচা-ভাতিজা এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ঘরে ফিরব।

মণি সরকার আপত্তি করে বলল, মন্দ বলিসনি। তবে তোর বড়কাকী চিন্তা করবে। আমার না হয় ভয়-ডর নেই। সে তো তা বুঝবে না।

তাও ঠিক। তবে আপনার কাছে নানা কেচ্ছা শুনতে মন চায়।

মণি সরকার না ভেবেই বলল, হোক্ গে দেরি, তাই বলে জিন-পরীর কেচ্ছা না বলে যেতেও মন সরছে না।

বড়কর্তা ডিঙিতে উঠে বসল।

পাটাতনের ওপর কাঁথা বিছানো ছিল, বড়কর্তা বলল, বালিস আছে রে?

বালিশ। শওকত মনে মনে হাসল। ছইয়ের তলা থেকে আরেকটা তেলচিটে কাঁথা বের করে বালিশের মত করে এগিয়ে দিল। বড়কর্তা জুত-সই মত মাথার তলায় বাগিয়ে নিয়ে বলল, তারপর শোন্।

সেবার মড়ি ঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম। জেলখানার পেটা ঘড়িতে বারটা তখন বেজে গেছে। খানিক পর উজাল মোক্তারের আমবাগানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম। আঃ, তুই দেখলে ভিরমি খেতি।

শওকত বড়কর্তার গা ঘেঁষে বসল।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে ফিকে জ্যোৎস্নার আলো।

সেই ফিকে আলোতে দেখলাম একটা লোক বস্তা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারের দো-মাথা নারকেল গাছের তলায়, ভাবলাম, কোন চোর কিছু চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। হেঁকে ডাকলাম, কে কে দাঁড়িয়ে?

জবাব এল না। আবার নড়াচড়াও করল না। গা-টা ছম ছম করে না-উঠল এমন নয়। হাতের লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে আবার হাঁক দিলাম, জবাব দাও, নইলে—

আশ্চর্য! কোন জবাব না দিয়ে লোকটা হাঁটতে শুরু করল। বেশ জোরে জোরে চলছিল। ঠিক্! চোরই বটে। আম চুরি করে পালাচ্ছে। লাঠি বাগিয়ে ছুটলাম ওর পেছু পেছু। সেও ছুটছে, আমিও ছুটছি। বললে পেতায় হবে না, তবুও শোন্, বন বাদার ভেঙে কোথায় যে যাচ্ছি তা নিজেই জানি না। হঠাৎ খেয়াল হল। শেষরাতের আসমানি তারা দেখে হুঁস হল। তারাটা জ্বলজ্বল করছিল, আমার চোখও দপ্ দপ্ করছিল, আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বিহানের আলো দেখা দেবে।

ভাবলাম, তুমি ব্যাটা পালাচ্ছ, বিহান হলে কোথায় পালাবে বাছা।

শওকত নারকোলের ছোবরা পাকিয়ে মালসার আগুন জ্বালালো। শেষরাতে নেশাটা যাতে জমাট হয় তারই জন্য কল্কেতে ভাল করে দা-কাটা তামাক ভরতে লাগল।

তারপর কি হল বড়কর্তা ?

তারপর শোন্। লাঠিটা বাগিয়ে বললাম, দেব শালার ঠ্যাং ভেঙে। লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখি, শালার পা নেই শূন্যে সে ধড়টা নিয়ে উড়ে চলেছে নেশাটাও তখন ফিকে হয়েছে। বুঝলাম, ব্যাটা মানুষ নয়। তবে হাঁ, মণি সরকার ভয় পাওয়ার ছেলে নয়, তা বুঝেই এরপর আর কোনদিন ব্যাটা আর নারকেল তলায় দাঁড়ায়নি।

শওকত প্রথম থেকে 'হুঁ' না দিলে গল্প জমে না। বিশেষ করে ভূত-পেত্নীর গল্প শুনতে যেমন 'হুঁ' দিতে হয় তেমনি বক্তার গা-ঘেঁষে বসতে হয়।

গল্প শেষ হতে শওকত হুঁ দিয়ে কল্কেতে এক মনে ফুঁ দিতে লাগল।

ভারি কড়া তো তোর তামুক !

দা-কাটা কিনা।

মণি সরকার আধাশোয়া অবস্থায় বলল, আর সুখটান দিতে হবে না। ট্যাক্সে বসেছে, বুঝলি।

তাই তো শুনলাম। হুঁকো ধরেই টানাটানি, বাঁচা গেল বাবা। এবার জরু বিবির ওপর ট্যাকসো সরকার বসালেই বাঁচি। মহারানীর রাজ্যে কত কি যে দেখব কাকা !

শওকতের পাশে আবার বড়কর্তা কাঁথায় গা এলিয়ে বলল, তুই তো শুনতে পেলি না।

আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা কাকা, সেই বস্তার কি হল ?

আহা শেষটুকু বলতেই ভুলে গেছি। যেমন দিলাম এক ঘা, কোথায় গেল দানা দৈত্য, রইলো শুধু আমের বস্তা। আমার নাম মণি সরকার। আবার যদি পাই ব্যাটাকে তা হলে ওর ভূতের খেলা শেষ করে দেব চিরজনমের মত ! তখন বুঝবে বাছাধন।

কিন্তু !

কিন্তু-কিন্তু নেইরে। আসলে বুকে জোর থাকলে সব দানাই দানা পাকিয়ে মিছরি হয়ে যায়।

নিজের রসিকতায় বড়কর্তা হো-হো করে হেসে উঠল। শেষ রাতের নিঝুম প্রকৃতি ভেদ করে হাসির ধাক্কা গিয়ে লাগল ঘশাইয়ের ঝোপে, ফিরে এল তার প্রতিধ্বনি।

শওকত নিজের মনে তামাক টানতে টানতে জিজ্ঞেস করল একটা খবর বলতে পারেন কাকা ?

কিসের খবর।

অষ্টম বোষ্টুমির মামলাটার ফায়সালা কিছু হল।

বড়কর্তার চোখ তখন জড়িয়ে এসেছে। জড়িত কণ্ঠে বলল' কোন অষ্টম।

শওকত লক্ষ্য করল বড়কর্তার চোখে ঘুম। কাঁথার পোটলাটা মাথায় দিয়ে নাক ডাকতে শুরু করেছে। অষ্টমের কাহিনী বলার মত অবস্থা তার ছিল না।

এত লোকের কথা থাকতে অষ্টম বোষ্টুমির খবর নিয়ে শওকতের মাথাব্যথা ছিল না। তবুও কেমন একটা জানার ইচ্ছা। অনেক দিন থেকেই অষ্টম বোষ্টুমির মামলার খবর খুঁজছিল। শহর ফেরতা অনেক লোককে জিজ্ঞেস করেও জানতে পারেনি।

মাল নিয়ে অনেকবার শওকত গেছে লক্ষ্মীকোলের হাটে। সেখানেই সে প্রথম শুনেছিল অষ্টমের নাম। কয়েকবার অষ্টমকে হাটতলায় সওদা করতে দেখেছে। পরিচয়ও হয়েছে সোঁতা পার করে দেবার সময়। তবে ওটা এমন কিছু নয়। বেশ বয়স হয়েছে অষ্টমের। দেখলে মনে হয় বয়স কালে বেশ সুন্দরী ছিল। গৌরাঙ্গী, নাকে রসকলি, কপালে তিলক, গলায় তুলসীর মালা। কোথায় বাড়ি ঘর ছিল তা জানত না। কবে সেখানে এসে বেশ ইঁটের দেওয়াল ঘেরা বাড়ি করে বাস করতে থাকে তাও মুরুব্বিরা ভাল করে বলতে পারত না।

শওকত শুনেছে, অষ্টমের এককালে রূপও ছিল, যৌবনও ছিল, ছিল তার তীক্ষ্ণতা। পড়ন্তি বয়সে তার জলুষ ছিল না। ছিল শুধু পড়ন্ত বেলার আভা। কবে সে হাতে তুলে নিল খঞ্জনী, গলায় দিল তুলসী মালা, কণ্ঠে নিল হরিনাম, তাও কারও জানা নেই। এখন সে দুয়ারে দুয়ারে গান গেয়ে বেড়ায়। পাড়ায় পাড়ায় তার নাম রয়েছে। গাঁয়ের বউ ঝিয়েরা ডেকে বলে বোষ্টমের বিটি তোমার সেই গানটা শোনাও না।

অষ্টম কাউকে নাম শোনাতে কার্পণ্য করে না। অনুরোধ করলেই তার খঞ্জনী টুন-টুন করে বেজে ওঠে। তার ঠোঁটের হাসি আর কণ্ঠের গান মাতিয়ে তোলে শ্রোতাদের। বোষ্টুমির বড় খাতির। পাঁচ-সাত গাঁয়ের বউ ঝিয়েরা সিধে সাজিয়ে দেয় তাকে।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরার সময় মাঝে মাঝেই সোঁতা পার হতে হয়। শওকতের নৌকাতে পা রাখতে হয় মাঝে মাঝে। শওকত ফেরির পয়সা চায়নি কোন দিন, তবে যার এত নাম ডাক তার গান শোনার প্রবল ইচ্ছা জাগল তার মনে।

বোষ্টুমি দিদি তোমার গানের সুখ্যাতি আর যশ সবাই করে। শোনাবে একটা গান।

সবাই শোনে, তুমি শুনবে, বলে শওকতের নৌকার গলুইতে বসে অষ্টম ধীরে ধীরে আঙুলের আঘাত দিল খঞ্জনিতে।

অষ্টম মধু কণ্ঠী। গাইতে থাকে। হায় যমুনা। কোন তরীর নাইয়া সেজে রাই গেল ঘর।

মন্ত্র মুগ্ধের মত গান শুনছিল শওকত।

অষ্টম গান শেষ করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

শওকত হাসল প্রশংসার হাসি।

বোষ্টুমি দিদি কোথায় এমন গান শিখলে ?

শওকতের প্রশ্নটা হঠাৎ অষ্টমের মুখে চিন্তার ছায়া এঁকে ছিল।

খঞ্জনীটা ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি শিখবে নাকি পাটনীর-পো ?

অষ্টমের প্রশ্নে লজ্জা পেল শওকত। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, খোদা মালুম সে সুযোগ কি হবে বোষ্টমদি ? সকালবেলায় বদর বদর বলে নায়ের বৈঠা হাতে তুলি। রাতের বেলায় বৈঠা নামাই আল্লার কুদরত ভেবে। দিন রাত যে কোথা দিয়ে চলে যায় তা টেরও পাই না।

ডিঙি থেকে নামতে নামতে অষ্টম বলল, সময় হাতে না পেলে কি করে বৃন্দাবন যাবে পাটনীর পো। সেখানে না গেলে তোমার গান তো শেখা হবে না। এ গান শোনাতে হবে সোনার শ্যামকে, সে গান না শুনলে মানুষ কেন শুনবে। যেদিন আল্লার ফজলে তোমার হাত থেকে বৈঠা খুলবে, সেদিন শ্যাম তোমার গীত শুনবে সেদিনই তুমি শ্যামের গীত গাইবে, তার আগে নয়। সেদিন মনে হবে কানু বিনা গীত নেই। কানু বিনা দুনিয়াটা শূন্যে তখনই পাবে আমার মত গানের গলা।

ডিঙি থেকে নামতে নামতে অষ্টম বলল, গান যাদের প্রাণ তারাই গায় গান।

অষ্টম যশাইতলা পেরিয়ে ধলাট গাঁয়ের পথে এগিয়ে গেল। শওকতের ইচ্ছা হল পেছন থেকে বোষ্টুমি দিদিকে ডেকে আরও একটা গান শোনে। শওকত নাম-গান করতে পারবে না, তার নিজের গান শ্যাম নাই বা শুনল, তবে বোষ্টুমিদিদির গান শুনে শ্যামার আস্তানা সে নিজেই খুঁজে বের করবে। ডাকাটা উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে ডাকা আর হল না। আপনা থেকে শব্দ আটকে গিয়েছিল তার গলায়। অষ্টম ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যশাইয়ের ঝোপে।

বার বার বহুবার অষ্টম সোঁতা পেরোতে পারঘাটায় এসেছে কিন্তু কখনও মুখ ফুটে তাকে আর গান গাইতে অনুরোধ করতে পারেনি। অষ্টমের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলেও ফেলে দেবার মত নয়।

শওকত খবর পেয়েছিল অষ্টম মরেছে। শুধু মরেনি, মরাটা ছিল রহস্য ঘেরা ! সকালবেলায় পাড়া প্রতিবেশী দেখতে পেল তার লাশ ঝুলছে আমগাছের মগডালে। জোয়ান নয়, বুড়ো-হাবরা সংসার ত্যাগী বোষ্টমি, তাকে কে মারল, কেন মারল, এটাই হল রহস্য।

কেউ বলল, আত্মহত্যা. কেউ বলল. খুন।

পুলিশ এল। তদন্ত হল। গ্রেপ্তার হল দু-চারজন। কিন্তু অষ্টমের কেচ্ছা শেষ হল না। তাঁর পুঁজিপাটা বলাই সাহের গদী থেকে বের করল পুলিশ। টিপ দেওয়া ছোট একটা কাগজে তার দানপত্তর। সাক্ষীও আছে দানপত্তরে। সব দিয়ে গেছে জোয়ারের গোঁসাই-আশ্রমে। পুঁজির অঙ্কও কম নয়। নগদ-গয়নায় প্রায় সাতশো টাকা, তার সঙ্গে পেতল কাঁসার বাসন সমেত কিছু আসবাব আর তার আরাধ্য দেবতা শ্রীধরজিউ।

পুলিশ এবার স্থির করল, আত্মহত্যা।

কিন্তু আমগাছের মগডালে বুড়ী উঠল কি করে !

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি কখনও।

জোয়ারের গোঁসাই আশ্রম পুরানো নয়। বাবুদের মেজকর্তা অনেক দিন বৃন্দাবন বাস করে হঠাৎ এসে এক আশ্রম খুলে বসল। সকাল সন্ধ্যায় গ্রামের লোক এসে নাম গান করে। সন্ধ্যার পর মালসাভোগের প্রসাদ পেয়ে বাড়ি ফেরে কীর্তনীয়ারা। প্রতিদিনই চলে মহোৎসব। জোয়ার অনেকটা দূর। শওকত কখনও যায়নি সেখানে, শুনেছে।

বাবুদের মেজকর্তাই আশ্রমের গোঁসাই। বয়স ষাটের ওপর। গায়ের রং মেটে মেটে, চোখের চাহনি ফেটে পড়তে চায়। নিজের ভাগের সব সম্পত্তি দান করেছে আশ্রমকে। তাই আশ্রম তার জমজমাট। মালসাভোগের প্রসাদপ্রার্থী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভক্তির অভাব থাকলেও ভক্তের অভাব নেই।

তাজ্জব কথা। অষ্টমের দানপত্তর কায়েম করতে গিয়ে তবেই তো সবাই জানল। বড় ঘরের বড় কথা ছাই চাপা পড়ে থাকে। হঠাৎ কোন গোলমালের ঝড়ে ছাই উড়ে গেলে তবেই জানা যায় ভেতরের কথা। গোপন কথা জানতে পারে লোকে, তা ছড়িয়ে পড়ে কানে কানে। মেজকর্তার গোপন সমাচার জানল সবাই। তবে কলঙ্ক-জনক নয়। আবার সুখেরও নয়।

শওকত অবাক হয়ে শুনল, মেজকর্তাই নাকি অষ্টমের স্বামী।

সে আবার কি? বোষ্টমির স্বামী কিরে বাপু!

জোয়ারের তশীলদার নেয়ামত শেখ বলেছিল, মেজকর্তার বিয়ে করা বিবি ছিল অষ্টম। মেজকর্তা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন। তখন কোন এক গরীব বিধবা বামুনের সেয়ানা মেয়ে ছিল মেজকর্তার সেবাদাসী। মেজকর্তাও বৈষ্ণব হল আর সেই বিধবা বামুনও বৈষ্ণব হল। মেয়ের নাম অষ্টম মেয়ের জন্মের আগে সাতটা সন্তান হয়ে মরেছিল তাই ওর নাম রেখেছিল অষ্টম।

চুপি চুপি নেয়ামত শেখ বলেছিল, কাউকে বলিসনি। মেজকর্তা ফেঁসে গেল অষ্টমকে নিয়ে। শেষে বোষ্টম বোষ্টমির কাণ্ড। কণ্ঠীবদল করে বৈষ্ণবদের ডেকে মচ্ছব করে অষ্টমকে বিয়ে করেছিল মেজকর্তা।

শওকত বলল, তা কেন হল। মেজকর্তা রইল জোয়ারে আর অষ্টম গেল লক্ষ্মী-কোলের হাটে। এ কেমন কথা।

কাউকে বলিসনি যেন। মেজকর্তা অষ্টমের স্বভাব চরিত্তিরে সন্দেহ করত তাই তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে বাড়ি ঘর করেও দিয়েছিল।

এসব ঘটনা শওকত শুনেছিল অষ্টম মরার পর। খবর ওড়ে হাওয়ার মুখে। অষ্টমের মরার খবর পেয়ে গোঁসাই এল। গোঁসাই কেঁদে আকুল। তখনই তো জানা গেল।

বোষ্টম-বোরেগীর প্রথামত অষ্টমের সমাধি হল জোয়ারের আশ্রমের আঙ্গিনায়। গোঁসাই বাঁধিয়ে দিল সমাধির চারপাশ।

মামলার শেষ হয়নি তবুও।

শওকত আর খবর পায়নি। মাঝে মাঝে মামলার খবর জানার বড়ই ইচ্ছে হয়।

পারাপারের অনেক সোয়ারীকে জিগ্যেসও করেছে কেউ বলতে পারেনি। তারপর বছর কেটে গেছে। মানুষ দিন কাটলেই ভুলে যায়। অষ্টমের কথাও ভুলতে বসেছে সবাই কিন্তু শওকত কিছুতেই ভুলতে পারেনি অষ্টমকে।

বড়কর্তার তখন নাক ডাকার ঘটা। শিমুল গাছের মাথায় 'ওয়াক-ওয়াক' করে ডেকে উঠল উকুস পাখি। আর প্রহরটাক রাতও বোধহয় নেই।

হুঁকোটা নামিয়ে শওকত ঝিমুতে থাকে।

পুবের আকাশে ফিকে আভা দেখা দিতেই শওকত ধাক্কা দিয়ে বড়কর্তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল, [illegible]।

বড়কর্তার নেশার ঘোর [illegible]। চোখ রগড়ে উঠে বসেই বলল, দে মাছের রুমাল।

মাছের রুমাল হাতে নিয়ে বড়কর্তা বলল, কত দাম দেব?

শওকত হেসে বলল, আমি কি নিকারি? নিকারিরা মাছ বেচে, আমি তো মাছ বেচি না কাকা।

বড়কর্তার মস্ত ভুল হয়ে গেছে। নেশার মাথায় জিগ্যেস করে নিজেই লজ্জিত হল। বলল, তা বলছি না। তোর তো মেহনতী মাল। তাই বলছিলাম।

বড়কর্তা নিজেই জানে দাম নেওয়াটা শওকতের পক্ষে অসম্ভব। এটা হবে তার ভয়ঙ্কর বেইমানী আর ইজ্জত হানিকর। দাম দিতে চাওয়াটাও তার পক্ষে খুবই অশোভন ও রুচি বিরুদ্ধ। লজ্জিত হল বড়কর্তা।

শওকত তাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিল। বলল, দুপুরে পাতা পাতব, বড় কাকিকে বলে রাখবেন, কেমন?

বড়কর্তা রুমালটা হাতে নিয়ে ডিঙি থেকে নেমে সোজা পথ ধরল।

সরকার বাড়ির সঙ্গে শওকতদের উঠানো কয়েক পুরুষ ধরে। সরকার বাড়ির নুন খেয়েই বড় হয়েছে শওকত।

আজ যে সরকার বাড়ির বড়কর্তা, তাকে জন্মাতে দেখেছে শওকত। তখন সে রাখালি করত সরকার বাড়িতে। সাত আট বছরের শওকত গামছায় মুড়ি গুড় বেঁধে গরুর পাল নিয়ে মাঠে যেত। দুপুরবেলায় গরম ভাত খেতে এসে বড়কর্তাকে কোলে পিঠে নিয়ে খেলত। শুধু বড়কর্তা নয় সরকার বাড়ির সবাই তো তার কোলেপিঠে বড় হয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে আজও সরকার বাড়ির কোন কাজকর্মই হয় না।

পাল পর্ব ও উৎসবের একটা অঙ্গ ছিল শওকত। এই বড়কর্তার বিয়ে কত দিনের কথা। মনে মনে হিসাব করে শওকত কিছুটা গুনতিতে ভুল করলেও মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। সোঁতার ঘাট থেকে সরকার বাড়ির জোলা অবধি কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। কলাগাছের গোড়ায় মাটির ভাঁড়ে সিঁদুর লেপে আমের পাতা দেওয়া হয়েছে, বসানো হয়েছে মঙ্গল ঘট।

সরকার কর্তার বড়ছেলে মণি সরকারের বউ আসবে।

শওকত সোঁতা থেকে সরকার বাড়ির ঘাট অবধি নতুন বউকে পৌঁছাবে তার ডিঙিতে। হলুদ আর আবীর দিয়ে ডিঙির গলুই রং করেছে শওকত সারাদিন

মেহনত করে। ডিঙির পাটাতনে তুলোর তোষকে নতুন বউ এসে বসতেই শওকত রসাল করে বলল, আজ থেকে তুমি আমার বড়কাকি ; কেমন ? মনে থাকবে তো ভাতিজাকে ?

নতুন বউ।

লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারেনি। ঘোমটা দিয়ে ভাল করে মুখ ঢেকে চুপ করে বসেছিল। জবাব পাওয়ার আশাও করেনি শওকত।

কই বড়কাকি জবাব দাও। মা মনসার মত মুখ বুঁজে কেন ?

শওকত উৎসাহে হেসে উঠল !

বুড়ো সরকার কর্তা মারা গেছে কত কাল আগে। সেদিনের বড়কাকি আজ ঘরণী গিন্নি।

সেদিনের সেই প্রথম পরিচয়ের কথা আজও ভোলেনি বড়কাকি। মাঝে মাঝে বড়কর্তাও মনে করিয়ে দেয় সেই পরিচয়ের দিনের কথা।

সরকার বাড়ির বড়ছেলে এখন বড়কর্তা। কত বছর কেটে গেছে। সেদিনের রাখাল শওকত এখন ফেরীঘাটের ইজারাদার, ইজারা পেয়েছে বড়কর্তার তদ্‌বিরে। হাজার ঝড় ঝাপটার মধ্যেও কয়েক বিঘে জমি সংগ্রহ করে পেটের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। পরী আর কাস্মুর ভবিষ্যত ভেবেই এসব করেছে।

আরও অনেক ঘটনার সাক্ষী শওকত।

সরকার বাড়ির উৎসব কখনও ভাটা পড়ে না। এই বাড়ির ছোটকর্তার বিয়ের পর প্রথম গাঁয়ে আসার উৎসব। আগের মতই ডিঙি সাজাতে হয়েছে শওকতকে। শহুরে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ছোটকর্তার। সেই বউ আসছে শহর থেকে। কানা-ঘুষা সেও শুনেছে এ বউ নাকি মেম বউ। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে রেসের ঘোড়ার মত টগ্‌বগিয়ে চলে ! হারানকর্তা লোক ভাল। তারই বউ। হারান লেখাপড়া শিখে নাকি জজের আদালতে চাকরি পেয়েছে। কেউ কেউ বলে জজ হয়েছে। হারানকর্তার বিধবা মা বলে, আমার হারু সোনার ছেলে। তাতেই বা কি। ওর শত্তুরের শেষ নেই। তাই হারুকে বড় কাজ দিতে দেয়নি। তা হোক বাপু। অমন সোনার ছেলে জজ না হয়ে লাট হলেই বা ক্ষতি কি। নেহাত দারোগাগিরি তার প্রাপ্য। একথা শওকতও বোঝে।

হারান বিয়ে করেছে পশ্চিম দেশে।

বিয়ের দুবছর পর এই প্রথম হারানকর্তা বউকে গাঁ দেখাতে আনছে। হারানকর্তা ভাল লোক। যেখানে জন্মেছিল, এই সেই গ্রাম। দুই বছর বিয়ে হলেও বউ নিয়ে সে আসেনি কখনও। গাঁয়ের নতুন বউ তা বলে আনকোরা নতুন নয়। তবুও ঘাট সাজাতে হবে। লায়েক ছেলের বউ হলে অনেক কিছুই করতে হয়।

বড়কর্তার বিয়ের সময় যেমন সোঁতার ঘাট থেকে কলাগাছ পোঁতা হয়েছিল, তেমনি ভাবেই কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। মঙ্গল ঘট বসানোও হয়েছে। মাঙ্গলিক সম্পূর্ণ করতে কচি আমপাতার ঝালর টাঙানো হয়েছে। আবার নতুন কলসীতে জল ভরে

সিঁদুরের আলপনা দেওয়া হয়েছে। এত আয়োজন। হারানকর্তার বউ আসছে। এ আয়োজনও কম মনে হচ্ছে।

কাল দুপুর নাগাদ পালকি পেঁছাবে ঘাটে। ঘাট থেকে বরাবর হেঁটেই তার বাড়ির উঠোন পর্যন্ত সবাই যায়। শুধু নতুন বউ ডিঙিতে ওঠে। এ রেওয়াজ চলে আসছে অনেক দিন থেকে। নতুন বউ বাড়ির ঘাটে পা দেবে আর কোথাও নয়।

ছোটবেলায় সরকার গিন্নীর কাছে হারানকর্তার গুণপনা শুনেছে সবাই। জোর দিয়ে সরকার গিন্নী বলত, তার ছেলে জজ হবে। না হলে ম্যাজিস্তর। জেলা শহরের কলেজ থেকে বেশ ভাল ভাবে পাশ করার সংবাদ যখন গাঁয়ে পেঁছেছিল তখনও বেশ ভোজের ব্যবস্থাই হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত জজ ম্যাজিস্তর হতে পারেনি। সরকার বাড়িতেই শুনেছে লাটসাহেব নাকি জজের খাতা থেকে হারানকর্তার নাম কেটে দিয়েছে। তা কেউ জানে না। বলে, আফিমখোর লাটসাহেবকে নাকি নায্যমত ইনাম দিতে পারেনি। হতেও পারে। সাহেবদের মর্জি কাউকে রাজা করে, কাউকে ফকির করে। তাই জজ না হয়ে জজের আদালতে তাকে কাজ করতে হবে। কি কাজ তা কেউ জানার চেষ্টাও করেনি, পরের ব্যাপারে মাথা ঘামায় কজন! কোথায় কোন্ পশ্চিমাদের দেশে চাকরি করছে, সেখানেই সে থাকে। উর্দিপরা যে চৌকিদার ক্রোক করতে আসে দেনাদারের অস্থাব স্থাবর সেও নাকি জজের আদালতে কাজ করে। জজের আদালত সেকি কম ব্যাপার। কত লোক, কত কাজ। গাঁয়ে বসে সে সব জানা সম্ভবও নয়। অতশত শওকত জানে না দরকারও হয় না। হারানকর্তা ভাল লোক। সরকার গিন্নীর সবার ছোটছেলে। আদরের ও আশার প্রদীপ।

সরকার বাড়ির আঙিনায় রোজ হাজিরা দেয় শওকত। কবে হারানকর্তা আসবে সেই দিনটির অপেক্ষা করে। বউ আসার খবর আসা থেকেই উৎসব। নবীন বাদ্যকর ঢোল-কাঁসি নিয়ে রোজই দেখা করে যায় সঠিক তারিখ জানতে। দুবেলায় পঞ্চাশটা পাতা পড়ছে আঙিনায়। দেখতে দেখতে স্বজন দুর্জনে বৈঠকখানা ভর্তি হতে থাকে, ভেতর বাড়িও সরগরম।

শওকত এসবে অবাক হয় না। এটা সরকার বাড়ির রেওয়াজ। দেড়গণ্ডা বউ মেয়ে এসেছে গেছে শওকতের নাওয়ে চেপে। তবে এত হৈ চৈ আগে কখনও দেখেনি। চারদিকে সাজ সাজ রব। সরকাররা জমিদার নয়, চাষী গেরস্ত তবে বড় চাষী। নিজেদের হাল দিয়ে চাষ না হলে ভাগের চাষ করা। আর্থিক বনিয়াদ খুবই শক্ত রোজ বিহানে মুনীষ যায় শহরে সওদা আনতে, রোজ সাঁজে এক-দুই করে আত্মকুটুম্ব এসে পেঁছায় সরকার বাড়িতে।

বড়কর্তা আজকাল রস খেয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি করে না। সাঁঝের বাতি জ্বলতে না জ্বলতেই শহর থেকে গাঁয়ে ফিরে আসে, আবার আকাশ ফাঁক হতে না হতেই রওনা হয় শহরে। গাঁয়ের ভাল মন্দ সব মানুষ এসে পাতা পাতছে আঙিনায়। এ যেন মহোৎসব।

সরকার বাড়ির সব কাজের দায়িত্ব বড়কাকির। এত বড় একটা উৎসব। চাল

সেন্দতো কম হবে না। ধানের গোলার সামনে দাঁড়িয়ে বড়কাকি ধান মেপে দিচ্ছিল। মাস্তুবালা বস্তা বোঝাই করে ধান নিয়ে যাবে ভানতে। গুটি গুটি পায়ে সেখানে হাজির হল শওকত।

ধান মাপা শেষ হতেই শওকত চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, এত জোলুষ কেন বড়কাকি? এর আগে তুমি এসেছ ঘরের বড় বউ, কই এমন তো তখন হয়নি। স্মরণ কালে সরকার বাড়িতে এত উৎসব, এত জমজমা চোখে তো পড়েনি বড়কাকি।

নিশিচান্দিঠাকরেণের বিধবা মেয়ে পুতিরানী পাশে দাঁড়িয়েছিল, ফোড়ন কেটে সে বলল, তোমার কথায় মনে হচ্ছে বউ আসছে পটের বিবি, ওকে দিয়ে কি হবে, সে বাড়াও ভানবে না চিড়েও কুটবে না।

শওকতের সহ্য হল না। সরকার বাড়ির উৎসব যে তারও উৎসব। যেন রোখের মাথায় বলল, আমাদের হারুই বা কম কিসের। যোগ্যি লোকের বউ ধান ভানবে কেন? ধান ভানা যাদের তারা তেমনি ঘরেই আসে। নসীব হল আসল কথা।

শওকত না বুঝেই কথাটা বলেছিল।

সবাই চেনে নিশিচান্দিঠাকরেণকে। তার মুখ আর গলা এক সঙ্গে বেজে উঠলে মহা মহা রথী ভূমিশয্যা নেয়। দন্জালিতে তার খ্যাতি তল্লাটের লোক জানে। তারই মেয়ে পুতিরানী তার মাকেও হার মানিয়েছে। সবাই জানে পুতিরানী সুনাম-দুর্নামের তোয়াক্কা করে না। কটুকথা বলতে, অসম্মান করতে তার জুড়ি নেই। বিধবা হলেও বৈধব্যের আচরণগুলো মোটেই রুচিসম্মত কেউ মনে করত না। না জেনেই শওকত সাপের লেজে পা দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কেউটের মত ফোঁস করে উঠল পুতিরানী। বলল, এ কি তোদের মোছলমানের বিয়ে। সোয়ামির তালাক খোঁজে সাত নিকে করতে।

জাত তুলে কথাটা সহ্য করতে পারল না। গর্জে উঠল। বল তাও ভাল। তারা নতুন সোয়ামির ঘর করে। আমাদের শাস্তরের বিধান।

হয়ত তো এটা অনেক দূর গড়াতো।

বড়কর্ত্রী ধমকে উঠল, শও বেটা!

মাথা নিচু করে শওকত বার-বাড়িতে এসে দাঁড়াল।

তোমার কি রকম আক্কেল বল দেখি পুতি। জাত তুলে কথা বললে ঝগড়া কাজিয়ার শেষ হয় না। তাতো জান ওরকম কথা আর বল না পুতি।

খবর এসেছে আগামীকাল হারানকর্তা আসবে বউ নিয়ে। রাতের বেলায় শওকত ডিঙি সাজানো আরম্ভ করল। নৌকাটাকে মকর করতে হবে। হিন্দুদের মকর হল বড় দেবতা এটা শোনা কথা। সামনের গলুইয়ার দুই পাশে পেতলের চোখ লাগাল মকরের অনুকরণে, বাটা হলুদে ছুপিয়ে দিল গলুইয়ের ডগা, সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে দিল গলুইয়ের দু'পাশ। তেল রঙে নকশা আঁকল হালের বৈঠায়। পাটাতনে বিছিয়ে দিল মোটা করে শুকনো খড়। সরকার বাড়ি থেকে সিমুল তুলোর বালিশ আর সাটিনের চাদর এনে ভাল করে বিছানা পাতল। গাঁদা ফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দিল নৌকার দুপাশের গলুইতে।

ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে পরখ করল কতটা সুন্দর হয়েছে তার ডিঙি। ঘাটে যারা

আসছিল তাদের জিজ্ঞাসা করছিল কেমন হয়েছে সাজানো। কেউ কোন বদল করে
বললে তা মেনে নিয়ে বদলও করল। হারানকর্তা আসবে তার কুঁচবরণ পত্নী কাঁকন
মালাকে নিয়ে, বরণ করে তুলতে হবে শওকতের ডিঙিতে। এমনি ধারা তিরিশ বছ
ধরে আসার পথে বরণ করতে হয়েছে সরকার বাড়ির বউদের, বিদায় দিতে হয়ে
সরকার বাড়ির মেয়েদের।

সাজানো ডিঙির দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে শওকতের মনে হয় এম
সুন্দর করে ডিঙি সাজানো তার পক্ষে সম্ভব হল কি করে। আজ যেন রূপের গর
তার ডিঙিখানা হেসে উঠছে। একটা কাঠের নৌকা তার যে এত সৌন্দর্য তা শওক
কখনও কল্পনাও করেনি। অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে ডিঙির দিকে। তার
কৃতিত্ব যে মা যশাইয়ের দয়া তা মনে হতেই বার বার সেলাম জানায় মা যশাইকে।

শওকতের মন চলে যায় আরও দূরে। যেদিন এমনি করে ডিঙি সাজাবে তা
বেটা কাম্মুর বউ আনতে। কবে যে সেদিন আসবে খোদা মালুম। মধুবর
নাইয়া না থাকলে কি হয় শওকত বেপারি তো রয়েছে, তার সম্বল তার সবল ম
আর সঙ্গী তার ফেলে আসা অতীতের মধুমাখা স্মৃতি।

হাতের কাজ সেরে সরকার বাড়ির আঙ্গিনায় বসে একছড়া বিচিকলা চটকে স
মাত্র এক সানকি চিঁড়েতে জল দিয়েছে এমন সময় খবর এল হারানকর্তা নতুন ব
নিয়ে পেঁছে গেছে যশাইয়ের ঘাটে। হন্তদন্ত হয়ে শওকত ছুটে এল খাওয়া ছেড়ে
এমনি করে সরকার বাড়ির নানা কাজে তাকে ছুটতে হয়েছে মুখের খাবার ফেলে
এতে আফসোস নেই। আনন্দ আছে। সে কখনও ভাবেনি, সে সরকার বাড়ির কে
নয়। লোকে অনেক সময় তামাসা করেছে। তার উত্তরে বলেছে, এটা তার প্রাপ্য
মেনে নিয়েছে ইমানদার হিসেবে নিজেকে নিমকহালাল ভেবে।

খবর শোনা মাত্র আর পেছনে তাকায়নি শওকত। ছুটে চলে গেল ঘাটে।

হারানকর্তা বউ নিয়ে উঠল ডিঙিতে।

নতুন বউ দেখে খুশির আমেজে শওকত হাঁপিয়ে উঠল।

সরকার বাড়িতে তখন নানা প্রস্তুতি চলছে। বড়কর্তা কীর্তনের ব্যবস্থা করেছে
বারোহাটের নমোর দল এসেছে, ওরাই তল্লাটের নাম করা কীর্ত্তনীয়া। তাদে
গড়াই বিশ্বাস যখন মাথুর শুরু করে তখন শ্রোতার দল হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে
বোধহয় আনন্দের আতিশয্যে।

অনেকটা দূরে বাঁদিপোতা ঢাকা জায়গায় বসে মেয়েরাও কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
শওকতও কীর্তনের বড় সমজদার! বারোহাটের নমোদের কীর্তন শুনতে ভিন্ গাঁ
গেছে অনেক পথ হেঁটে। গায়ে ব্যথাও হয়েছে অনেক সময়। পা দুটো টন্ টন
করলে মাঝরাতে পরীকে ডেকে তুলে পায়ে তেলও ডলিয়েছে। পারঘাটার ফেরী
কাজ কামাই করতেও কসুর করেনি। কখনও কাম্মুকে বসিয়ে কখনও জেলেপাড়া
কোন মাঝিকে বসিয়ে গেছে। আজ সেই কীর্তনীয়ারা এসেছে হারানকর্তার বউকে
কীর্তন শোনাতে।

শওকত শুনেছে ঋষির গাঁয়ের ঘোষেরা নাকি ভাল কীর্তনের দল গড়েছে। সবাই

বলে নমোদের দুয়ো দিচ্ছে ঘোষেরা। হবেই বা না কেন। স্বয়ং কেষ্ট ঠাকুর ওদের ঘরেই জন্মেছিল। রক্তের গুনেই ওদের এত গুমোর। ওরা সেরা কীর্তনীয়া, মহরা নেবার সাধ্য কার। তাদের কাছে হার মেনেছে বারোহাটের নমোর দল। গড়াই বিশ্বাস নাকি নিজেই স্বীকার করেছে, গয়লা বারি নিধু বয়সে ছোট হলে কি হবে তার গলার কাছে শ্যামের বাঁশীও হার মানে।

সবাই তা স্বীকার করে না। নমোরা দাবী করে তারাও নারায়নী সেনার বংশ। ঘোষদের হার মানতেই হবে তাদের কাছে। তারাও ঘোষদের দুয়ো দেবেই। দুদলই প্রস্তুত। দুদলই এসেছে হারানকর্তার নতুন বউকে সওগাত দিতে। এবার পরীক্ষা হবে কাদের দলের কত ক্ষমতা। আজ রাতেই হবে কীর্তনীয়াদের লড়াই।

ডিঙি সাজাতে সাজাতে শওকত ভুলেই গিয়েছিল কীর্তনের কথা। হারানকর্তা আসতেই খুশীতে মন ভরে উঠল তার। এবার মনে পড়ল। নতুন বউ। নতুন কীর্তনীয়ার দল। আনন্দে ডগমগ শওকত বেপারী।

সকালবেলায় বড়কর্তা ডেকে বলেছিল, ডহরপুরের পালান মণ্ডলের পুতুল নাচ বায়না করেছি শওকত। মোটামুটি উৎসবটা জমবে ভাল, কি বলিস।

তা আর বলতে বড়কর্তা।

শহুরে বউ, পুতুল নাচ তো কখনও দেখেনি, তাই পুতুল নাচ বায়না করলাম।

ঠিকই তো, শহরে ছবিতে কথা বলে, যাত্রার দল আসে। থিয়েটার হয়। এসব তো নতুন বউ দেখেনি। ভালই করেছে বড়কর্তা।

বড়কর্তা কখনও বাজে কথা বলে না। পুতুল নাচওলারা এসেই যাবে। কর্তাদের খুশীতে তল্লাটের লোক খুশী হবে।

পুতুল নাচ সে অনেকবার দেখেছে। রাবন রাজা মাটিতে পড়ে হা-রাম হা-রাম চিৎকার করে উঠলে শওকতের চোখ জলে ভরে ওঠে। গাল বেয়ে টস্ টস্ করে জল গড়ায়। রামের চেয়ে রাবনকে বেশি ভাল লাগে। হাঁ মরদের মত মরদ। রাম তো বউ-বউ করে পাগল। নাগাল না পেয়ে বাঁদরের পেছন পেছনে ঘোরে। কিন্তু রাবন-রাজা বউয়ের আঁচল ধরে কেঁদে বেড়ায় না। রাজা বাদশাহ ওকেই বলে, বাদশাহ রাবন মাটিতে গড়াতে থাকে। হায়রে, অত বড় রাবন রাজা সেও মাটিতে পড়ে পানি পানি বলে রোয়াব ছাড়ে। হায় হায় বাদশাহ রাজা। যাদের কদম পড়ে না মাটিতে কোন কালেও সেই বাদশাহ রাজারাও মাটিতে পড়ে কেঁদে কাঁদিয়ে বাঁচে না।

একেই বলে খোদার মার দুনিয়ার বার।

নোয়াপাড়ার হাজিসাহেবের ওয়াজ শুনেছিল একদিন।

হাজিসাহেব বলেছিল মিশরের সুলতান পায়ে হেঁটে হর সাল মক্কায় আগে আবে জমজমের পানি নিতে। এই একবারই সুলতান হয়েও মাটিতে কদম রাখে। আর কোন দিনই মাটিতে কদম রাখে না। রাবন সুলতান হয়েও মাটিতে পড়ে নিজেরই দুশমন রামের সাথে মোলাকাত করতে চায়। তাজ্জব ব্যাপার। এর চেয়ে বদনসীব আর কিছু আছে! অনেক ভেবেও এর কিনারা করতে পারেনি।

ডিঙিতে বসে শওকত পুতুল নাচের কাল্পনিক দৃশ্যগুলো ভাবতে ভাবতে মশগুল

হয়ে যায়। হঠাৎ নিজেকে ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে, আজকের রাতের কথা ভাবতে থাকে যা এর আগে কখনও দেখেনি অথবা শোনেনি, আজ তাই দেখবে আর শুনবে।

নতুন বউকে ঘাটে নামিয়ে ফিরে এল পারঘাটায়।

ডিঙি গলুইতে বসে পুতুল নাচের কথাই সে ভাবছিল। আর ভাবছিল সাঁঝের আঁধার নামলে নৌকা খুঁটিগাড়ি করে ছুটবে সরকার বাড়ির আঙ্গিনায়। ততক্ষণ হ্যাজাক বাতির মিঠে আলোতে আঙিনা ঝলমল করবে নিশ্চয়।

তিন

শওকত বহুবার পুতুল নাচ দেখেছে। তার কাছে নতুন কিছু নয়। বড়কর্তা পুতুল নাচের কথা বললেও সে নিজের দিক থেকে খুব খুশী হয়নি। নতুন বউ পুতুল নাচ দেখবে এতেই তার বেশি আনন্দ। আনন্দ। গাঁয়ের মানুষ যা ভাল বলে শহুরে মেয়ের কি তা পছন্দ হবে, ভাল লাগবে! তবুও হারানকর্তার বউ তো গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে বসবে, গরীব মানুষদের পাশে একজন হয়ে বসাইতো আনন্দ। এতে আনন্দ পাবে গাঁয়ের গরীব গুবরো মেয়েরা। শওকতের এটাই হবে পরম পরিতৃপ্তি।

শওকত পুতুল নাচের কথা ভাবছিল। মনে হল একবার পুতুল নাচ দেখে এসে পরীকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি মরে গেলে তুই কি করবি পরী?

পরীর তখন জোয়ান বয়স। উঠতি জীবন। ভরা জীবনের ইঙ্গিত তখন তার কানায় কানায়। ভরা নদীর একমাত্র নাইয়া হল শওকত। এই অলক্ষুণে কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠল পরী।

শত্তুর মরুক, দুষমন কবরে যাক, তুই মরবি কোন দুখে।

আহা, আমি মরব তা বলছি না। বলছি আমি মরলে তুই কি করবি!

জানি না। তোর মনে এসব কথা জাগল কেন?

সেই তো বলতে চাইছি। রাবন রাজা মরল কিনা!

তাই বল। তুই পুতুল নাচ দেখে এলি। তোর কথার ঢঙে আমার জান বেহাল হবার জোগাড়। রাবণ রাজা মরলে পরীজানের কোন্ লোকসানটা হয় বল দেখি!

শওকত বোধহয় হেসেছিল। অন্ধকারে হাসিটা দেখা যায়নি।

পরীজান দাওয়াতে চাটাই বিছাতে বিছাতে বলল, দেহটা ভাল লাগছে না। ঝড় বৃষ্টির দিন।

অল্প কথায় শওকতকে সব কথা জানিয়ে দিয়ে পরী নিজের কাজে মন দিল।

এই সেই পরীজান। যাকে ঘরে আনার সময় কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়েছিল। পরীজানকে বিয়ে করে গোবিন্দপুরের মাঠ দিয়ে যখন আসছিল তখন পরীর বয়স এগার-বার। বিয়েটা দিয়েছিল গাঁয়ের পাঁচজন মুরুব্বির তদ্বিরে। ছ-কুড়ি টাকা মোহরানা কবুল করে পরীকে ঘরে আনতে হয়েছিল। পরী এসে তার ঘর আলো করেছে। সংসারের হাল ধরেছে। কত ছোট ছিল সে সময় অথচ কাজে কর্মে ছিল পাকা গিন্নি। সেদিন থেকে চোখের আড়াল হতে দেয়নি একটি দিনের তরেও।

কাছ ছাড়া না হওয়াতে পরীর আহ্লাদেপনা বেড়ে গেছে। তারপর পাঁচ বছর ঘটেছে। পরী মা হতে পারেনি। পরী হা হুতোশ করে মরে। ছ'বছরের মাথায় রীর রূপ ফেটে পড়তে থাকে। শওকত তামাসা করে বলেছিল, তোর হল কি পরী?

পরী বুঝতে না পেরে বলল, কই কিছু তো হয়নি।

আরশি দিয়ে মুখখানা দেখেছিস?

ওঃ। তোর আবার সোহাগ বাড়ল দেখছি। এই কদিন আগে বললি, আবার মি নিকে করব। আর আজ তোর চোখ টাটাচ্ছে।

নিকে বললেই নিকে হয়। শওকত বেপারি রুটি রুজি জোটাতে হয়রান তার রেক বিবি! বাপুরে। তোকে ঠাট্টা করছিলাম, তাও বুঝিস না। সরকার ড়ির বড়কর্তারও তো ছেলে হয়নি, সে কি নিকে করেছে।

আসলে ট্যাঁকে তোর পয়সা নেই। নইলে—?

শওকতের মনে ভেসে ওঠে চলে যাওয়া পাঁচ বছরের সব কথা। কত মান অভিমান জিয়া কোঁদল করে তারা একই ঘরে বাস করেছে, সুখ-দুঃখ ভাগ করে। পয়সা কলে কি সত্যিই সে নিকে করত। গোবিন্দপুরের মাঠ, ফাঁকা মাঠ। আলের পর দিয়ে শওকতের পিছু পিছু কাঁদতে কাঁদতে পরী আসছিল। কোন বরাত নেই। দ্যি নেই, ঘোমটা টানা ছোট্ট পরী মাঝে মাঝেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছিল, তুই মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস। আমি তোর সাথে যাব না। আমি বা'জানের ছে ফিরে যাব। সেই পরীজান আজ নতুন চেহারা নিয়ে তার সামনে ঘুরে ফিরে ড়াচ্ছে। আজ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পরীজানের দিকে, মনেই হয় না সেই পরী-ান আর আজকের পরীজান একই মেয়ে।

বিয়ে যে কি শওকত নিজেও বুঝত না। সরকার বাড়ি রাখালি ছেড়ে সবে সে রঘাটার ইজারা পেয়েছে। সেই সাথে গাঁয়ের মাতব্বরদের চেষ্টায় বড়কর্তাই তার য়ে ঠিক করে দিয়েছিল। ছোট্ট এই খুকিটা তার ভাত রাঁধবে, পায়ে তেল লিশ করবে, ঘর নিকোবে এইটুকুই সে জানে। শওকত বুঝেছিল, পারঘাটার কাজ জায় রাখতে হলে বাড়িতে ভাত রাঁধার লোক চাই। ভাতের থালাটা ঘাটে পেঁছবার নাকও চাই। আগে সরকার বাড়িতে খেতে পেত দু'বেলা। নগদ কটা টাকাও পেত খালি করে। এখন তো রাখালি নেই, এখন ঘরে রান্না না করলেই নয়। পারঘাটার াজ বজায় রাখতে হলে নিজে ভাত ফুটাবে কখন। মাঝে মাঝে ডিঙিতে বসে তোলা নুনে ভাত ফুটিয়ে নিত। এত ঝামেলা শওকতের ভাল লাগে না। সহজ উপায় ল বিয়ে করে বউ ঘরে আনা। সেটাই শওকত করেছে।

গোবিন্দপুরের মাঠ পেরিয়ে নিজের ঘরে পেঁছে পরীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই চ বাপ ছেড়ে থাকতে পারবি না।

পরী কোন উত্তর না দিয়ে কেঁদেছিল।

রাগ করে শওকত বলেছিল, তা হলে তুই ফিরে যা, প্যান প্যানানি ভাল লাগে না পু। বউ আমার দরকার নেই। ডিঙি বৈঠা থাকলেই হল।

পরী ফিরতেও পারেনি। আজন্মকাল শুনে এসেছে। মেয়েদের বিয়ে হলে

স্বামীর ঘর করতে হয়। স্বামীর ঘরই নিজের ঘর। তাকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু স্বামীর ঘর যে কি তা সে জানে না। সামনের ওই জোয়ান মরদটা তার স্বামী

পর্দার ওপারে নানীর সঙ্গে বসেছিল পরীজান। উকিল এসে পর্দার ওপার থেকে জিজ্ঞাস করল, বিয়ে কবুল কিনা? তার হয়ে তার নানী বলল, হাঁ কবুল। তারপর মত্তলদ পাঠের সময় একবার মাত্র লোকটার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিল। তার কচিমন বলেছিল, লোকটা বোধহয় ভাল।

বিয়ে করে পরীজানকে নিয়ে সোজা উঠেছিল সরকার বাড়ির আঙ্গিনায়। বড় কর্তা বউয়ের মুখ দেখে আল্পাকার শাড়ি দিয়েছিল। যত্ন করে আজও সেই শাড়িটা তুলে রেখেছে। তখন সরকার বাড়ির সব কতই ছোট ছোট। ছোট ছোট কর্তারাও ভিড় করেছিল বউ দেখতে। বড়কাকি একজোড়া সোনার মাকড়ি দিয়েছিল, সেই মাকড়ি আজও ঝুলছে পরীর কানে।

ছোট তরফের যোগিন্দির শুধু তার সময়বয়সী, তারও বিয়ে হয়নি তখনও পরের বছর যোগিন্দির বিয়ে করে এল। কি ধুমধাম। শওকতের ডিঙ্গি করেই যোগিন্দরের বউ এসে নামল আঙিনায়। সেদিনের সেই পরীজান ছ'বছর ঘর করল। এখন আর বাপের বাড়ি যেতে বললে কাঁদে, অভিমানে কথাই বলে না। আরও কত বছরও ঘর করতে হবে। সে সব কথা নিয়ে পরী মাথা ঘামায় না।

এখনও মনে পড়ে প্রথম প্রথম পরীজান কাঁদত। রাগ করে দু'তিন দিনও রান্নাও করত না। শহরে গেলে পরীর জন্য নাকছাবি, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা এনে দিত। পরীর মান ভাঙ্গাতে চেষ্টা করত নানাভাবে। পরী না রাঁধলে নিজেই রান্না করে নিত। কোন কোন দিন দুপুরবেলায় কারুর হাতে ডিঙি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি যেত। কোন কোন দিন পরী ঘুমিয়ে থাকলে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত। কোন কোন দিন পরীকে খুঁজে বের করতে হয়রান হয়ে যেত। একদিন তো আমগাছের মাথা থেকে 'কু' দিয়ে শওকতকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল।

আয় নেমে আয়। ঘরের বউকে গাছের ডগায় দেখলে গাঁয়ের লোক যে নিন্দে করবে। বেয়া বলবে। শীগ্‌গীর নেমে আয়।

গাছ থেকে নামার কোন আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, বলুক গে। আমি কি ওদের ঘরের বউ। বেয়া বললে বয়ে গেল। গাছে কাকের বাসায় কোকিলের ছা ধরতে উঠেছি।

শওকত শঙ্কিত ভাবে বলল, সর্বনাশ! কোনদিন বা সাপে খাবে দেখছি।

যেন কত মজার কথা। পরী হি-হি করে হাসতে হাসতে গাছ থেকে নেমে এসে শওকতের সামনে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে বলল. সাপ! সেদিন কি হয়েছিল জানিস! ওই বড় পাইকোর গাছতলায় গরু বাঁধতে গিয়ে দেখি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে এক মহারাজ। দৌড়ে বাড়ি এসে শলাই নিয়ে গেলাম। তখনও মহারাজের ঘুম ভাঙ্গেনি। শুকনো পাতা কুড়িয়ে দিলাম চারদিকে আগুন। আর যায় কোথায়। বেটার বদমাইশি শেষ, সোজা দোজখে, বুঝলি।

হি-হি করে হাসতে হাসতে শওকতের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সেই পাইকোর

গাছতলায়।

পোড়া গাছের পাতা দেখিয়ে বলল, পেত্যায় তো হল।

শওকত বলল হুঁ! শোন্ পরী, কাল সকালে শহরে যাব ইজারার টাকা জমা দিতে। তোর জন্য কি আনব বল।

আমার! মাথার ওপর ঘোমটাটা ভাল করে টেনে বলল, বউ মানুষ। আমার আবার কি চাই! বেশ, তুই একটা ঝুনঝুনি আনিস, একটা সুষুমালতির কৌটা, কেমন!

ঝুনঝুনি আর সুষুমালতি দিয়ে কি করবি?

রাতের বেলায় মরার মত যখন ঘুমোবি তখন গালে সুষুমালতি মেখে তোর নাকের কাছে মুখটা রাখব, খুশবোতে ঘুম না ভাঙ্গলে কানের কাছে ঝুনঝুনি বাজাব। বলেই পরী হাসতে হাসতে ছুটল। শওকত খপ্ করে তার আঁচল চেপে ধরে পেছন পেছন ছুটতে লাগল।

এসব ছোটবেলার মধুর স্মৃতি, আজও তাদের মনে আছে।

সেই পরী মা হবে। শওকত তো ভেবেই বাঁচে না ভালর চেয়ে মন্দটাই মনে লাগে বেশি। ছেলে বিয়োতে পরী যদি মরে যায়, তা হলে?—না, মরবে না। পরী তাকে রেখে মরতেই পারে না।

পুতুল নাচ দেখে এসে খুশী মনে খোলা কথা ঠাট্টা করে বলতেই খিঁচিয়ে উঠল, এরপর আর কোন কথা থাকতে পারে না। গোবিন্দপুরের ঘাট পেরোতে যে পরী অত কেঁদেছে, এ যেন সে পরী নয়। শওকত ভাবছিল সে মরে যদি জিনদানা হতে পারত তা হলে মেপে দেখার সুযোগ পেত কতটা ভালবাসা আছে পরীর বুকে তার জন্য।

সে মরলে পরী নিশ্চয়ই কাঁদবে। আমতলায় বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে তখন গাছের মাথায় জিনদানা হয়ে দেখতে থাকবে পরীর মজাটা। ভয় হয়, তার মরবার পর পরী যদি আবার নিকে করে। তা হলে? দুজনেরই গলা টিপে মারবে। এত ভালবাসা সে যদি ভুলে যায় তা গলা টিপে মারবে না কেন? গলা টিপে মারতে কতই বা সময় দরকার নিমেষেই কাজ শেষ।

ভাবতে ভাবতে নিজেকেই নিজে ধমকে দিল। পরী মরবেও না। সেও জিনদানা হবে না। নিজে নিজেই হেসে ওঠে খক্-খক্ করে। বদনাটা টেনে নিয়ে চোঁ-চোঁ করে জল খেয়ে সুস্থ হয়।

পরীজান কাঁকালে হাত দিয়ে তেড়ে এসে বলল, অত তিয়াস যদি লেগেছে তা হলে কিছু মুখে দিলেই পারতিস।

শওকত হেসে বলল, এতদিনেও তিয়াস মেটাতে তো তুই পারলি না।

বেকায়দার রসিকতায় পরী লজ্জায় ঘোমটা টেনে পালিয়ে গেল। এই সলজ্জ চাহনিটুকুর অপেক্ষাই বোধহয় করছিল পরীজান।

শোন্ পরী। আজ আবার পুতুল নাচ হবে, যাবি দেখতে?

মানষির নাচ দেখা শেষ হোক তারপর পুতুল নাচ দেখব।

কথাটা শওকত বোঝে। তবুও সে বুঝেও বুঝতে চায় না।

পুতুল নাচের কথা শুনেই এই সব পুরানো কথা মনে পড়ছে শওকতের।

হারানকর্তার বউ আসবে, আবার সেই পুতুল নাচ। বড়কর্তার হুকুম। আবার হৈ হট্টগোল। নতুন কাকির সামনে এবার পুতুল নাচ হবে। সেদিন যে মন নিয়ে শওকত পুতুল নাচ দেখতে যেত সেদিন আর নেই, পরীর বয়স বেড়েছে, কাম্মু লায়েক হতে চলেছে, আবার সেই পুতুল নাচ হবে। কিন্তু আজও পরীর মানষির নাচ দেখা শেষ হয়নি, এবারও সে পুতুল নাচ দেখতে যাবে না।

ডিঙির গলুইতে বসে শওকত পুরানো কথা ভাবতে ভাবতে মনের গহনে তলিয়ে যায়। অথৈ জলে আর কূল খুঁজে পায় না।

সরকার বাড়ির ঘাটে ডিঙি এসে লাগল।

হারানকর্তার হাত ধরে জুতো পায়ে মটমটিয়ে নতুন বউ ডিঙি থেকে নেমে সবার আগে চলতে আরম্ভ করল। নতুন বউয়ের চলনটা ঠিক মনের মত নয়। শওকত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, হিন্দুবাড়ির আদব কায়দাই আলাদা।

শওকত তখন কাম্মুর কথা ভাবছে। তার ছেলেও কবে বউ নিয়ে নামবে যশাইয়ের ঘাটে, নতুন বউয়ের মত মট্‌মটিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরীজানের সামনে গিয়ে কদমবুশ করবে। এমনটা দেখলেও তার প্রাণটা ঠান্ডা হবে।

কাম্মু আর কাম্মু নেই। সে এখন কমরুদ্দিন। ধীরে ধীরে বাপ-মায়ের আওতার বাইরে চলে গেছে। কমরুদ্দিন এখন খাঁটি মুসলমান হবার স্বপ্ন দেখছে, কেমন করে যে তার এই শখ জাগল তা সে নিজেই জানে। শওকত কি খাঁটি মুসলমান হতে পারেনি, কবে যে খাঁটি মুসলমানদের দল থেকে হটে গেছে তা কে বলতে পারে! তবে শওকত জানে, মুসলমান চিরকাল মুসলমান, ধর্মে কর্মে মুসলমান হলেও সে খাঁটি বাঙালী। যেমন বাঙালী সরকার ও ঘোষেরা। কাম্মু কি এর চেয়ে বেশি কিছু হতে চায়।

ঘটনাটা হঠাৎ-ই ঘটেছিল। শহর থেকে কাম্মুর সঙ্গে এসেছিল রহিম তর্কবিশারদ। রহিমকে শওকত কোনদিন চোখে দেখেনি, তার কথা অনেকের মুখেই শুনেছে, শুনেছে সে মস্ত বড় পীর। তার পানিপড়া খেলে গোরের মরা লাফিয়ে ওঠে।

রহিমের কদর আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক কাম্মুই ভাল বোঝে। তার খেদমত করতে করতে কাম্মু হয়রান, পরীজানও হয়রান, তবুও রহিমের নাক উঁচুই থাকে। চলতে ফিরতে বে-শরীয়তি কাজের হিসাব করে।

পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে রহিম নানা কথা জিগোস করছিল কাম্মুকে। শওকতের কানে সব কথাই ছেঁচাবেড়া ভেদ করে পেঁছাচ্ছিল।

রহিম বলল, বে-নমাজির হাতের পানে না-পাক। সব মুসলমানকে নমাজি হতে হবে মিঞা ভাই। পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়া চাই। সে দিকে নজর রেখ।

বলছি তো সবাইকে, শুনছে না। মুখ্যু লোকদের নিয়ে যত ক্যাচাল। অনেকেই তো জীবনভোর নমাজ-ই পড়েনি। আল্লার কালামই শোনেনি।

তোবা, তোবা। ওদের হাতের পানি পর্যন্ত খেও না মিঞা ভাই। সমাজে আটক কর। আর কাফেরের হাতে ভাত খেও না কখনও। আল্লার গজব পড়বে।

সবই শুনেছিল শওকত। সহ্য হচ্ছিল না। ঘরের মেহমাণকে তো অপমান করা যায় না। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। রহিমের সব কথা শোনার ইচ্ছাও ছিল না।

সকালবেলায় উঠেই কাম্মু তার মাকে নিয়ে পড়ল।

মা তোমাকে নমাজ পড়তে হবে।

হবে। পরীজান ভেবে নিয়ে বলল, কিন্তু পড়তে জানি না বেটা, শিখিয়ে দিতে হবে। তবে যা শেখাবি তার অর্থটাও বলে দিস।

কাম্মু বলল, শেখাব। অর্থটা জেনে এসে তোমাকে বলব।

মাকে ওজু করাতে বসল কাম্মু।

শওকত দাওয়ায় বসে সব দেখছিল। পরীজানের ওজু করতে দেখে সে খুশীই হল। ভাবল পরী একটা কিছু নিয়ে দিন কাটাতে পারবে। গতরাতের রহিম তর্কবিশারদের কথাগুলো তার মনে খোঁচা দিচ্ছিল, হঠাৎ বলে উঠল। কাম্মু তোর তর্কসাহেবের রাতের খানাপিনা ঠিক হয়েছিল তো?

হাঁ বা'জান। না হবার কি কারণ থাকতে পারে।

তোর মা আবার বে-নমাজি কিনা। তাই না-পাক খানা আর পানিতে তার বদহজম হয়নি তো—

কাম্মুর মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেল।

তুই কমরুদ্দিন, আমি তোর বাপ। বাপকে অস্বীকার করতে পারবি কি?

কাম্মু কোন উত্তর দিতে পারল না।

শওকত আবার বলল। তোর তর্কসাহেবকে জিগ্যেস করে তার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার নাম জেনে আয়, হিন্দুর ঘরেই তারা পয়দা হয়েছিল কিনা।

এর জবাবও দিতে পারল না কাম্মু।

কাফের যদি মোছলমান হতে পারে তা হলে কাফেরকে ঘেন্না করার মত দুষ্টবুদ্ধি তার কেমন করে হল। পুরানো বাপ-দাদাকে ঘেন্না করলে কি মোছলমান হওয়া যায়? জিগ্যেস করে আয়। আমরা তো মক্কা মদিনা থেকে আসিনি, এই দেশের লোক। যারা কাফের তারাও আমাদের জ্ঞাতগোষ্ঠী।

তা বলে,—কাম্মু যেন বলতে চাইছিল। তাকে বাধা দিয়ে শওকত বলল, আল্লা দুনিয়া পয়দা করেছে। মানুষ পয়দা করেছে, আল্লার এই দুনিয়াতে পাক না-পাক বোঝা বড় কঠিন ব্যাটা। না-পাক হয়েও তোর মা তোকে পেটে ধরেছে। সেই না-পাক মায়ের পেটে জন্মেই তোর পাক হবার বুদ্ধি গজিয়েছে। সেই মায়ের ছোঁয়া পানি যদি না-পাক হয় তা হলে পাক কি থাকতে পারে জেনে আসিস। আর মাকে মা বলে ডাকিস না। তা হলে আল্লার গজব পড়বে তোর ওপর।

কথা শেষ করে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে শওকত বেরিয়ে গেল।

সেই দিনই পাততাড়ি গুটিয়ে রহিম তর্কবিশারদ শহরে ফিরে গেছে। তার

প্রধান চেলা কাম্মুও গেছে তার পেছন পেছন।

এরপর অনেকদিন কাম্মু ঘরে ফেরেনি।

প্রত্যেক শনিবারে পরী আশা করে কাম্মু ঘরে আসবে কিন্তু হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে। শেষে একদিন বলল, এ শনিবারেও তো কাম্মু এল না।

শওকত উদাসভাবে পরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, জানিস পরী, সবা চলে গেলেও আমরা দুজন থাকব। কাম্মু না এলে ক্ষতিটা কার। যে ছেলে মাে ইজ্জত দেয় না সে ছেলের না আসাই ভাল।

পরী আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি। গোপনে চোখের জল ফেলেছিল কিনা তা জানা যায়নি। শওকত মন যেমন শক্ত করেছিল তেমনি শক্ত হয়ত করতে পারেনি পরী; কিন্তু কখনও কোনও অনুযোগ করেনি।

আজ হঠাৎ কাম্মুর বয়স হিসাব করছিল শওকত।

যেবার খুব বন্যা হয়েছিল সেবার তো কাম্মুর জন্ম।

শওকত আঙুল গুণে বলল! তা হলে কাম্মুর বয়স উনিশ কুড়ি হবে। কি বলিস পরী?

হতে পারে। অত হিসাব আমি জানি না। ছেলে লায়েক হয়েছে।

শওকত গম্ভীরভাবে বলল, এই বয়সেই তোর সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল তাই না?

বোধহয় তাই। তুই বুঝি কাম্মুর বিয়ের কথা ভাবছিস।

হুঃ। কাম্মুর বিয়ে দেবার কেমন একটা নেশা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। আমি তো ভরসা করে ওকে বলতে পারিনি, তোকে বলতে বলেছিলাম।

পরী বলল, ব্যাটা হাঁ-না কিছুই বলেনি।

দেখ পরী এটাই হল বিয়ের বয়স। এই সময় ওর বিয়ে না দিলে নানার বয়সে বিয়ে করবে না কি? হারানকর্তার বউ এসেছে, আমার ছেলের বউ আসবে না।

পরী হেসে বলল, ছেলে লায়েক হয়েছে। বিয়ে করা না করা তার খেয়াল খুশী আর মর্জি।

শওকত কাম্মুর বিয়ের কথা বাদ দিয়ে বলল, চল পুতুল নাচ দেখে আসবি।

অনেক বলে কয়ে যখন পরী পুতুল নাচ দেখতে রাজি হল না তখন শওকত নেহাৎ অনুযোগের সুরেই বলল, কমপক্ষে নতুন কাকিকে দেখে আসবি. চল।

না। আমিও তো একদিন নতুন বউ ছিলাম। নতুন বউ কাকে বলে। নতুন বউ হলে কি হয় না হয় আমার জানা আছে। তুই দেখগে, আমার দরকার নেই।

হাল ছেড়ে দিয়ে শওকত হুঁকো নিয়ে বসল। এসব পুরানো দিনের কথা। পুরানো মনটাও হারিয়ে গেছে। দেহটাও ধীরে ধীরে পুরানো হয়ে গেছে। মনের সামর্থ্য যেমন কমেছে তেমনি কমেছে দেহের সামর্থ্য। শওকত যেন অনেকটা দিশে-হারা হয়ে পড়েছে। এত কাল মনের জোরে বেপোরোয়া হয়ে চললেও কখনও হতাশ হয়নি। কিন্তু আজ কাম্মুর চালচলন দেখে সে যেমন মনমরা হয়ে গেছে। পরি-

ত্রাণের পথও খংজে পাচ্ছে না।

অথচ ছোট্টবেলায় কাম্মন যখন চারপোয়া পথ হে'টে মক্তবে পড়তে যেত তখন ঘাটে নৌকা বে'ধে দিনের পর দিন বই-কেতাব বগলে করে ছেলেকে মক্তবে পে'ীছে দিয়ে আসত। ছেলের এলেম হবে এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। প্রথম যেদিন অ-আ, ক-খ পড়া শিখে শ্লেটে আঁচড় কেটে লিখতে শিখল সেদিন শওকত আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। তার ছেলে তো জজ ম্যাজিস্ট্রর হবে না। আদালতের বটতলায় মহুরীগিরি করতে পারলেই যথেষ্ট। এইটুকু এলেম হলেই সে খুশী। সেই দিনের প্রতীক্ষা করতে থাকে শওকত।

পড়াশোনায় কাম্মন নেহাত খারাপ নয়। মক্তবের মওলবীরা তাকে ভালও বাসত। দিন এগিয়ে চলেছে। কিন্তু জ্ঞানবন্দ্ধি হবার সাথে সাথে আগেকার কাম্মন যেন কোথায় হারিয়ে যেতে থাকে। এরপর যখন আলফ বে-পে তে পড়তে থাকে, সন্ধ্যা বেলায় আলেফ জবর আ, আলেফ জের এ, আলেফ-পেশ-উ পড়তে থাকে তখন শওকত আরও বেশি আনন্দিত হলেও সে লক্ষ্য করছিল আগের কাম্মন আর নেই, সে হয়ে উঠছে পাকা মোছলমান।

কাম্মন আজকাল শহরেই থাকে।

কি করে তা তার বাপ-মা জানে না। মাঝে মাঝে বাড়ি এলেও এমন কিছন কথা হয় না।

ছিচরণের বাপ সেদিন শহর থেকে এসে বলল, শওকত ভাই, তোমার কাম্মনকে দেখলাম ভেলেণ্টারি করছে।

ভেলেণ্টারি কি গো ?

তাও জান না। লম্বা চোগাচাপকান পড়ে রাস্তায় কুচ্ করছে।

কুচ্! সে আবার কি।

তাও জান না। বলেই ছিচরণের বাবা হাতের লাঠিখানা কাঁধে ফেলে মার্চ করে দেখিয়ে দিল কেমন করে কুচ্ করছে কাম্মন।

শওকত বন্ঝল, তার ছেলে জঙ্গী হয়েছে। তা জঙ্গী হবার মতই তার চেহারা। কিন্তু কুচ্ করে কি ফায়দা হবে তা শওকত বোঝে না তাই মনে মনে ভয় পেল। শেষে মহারাণীর ফৌজের সিপাহী হবে না তো।

শনিবারে হঠাৎ কাম্মন এসেছিল।

কাম্মনকে সামনে পেয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, তুই নাকি কুচ্ করছিস ?

কাম্মন হেসে বলল, হাঁ, বা'জান। মোছলমানরা ছিল এদেশের মালিক। আবার মোছলমানরা হবে এদেশের মালিক। তাই আমরা শিখে রাখছি মালিক হলে দেশে কেমন করে ফৌজ রাখতে হবে। বা'জান, এহল ফৌজি ট্রেনিং, বন্ঝলে।

শওকত কাম্মনর কোন কথাই বন্ঝতে পারল না, তবন্ও বলল, মালিক যদি হবি তা হলে লাঠি ঘাড়ে করে তোকে কুচ্ করতে হবে কেন ?

ও তুমি বন্ঝবে না বা'জান। দেখছ না রাজা-জমিদার সব হিন্দন। সরকারি চাকরি করে হিন্দনরা। মোছলমানের কিছন আছে কি !

আছে রে আছে। মোছলমানের আছে ইমান। শুধু নমাজ পড়লে মোছলমা হওয়া যায় না। ইমানদারী চাই। ইমানদারী মোছলমানরা সহজে হারায় না।

ওসব কথা ছাড়। ক'জন হিন্দু মিলে মোছলমানদের পায়ের তলায় রাখবে তো হতে পারে না। তাই আমরা—

ও বুঝেছি। জানিস বেটা, মোছলমান ইমানদারী হারিয়েছিল বলেই মুল্লুকে মালিকানা হারাতে বাধ্য হয়েছিল। হিন্দু গোলামদের সহ্য হচ্ছে না। এবা তোরা গোলামি নিবি। তার জন্য কুচের দরকার হয় না। কেঁদে কোঁকিে সায়েবদের পা ধরে পড়ে যা, তাতেই হবে। তোরা যেমন ওদের সহ্য করতে পারছি না, তেমনি ওরা যদি সহ্য করতে না পারে তাহলে কি হবে। লড়াই দাঙ্গা হে ভাইয়ে ভাইয়ে। মহারাণীর লোকেরা হাসবে আর সরকারীর ভাড়াটে সেপাইর দু'তরফকেই ঠ্যাঙ্গাবে। এই তো!

কাশ্মু বোধহয় এতটা আশা করেনি।

রাগে গর্ গর্ করতে করতে বাপের সঙ্গে ভাল করে কথা বলাই বন্ধ করে ছিল।

শওকত দুঃখিত হলেও মুখে কিছু বলল না।

চার

রাতের বেলায় পরীকে পাশে বসিয়ে বলল, শুনলি তো ছেলের কথা।

শুনলাম, তোকে তো বলেছি বেটা বেটি বড় হলে তারা মায়েরও নয় বাপেরও নয়। আল্লার মাল। আল্লাই ওদের জিম্মাদার। তবে মায়ের পরাণ, ছেলের জন্য হা-হুতোশ করাই হল লাভ।

হুঃ। বলে শওকত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চাটাই থেকে উঠে পড়ল।

কোথায় যাচ্ছিস?

বড়কর্তার কাছে। তার কাছেই শুনে আসব সত্যি সত্যি আমাদের সব কিছু ওরা গিলেছে কিনা।

ওসব কথা নিয়ে মন খারাপ করিস নে মিঞা। বাপ দাদার জমানা থেকে দেখছি, হিন্দু মুসলমান চালে চাল বেঁধে বাস করছে। আজ হঠাৎ জোয়ান ছেলেদের মতিগতি বদলে যাচ্ছে। এটাও খোদার রহম বুঝলি মিঞা। মেনে নিতেই হবে। ছেলে তো। ফেলে দিতে তো পারবি না।

শওকত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ভাবছিস? ছেলের কথা ভেবে মন খারাপ করিস না। আমাদের কেউ নেই রে। আল্লা আছে।

শওকত হতাশভাবেই বলল, ঠিক বলেছিস। আল্লাই ভরসা। আমি যাই, হারান-কর্তার জন্য কীর্তন হবে রে, তুই শুনতে চাস না। আমি একাই যাব। গেলে দেখতে পেতি কত লোক ভিড় করেছে।

পরী কোন জবাব দিল না। শওকত বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হতেই সরকার বাড়ির আঙিনায় ভিড় জমেছে। এ-পাড়া, সে-পাড়া, এ-গাঁ, সে-গাঁ, আশেপাশের মেয়েপুরুষ ভেঙে পড়েছে। শহর থেকে ডে-লাইট এসেছে। বারোহাটের নমোর দল এসেছে, ঋষির গাঁয়ের ঘোষেরা এসেছে। এসেছে পালান মণ্ডল। এসে উঠোনের পশ্চিম কোণায় দরমা বেঁধে কাপড় টাঙিয়ে পুতুল নাচের ঘর করেছে।

এসব সরকার বাড়িতে নতুন কিছু নয়।

কোন কিছু উৎসব আনন্দে কীর্তনীয়াদের ডাকা হয়। বিশেষ বিশেষ উৎসবে ডাকা হয় পুতুল নাচের দলকে।

আলো জ্বালাবার সাথে সাথে সবাই উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল, কখন পুতুল নাচ হবে আর কখন হবে কেত্তন।

পুতুল নাচের মেয়াদ তো এক ঘণ্টা, বড় জোর দেড় ঘণ্টা। কীর্তন তো সারা রাত চলতে পারে। বড়কর্তার হুকুমে পালান দলবল নিয়ে প্রস্তুত হল। তারা সার দিয়ে বসল পুতুল নাচের ছাদনার সামনে। ড়ুম-ড়ুম-ড়ুম ঢোল বাজল, ঝন্-ঝন্-ঝন্ করতাল বাজল। সামনে পর্দাটা ধীরে ধীরে সরে যেতেই আরম্ভ হল পুতুল নাচ।

গৌরহরি, গৌরহরি। ঢোলে দমক দিয়ে গান ধরল পালানের দল।

পালান ছাঁদনার সামনে এসে হাত জোর করে সুর করে বলল, শুন হে গুণীজন।

ধুয়া ধরল দোহাররা ; শুন গুণীজন।

পালান এবার চিৎকার করে বলল, শ্রীহরি গৌরবিনোদের নাম নিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা মায়ের কাহিনী এবার আরম্ভ করছি। আপনারা অনুমতি দিন।

অবশ্য অবশ্য বলে সম্মতি দিতেই পালান বলল, আজকের পালা মহীরাবণ বধ।

এতকাল সবাই রাবণবধ পালা দেখেছে। পালান এবার নতুন পালা বেঁধেছে মহীরাবণ বধ। আজই প্রথম তার মহরা হবে বড়কর্তার আঙিনায়। পালার নাম শুনে সবাই খুশী হল। পালানের বলা শেষ হতেই ঢোলকে বোল তুলল তার দলবল সঙ্গে সঙ্গে পর্দার সামনে সুতোয় বাঁধা শোলার পুতুল নাচতে নাচতে এল।

মহীরাবণ যে পাতালের রাজা, রাবণপুত্র তা ক'জনই জানে। আকাশ পাতাল শুনেছে অনেকেই। পাতালটা যে মাটির তলায় তাও অনেকে জানে না। সেই মাটির তলার দেশের রাজা মহীরাবণ। রাবণের আদেশে রাম লক্ষ্মণকে চুরি করে নিয়ে গেছে পাতালের অন্ধকার দেশে। সেখানে তাদের বলি দেওয়া হবে কালীর মন্দিরে। সব ব্যবস্থাই পাকা। অনেকের মনে সংশয় এই ভাবে রাম লক্ষ্মণ বধের কথা তো আগে কেউ শোনেনি।

দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়ে গেছে।

তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে কোথা থেকে হনুমান এসে হাজির। সবাই তো ভয়ে মরছিল। এই বুঝি রাম লক্ষ্মণের মুণ্ডু মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। হনুমান পবননন্দন, পবনের বেগে ছুটে এসেছে। বীর হনুমান হল রাম লক্ষ্মণের অনুগত ও আসল শক্তির উৎস। এবার নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবে রাম লক্ষ্মণ। মহীরাবণ তো কানু ছাড় স্বয়ং স্বর্গের ইন্দ্র এলেও রক্ষা নেই তার।

কি ভয়ংকর যুদ্ধ হল হনুমান আর মহীরাবণে।

মহীরাবণ মরল, তাতেই শেষ হল না। স্বামীকে মরতে দেখে মহীরাবণের স্ত্রী ছুটে এল তরবারি হাতে নিয়ে। আবার যুদ্ধ হনুমান আর মহীরাবণের স্ত্রীর সঙ্গে।

মহীরাবণের স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। হনুমান তার পেটে লাথি মারতেই সন্তান প্রসব করেই মারা গেল মহীরাবণের স্ত্রী। সদ্যজাত সন্তান হল অহিরাবণ। জন্ম-মাত্রই সে হাতিয়ার নিল হাতে। আবার যুদ্ধ। অহিরাবণ আর হনুমানের যুদ্ধ চলল কিছুক্ষণ। ওই পুঁচকে ছেলে মরল হনুমানের হাতে। তাকে তুলে আছাড় মেরে শেষ করে দিল হনুমান। পাতালে রাবণ বংশের শেষ চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে হনুমান ফিরে এল লংকার যুদ্ধক্ষেত্রে।

পুতুল নাচের পালা শেষ।

শ্রীহরি গৌরবিনোদ-এর নাম নিয়ে পালান তার পালা শেষ করল। বায়নার টাকা আগে বুঝে পেয়েছে। এবার ফেরীর পয়সা আধলা কুড়িয়ে পালান দলবল নিয়ে আঙিনা থেকে উঠে গেল।

পুতুল নাচ শেষ হতে না হতেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কেত্তন আরম্ভ হবার উদ্যোগ আয়োজন চলছে।

অপেক্ষা করছে বড়কর্তার নির্দেশের।

শওকত গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে বসল বড়কর্তার কাছে।

কেমন লাগল রে শওকত?

ভালই। তবে কর্তা যা বলেন, হাঁ বীর বটে অহিরাবণ। পয়দা হয়েই কি লড়াইটা করল। তাজ্জব হয়ে গেছি বড়কর্তা।

পালান নাকি নতুন নতুন পালা বাঁধছে আজকাল। দেখি আর এক-আধটা নতুন পালা পরশু করানো যায় কি না।

শওকত মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ফিস্ ফিস্ করে বলল, নতুন কাকি দেখেছে কি পুতুল নাচ?

ছিল তো এতক্ষণ, নিশ্চয়ই দেখেছেন, এবার কেত্তন আরম্ভ হলেই আবার আসবে। তোর বড়কাকিকে জিজ্ঞেস করে আয় সবাই আসরে এসেছে কিনা। এলেই কেত্তন আরম্ভ হবে।

শওকত গেল বড়কাকির খোঁজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, বড়কাকি বলল, সবাই আসরে বসছে। খোলে টোকা দিতে বল। নতুন কাকিকে শুধোলাম, কেমন দেখলে কাকি। নতুন কাকি বলল, খুব ভাল, নাইচ্।

বড়কর্তার নির্দেশ পেয়েও কেত্তন আরম্ভ করতে বিলম্ব করছিল বারোহাটের নমোরা।

অস্থিরভাবে বড়কর্তা বলল, ওরা দেরি করছে কেন?

শওকত খবর নিয়ে এসে বলল, ওদের অমৃত আসেনি। অমৃত খোল বাজায়! বলল, এখুনি এসে যাবে।

সবাই জানে অমৃত নামকরা খোলবাজিয়ে। তার খোলের বোলে মানুষের মনের

কথা ফুটে বের হয়। তার নাম ডাকের সঙ্গে বায়নাও আসে অনেক জায়গায়। সময় সময় শহরে গিয়েও খোল বাজিয়ে আসে। শহরে পাওয়া রূপোর মেডেল গলায় ঝুলিয়ে সে কেত্তনের আসরে আসে, শ্রীখোলকে কয়েকবার নমস্কার করে তবেই চাঁটি মারে।

রোগা ঢ্যাঙা, চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। আঙুলের মাথা থেকে ঘাড় অবধি হাতের শিরাগুলো ফুলে থাকে। এই শক্ত শক্ত কাঠির মত আঙুল যখন খোলে চাঁটি দেয় তখন সবাই কান পেতে শুনতে থাকে শ্রীখোলের শ্রীবাণী। তার হাতে খোল বাজে বলেই বারোহাটের নমোদের কেত্তন শুনতে দশ গাঁয়ের লোক জোটে। সেই অমৃত গরহাজির। অমৃতকে বড়কর্তাও খুঁজে পাচ্ছিল না।

পুতুল নাচ শেষ হতেই নমোর দল প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিল। অমৃত এতক্ষণ বসে-ছিল, কখন যে সে উঠে গেছে কেউ জানে না। কেউ তো আর চোখ দিয়ে বসেছিল না। ভিড়ের মধ্যে মোষের মত কালো অমৃত যে অমৃতের সন্ধানে যাবে তা কে জানত। ডে-লাইটের আলো ঝোপের পাশে আটক হয়ে ঘুরঘুটি অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। সেই আঁধারে মিলিয়ে গেলে কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। অমৃত তো কালো কেষ্ট, তাকে খুঁজে বের করবে কে।

নমোরা কিন্তু নিশ্চিত মনে বসে আছে। তারা জানে অমৃত কোথায় গেছে। কতক্ষণে ফিরবে তাও তারা হিসাব করে বলতে পারে। বড়কর্তা জিজ্ঞেস করতেই নমোরা মাথা নেড়ে বলল এখুনি অমৃত আসবে কাকা। ওকে তো আমরা জানি। করতালের ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনলেই ছুটে আসবে।

বড়কর্তা বিরক্তির সাথে বলল, রাত যে বেড়ে চলল। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ছে।

দুপালা কেত্তন হবে। একটু রাত হবে বইকি। খোলের শব্দ পেলে সবাই উঠে বসবে। কেত্তন শেষ হতে বিহান হতেও পারে কাকা।

পাঁচ

অমৃত ফিরেছিল সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই। অমৃত রসে ভাসে না। শুকনো ধুঁয়ো না হলে তার হাত খোলে না। সুখটান আড়ালে দিয়ে এসে বসল আসরে। এবার তার প্যাঁকাটির মত আঙুলগুলো ছুটবে। দেহের শক্তি নেই বলেই তো সে শুকনো নেশা করে।

অমৃতকে গাঁজার কথা বললে সে হাসে।

একি আজকের অভ্যাস মশাই। ছোটবেলায় জোয়ারীর আশ্রমে যখন যেতাম তখন থেকে গুরুর পেসাদ পেতে পেতে বেশ নেশারু হয়ে পড়েছিলাম। গুরুকে ছাড়লাম কর্তা কিন্তু নেশা ছাড়তে পারলাম না। প্রথম প্রথম গুরু কলকে ভরতে বলত, লোভ হত, গুরু পেসাদি পাবার আগেই অমৃত দু-এক টান দিয়ে পেসাদ করে কল্কে এগিয়ে দিত গুরুকে।

আশ্রম ছেড়ে এসেছে অনেক কাল আগেই। গুরুর বিদ্যাটা হজম করতে পারেনি অমৃত। যখন আশ্রম থেকে ফিরল তখন সঙ্গে নিয়ে এল দুটি বিদ্যা। একটি এই

শ্বকনো নেশা, অপরটি খোলের বোল। বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার কোলাকুলি না হয়ে তো পারে না। তাই সঙ্গে এল একটি অবিদ্যা। এই অবিদ্যাটি হল গর্ব্বর পরিত্যক্ত একটি য্বতী বোষ্টুমি। লোকে অবিদ্যা বললেও, সত্যি সত্যি সে অবিদ্যা নয়। বৈষ্ণবী বড় ভাল মেয়ে।

যৌবন তখন ঢল ঢল না হলেও যৌবন মিইয়ে যায়নি। অম্‌তকে বাঁচিয়ে চলতে অবিদ্যা কম মেহমত করেনি। বলতে গেলে তারই গ্বণে ও সেবায় অম্‌ত বেঁচে আছে। সেও অনেক চেষ্টা করেছে অম্‌তকে শ্বকনো নেশা ছাড়াতে পারেনি। বোধহয় অম্‌ত বোষ্টুমিকে ছাড়তে পারে নেশাকে ছাড়তে পারে না। কিন্তু বোষ্টুমির গলায় যেন মধ্ব। তার গলার সাথে হাত মিলিয়ে খোল বাজাতে বাজাতেই অম্‌ত হয়েছে সেরা খোল বাদক।

অম্‌তকে দেখা মাত্র গৌরহরি বলে করতালে ঘা পড়ল। র্বন র্বন করে করতালের শব্দের সাথে অম্‌ত খোলের বোল মিলিয়ে দিতেই আসর জমে গেল। ঘ্বমন্ত ছেলে মেয়েরা উঠে বসল।

শওকত এক পাশে বসেছিল।

কেত্তন শ্বর্ব হতেই এগিয়ে এসে বসল।

কোলের শিশ্বরা আঁতকে উঠে কাঁদতে থাকে। মায়েরা শিশ্বর ম্বখে স্তন তুলে দিয়ে তাদের কান্না বন্ধ করতে চেষ্টা করতে থাকে।

আজকের পালা বিরহ।

কৃষ্ণ যাচ্ছেন দ্বারকায়।

ব্‌ন্দাবন ছেড়ে দ্বারকায় যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। রাধিকাকে রেখে শ্রীকৃষ্ণ যাচ্ছে, শ্রীরাধা এ খবরটা জানে না।

সমাচার এসেছে রাধার কাছে। খবর পেয়ে রাধা ছ্বটলেন, কৃষ্ণের রথ প্রস্তুত। পাগলের মত ছ্বটতে ছ্বটতে রাধা এল কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে।

ম্বল গায়েন স্বর তুলল, পথে দেখা কুটিলার সাথে।

কোথা যাও সখী?

আমার প্রাণনিধি দ্বারকায় যাচ্ছে। তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

কুটিলা বলল, তোমার রাই যে দ্বারকার রাজা। রাজ্য ছেড়ে তোমার সঙ্গে যম্বনার তীরে কেলি করার কথা ভুলে যাও সখী। এই দিন দ্বপ্বরে লজ্জার মাথা খেয়ে তুমি ছ্বটছ। তোমার কি ভয় ডর নেই।

ম্বল গায়েন গাইল, তোর কি ভয় ডর নেই।

দোহাররা সাথে সাথে ধ্বয়া তুলল, তোর কি ভয় ডর নেইরে। ওরে কালাম্বখী, তোর কি ভয় ডর নেই?

শ্রীরাধা বিনিয়ে বিনিয়ে বলল, ভয় ডর লজ্জা, রাই থাকতে ও তিনটে আমার থাকতে নেই আমার সব কিছ্বই যে রাইয়ের পায়ে নিবেদন করেছি সখী। আমি কৃষ্ণের দাসী। দাসীর ভয় ডর লজ্জা তো নিবারণ করবে আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ।

কুটিলা ম্বখ ঘ্বরিয়ে বলল, যারা কালাম্বখী তাদের ওসব থাকে না তোরও নেই।

মূল গায়েন আবার গাইল, কালামুখীর মরণ-ভাল।

দোহাররা তার সাথে ধুয়া তুলল।

শ্রীরাধা করুণ ভাবে বলল, মরণ হবে কি করে। রাই দ্বারকা গেলে যমুনার জলও যে শুকিয়ে যাবে। ডুবে মরার জলও থাকবে না।

মূল গায়েন এবার সুর ধরল :

গোপীকুল নন্দন হরিল আমার মন

আমাকে কাঁদাল কুঞ্জ পরিহরি।

দোহাররা তার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠল, গোপীকুল নন্দন হরিল আমার মন।

কেত্তন এগিয়ে চলছে।

শওকতের ভাল লাগছিল না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাবে। রাধা একা থাকবে। থাকবে বই কি! তার জন্য এত নাকে কাঁদা কেন বাপু। আবার তো শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসবে। শওকত নিজেও তো ডিঙি নিয়ে ভিন বন্দরে মাল নিয়ে গেছে। দুতিন দিন পরে ফিরে এসেছে। পরী তো এমন নাকে কাঁদেনি। সবই ওদের বাড়াবাড়ি। শওকতের ভাল লাগছিল না। উঠে এসে বড়কর্তাকে বলল, এ পালা বন্ধ করে দিন বড়কর্তা।

বেশ তো। তোর বুঝি ভাল লাগছে না।

বিয়ের বউ নয়। প্রেমের সখি, তার কাঁদন ভাল লাগে না কাকা।

বড়কর্তা হেসে বলল, এই তো বিরহ। চিরকাল বউ নিয়ে ঘর করলি কিনা। তোর এসব জানা নেই। তোর বিবি তো ঘর ছাড়েনি। তুইও বিবিকে ছেড়ে চলে যাসনি। তাই এসব বুঝবি না। যেত যদি তোর বিবি কমাসের লেগে ভিন গাঁয়ে তবেই বুঝতি।

এই সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য শওকতের কোনদিন হয়নি। সে আবার উঠে এসে বসল।

জোয়ান বয়সে কত রাত জেগে এই কেত্তন শুনতে দশ পোয়া বার পোয়া পথ হেঁটে সে ভিন্ গাঁয়ে গেছে। তার এই বেয়ারা কাজের জন্য পরীর কাছে কত কথা শুনতে হয়েছে।

সেবার খবর পেল লক্ষ্মীকোলের হাটে শহর থেকে কীর্তনের দল এসেছে। কয়েক রাত কেত্তন হবে।

রাতের খাওয়া শেষ হতেই পরীকে বলল, একটু বাইরে যাচ্ছি পরী।

কোথায় যাবি এই রাতের বেলায়?

লক্ষ্মীকোলের হাটে।

সে তো অনেক দূর। কেন যাবি। সেখানে তো সোঁতা নেই পায়ে চলতে হবে।

একটু পুঁথি শুনতে যাব।

তুই যাবি পুঁথি শুনতে মিছে কথা।

কেন এর আগে সেরকোলে তো গিয়েছিলাম পীরের দরগায় পুঁথি শুনতে।

তা ঠিক। তবে আজ তুই মানিক পীরের পুঁথি শুনতে যাবি না। তোর এই

কাঠামোতে ওটা সহ্য বেশি দিন হবে না। সত্যি করে বল।

হাঁরে, হাঁ, পুঁথি শুনতেই যাব, মানিক পীরের পুঁথি না হলে আর কোন পুঁথি বুঝি শোনা যায় না। সব পুঁথিই ফকির সন্তদের কথা থাকে। ফারাক কিছু নাই রে।

পরীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বেরিয়ে পড়ল।। জল কাদা ভেঙে লক্ষ্মীকোলের হাটে গিয়ে সারা রাত কেত্তন শুনে সকালবেলায় ফিরে এসেছিল ঘরে।

কিন্তু সুস্থ শরীর নিয়ে শওকত ফিরতে পারেনি। সকালবেলায় তার গায়ের তাপটা বেড়ে গিয়েছিল, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল। চোখ দুটো রাঙা হয়ে গেছে।

শওকতের অবস্থা দেখে কটু কথা বলবে কি, পরী তো কেঁদেই বাঁচে না।

অভিমানের সুরে বলল, তোকে মানা করেছিলাম শুনলি না। কোলের ছেলেটা কাঁচা কচি গ্যাদা তাকেই সামলাব, না তোকে সামলাব। ভাল করে শো। তোর মাথায় পানি দি, তাপটা ওতেই কমবে।

শওকত কোন কথা না বলে ঢক্ ঢক্ করে এক বদনা জল খেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। পরী পড়ল বিপদে। ছুটে গেল বড়কাকির কাছে। সব শুনে বড়-কাকি ডাকিয়ে পাঠাল বড়কর্তাকে। বড়কর্তা চিন্তিত ভাবে বলল, আমার মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া। শোন বড় বউ আমার টেবিলে পোস্টাপিসের কুইনাইনের বড়ি আছে। চারটি বড়ি দাও। বলে দাও, দিনে তিনটে করে খাবে। আর জল খাবে ঘটি ঘটি।

পরী বড়ি নিয়ে এসে শওকতকে খাইয়ে রান্নার জোগাড়ে গেল।

শওকত জিজ্ঞেস করল, বড়কর্তা কি বলল রে?

ম্যালেরিয়া। চারটে বড়ি দিয়েছে, আজ তিনটে কাল একটা তারপর যদি না ছাড়ে তা হলে অন্য ব্যবস্থা করবে। আর তাপ কমলে আরও বড়ি খেতে হবে।

সারাদিন ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল।

মাঝরাতে শওকত ডেকে বলল, তাপটা দেখত পরী। কম মনেই হচ্ছে।

গায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর তখন ছেড়ে এসেছে।

সকালবেলায় চাট্টি মুড়ি গুড় খাইয়ে আরেকটা বড়ি দিয়ে বলল, এটা খেয়ে তুই বড়কর্তার কাছে যা। তাপ নেই।

তাপ নেই কিন্তু কান মাথা ভোঁ ভোঁ করছে যে পরী।

যেমন বেমার তেমন দাওয়াই। পানি খা বেশি করে।

ম্যালেরিয়া শওকতকে বড়ই শিক্ষা দিয়ে গেছে। সেই থেকে আর কেত্তন শুনতে বাহিরে কোথাও যায়নি। তবুও আশে পাশে কেত্তন হচ্ছে শুনলে শওকত থাকতে পারেনি। তার মন ছুটেছে। কখনও কখনও দেহটাও ছুটেছে। কেন যে কেত্তন ভাল লাগে একথা সে নিজেও জানে না। খোলের ডগায় ঘা লাগালেই শওকত আঁট সাঁটো হয়ে বসে।

সেই বারোহাটের নমোদের দল কেত্তন গাইছিল। আজও। বুড়োরা অতীতের কথা স্মরণ করেই বোধহয় চোখ মুছছিল। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কিছুই বুঝতে না

পেরে মাঝে মাঝে গোলমাল করছিল। কেউ কেউ ঘুমে ঢুলছিল। জোয়ানরা আনন্দ পাচ্ছিল! তবে কেউ কেউ তাদের নতুন গিন্নীদের সাথে বিরহ যদি ঘাট এই ভেবে ভয়ও পাচ্ছিল। বিরহ সহ্য করা সহজ নয়। অথচ ঘরে বউ থাকলে কাজিয়ারও অন্ত থাকে না।

নিস্তব্ধ রাতের বুকে গানের মূর্ছনা আর খোলের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। জুতসই হয়ে বসেছে। এবার রথ ছুটবে। রথের ঘোড়া পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। শ্রীরাধা দৌড়ে এসে ঘোড়ার বলগা চেপে ধরে বসল, নাথ কোথা যাও?

মূল গায়েন রাধার কথাটা সুরে বলল, রাই, যেতে নাহি দিব।

দোহাররা ধুয়া তুলল, কোথা যাও নাথ, যেতে নাহি দিব।

যেতে দেব না।

যেতে দেব না।

কিন্তু রাধাপ্রাণ কৃষ্ণের রথ থামল না। তবুও রথ ছুটে বেরিয়ে গেল। শ্রীরাধা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। চোখের জলে বুকের আঁচল ভিজে গেল। ভেজা আঁচলে শ্রীরাধার রূপ যেন ফেটে পড়ল। এমন মোহিনী মূর্তি দেখে সখীরা অবাক হয়ে গেল।

হরি হরি গৌর। বলে মূল গায়েন পালা শেষ করল।

সবাই বলল, সাধু, সাধু।

এবার বিশ্রাম। নমোদের পালা শেষ। এবার ঘোষদের পালা।

ঘোষদের দলে অমৃতের মত খোল বাজিয়ে না থাকলেও তাদের দলের গায়েনরা গানে মজিয়ে তুলতে পারে শ্রোতাদের। এই ভরসায় তারা এসেছে।

ঘোষপাড়ার জীবন ঘোষ বলল, বড়কর্তা, ওরা বিরহ গেয়ে গেল, আমরা গাইব রাসলীলা।

বড়কর্তা সবাইকে জানিয়ে দিল ওরা বিরহ গেয়েছে। ঘোষেরা গাইবে রাসলীলা।

শ্রোতারা উদগ্রীব হয়ে আটো সাঁটো হয়ে বসল।

শওকত এই সুযোগে বড়কর্তার গরম কল্‌কে দুই হাতের চেটোয় চেপে তামাকে কয়েকটা টান দিয়ে এক গাল ধুঁয়ো ছেড়ে ভাল হয়ে বসল।

শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করছেন। গোপ-গোপিনীরা নেচে নেচে গান করছে। কদম্ব কুসুমের মালা গেঁথে শ্রীরাধা এসেছেন শ্যামের গলায় পরিয়ে দিতে।

ঘোষপাড়ার নিমাই ঘোষের ষোল সতের বছরের ছেলে হল মূল গায়েন। নিমাই ঘোষের খ্যাতি হল তার নিমখাসা দইয়ে, তার ছেলে শৈলেনের খ্যাতি হল তার মধুর কণ্ঠস্বর। গৌরপাণা মুখ, টানা টানা চোখ, দোহারা চেহারা, গলায় তুলসীর মালা কপালে চন্দন, গায়ে নামাবলী।

শৈলেন সুর করে বলল, শ্রীরাধা আসছে।

কেমন করে আসছে?

নিতম্বিনী শ্রীরাধা আসছেন, গমনে বিলম্বিনী, পায়ে নূপুর বাজছে রুনুঝুন, হাতের কাঁকন বাজে ঝনঝনিয়ে। চললে গমক, চলে গমগমিয়ে। শ্রীরাধা এলেন

তমাল তলে।

এবার মূল গায়েন গাইল, নীল যমুনা, নীল পিয়াসী আমার রাই।

দোহাররা ধুয়ো তুলল, সেথা কে যায়, কে যায়!

কে যায়, তার ব্যাখ্যা দিল মূল গায়েন। কেউ যায় না, যায় শ্রীমতী রাধা।

কেমন সে রাধা?

শ্রীরাধার রূপের আর শেষ নেই। বর্ণনাও করা সম্ভব নয়। বলেই মূল গায়েন বলল, পীনোন্নত বক্ষ। মৃণালদামের মত পেলব বাহু। প্রেম মদির স্নাত নয়ন যুগল, নয়নে নব ভঙ্গিমা। রক্ত বিম্বের মত অধরোষ্ঠ, শ্রীমতী চলেছেন গজেন্দ্র গমনে। নৃত্যের ছন্দে, নিতম্ব যুগল পরস্পরকে আঘাত করে আহত করছে বাঁকা শ্যামকে, অপলকে এই সৌন্দর্য পান করছে শ্যাম তার দুটো পিপাসু লোচন দিয়ে।

তারপর?

মূল গায়েন সুর দিল ঃ

অধরে অধর দিয়া বাঁকা চলে যমুনা তটে।

মানিনী রাধা।

সখীসহ ত্বরিতে গমন করে।

রাই সঙ্গ পেতে।

তারপর?

নীল যমুনা উতোল হল।

দোহাররা ধুয়ো তুলল, নীল যমুনা উতোল হল।

রাত শেষ হতে চলেছে। কীর্তন তখন চলছে পুরো দমে।

শ্রোতারা কিন্তু ক্লান্ত নয়। মাঝে মাঝে হরি হরি বোল জিগীর দিয়ে লুটের বাতাসা ছড়াচ্ছে। ছোট ছোট অনেক ছেলে বাতাসা কুড়াতে হুটিপুটি করছে শওকত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ দিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে, তার কানে শুধু ভেসে আসছে দুটি শব্দ। "নীল যমুনা।"

ঝিমুনির মাঝেই সে কল্পলোকে অধিষ্ঠান হয়ে দেখতে পেল শ্রীরাধা তার গোপিনী নিয়ে গোপিনীদের সাথে লুকোচুরি খেলছে। তমাল তলায় শ্যাম আর তাকে ঘিরে রাস উৎসবে মেতেছে ব্রজের গোপীরা। গানের মূর্ছনা আর বাঁশির সুমধুর ধ্বনি আকাশ বাতাস মাতিয়ে বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে বসন্তের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সামান্য ক্ষণের মধ্যেই শওকতের এই কল্পরাজ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল তার তন্দ্রা ছুটে যাওয়া মাত্র।

হরি হরি গৌর নিতাই। শেষ হল পালা।

হৈ-হৈ করে শ্রোতারা উঠে দাঁড়াল। ভোগের বাতাসা লুট দেওয়া হল।

শওকতের তন্দ্রা ছুটে গেছে। সেও উঠে বাতাসা কুড়িয়ে গামছায় বেঁধে নিল।

সকালের আলো সবে দেখা দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে শওকত এসে দাঁড়াল বড়কর্তার সামনে।

কেমন শুনলি শওকত ?

শওকত হেসে বলল, খাসা। এমনটা আগে শুনিনি।

কোথায় যাবি এখন ?

বাড়ি হয়ে ঘাটে যাব।

তার আগে যা দেখি, নতুন বউমা তোকে ডাকছে। এদিকে তো বিহান হয়ে গেল। বরং এখানে নেয়ে ধুয়ে খেয়ে ঘাটে যাস। কেমন ?

আচ্ছা কাকা। কিন্তু ঘরে যে ভাবনা করছে তোমার বউমা।

তা বটে। তুই নতুন বউমার ফরমাইস শুনেই বাড়ি যাস।

সরকার বাড়ির সদর দরজায় কাঁকনমালা দাঁড়িয়েছিল। শওকতকে আসতে দেখেই ডেকে বলল, পাটনী ছেলে তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।

কেন নতুন কাকি ?

যে ছেলেটা আজ রাস উৎসবের গান গাইল তাকে একবার ডেকে আনতে পার ?

একশ বার পারব।

শওকত ছুটে গেল।

ততক্ষণ ঘোষপাড়ার দল বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। তাদের খুঁজে পেল না শওকত। ফিরে এসে নতুন কাকিকে বলল, ওরা চলে গেছে। একটু বেলা হলে ঘোষপাড়ায় গিয়ে ওকে খুঁজে আনব। সারা রাত কেত্তন করে ওরাও হয়রান। গানটা ভাল লেগেছে বুঝি কাকি ?

কাঁকনমালা হেসে বলল, আরেক দিন ওর গান শুনতে হবে। বড়কর্তাকেই বলব ভাবছি।

বড়কর্তাকে বলতে হবে না কাকি, আমিই ধরে আনব। তোমার যখন ভাল লেগেছে তখন সবারই ভাল লেগেছে। আমি তো ঝিমিয়ে গিয়েছিলাম, সবটা কানে ঢোকেনি।

শওকত বুঝল, আজ ঘোষদের জয় হয়েছে। বারোহাটের নমোরা এতদিন তল্লাট মাতিয়ে নাম কিনেছে। তাদের নামের পাশে ঢ্যাঁড়া পড়ল। অন্য কেউ বলুক আর না বলুক নতুন কাকির যখন ভাল লেগেছে তখন নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে। আর ঘোষদের জয় হয়েছে। হবে না কেন নমোদের বিরহের চেয়ে ঘোষদের মধুমিলন তো সবাই চায়।

ভোরের আলোতে জোড়া কাক ডালে বসেছে, কা-কা করছে, প্যাঁক প্যাঁক করে জোড়া হাঁস পুকুরে নামছে। সব জায়গাতেই জোড় বাঁধার ধুম, হারানকর্তাও জোড় বেঁধে এসেছে, এমন দিনে বিরহ, ছ্যাঃ। জোড় মিলনই তো জীবন। বিরহ ? ওটা ভাল নয়।

শওকত নাইতে গেল পুকুরে।

ভোরের মন মাতানো বাতাসে সে নাইবার কথা ভুলেই গিয়েছিল। নীল যমুনা মনে জাগতেই নাইবার কথা মনে পড়ে গেল।

ননীচোরা শ্যাম। নীল যমুনা। তমাল গাছ। শ্যামের বাঁশি। রাধিকার পরিক্রমা। রাস উৎসব। গোপিনীদের নাচ। এ সবই তার স্বপ্নের জগত। শওকত

পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে বোধহয় নীল যমুনার ছবি দেখছিল। হুঁস ফিরতে হুস্ করে স্নানটা সেরে নিল।

কোথায় নীল যমুনা। শওকত ভেবেই পায় না। অথচ অষ্টম বোষ্টুমির কাছেও নীল যমুনার গান শুনেছে। মাঝে মাঝে সোঁতার জলকে নীল যমুনার জল ভেবে অবাক হয়ে গেছে।

আর গোকুল।

দুত্তোর গোকুল! গোকুল কেন তাকে ব্যাকুল করবে। স্নান করেই সোজা গিয়ে উঠল বাড়িতে। পরী হেসে বলল, তোর পাগলামি মিটল মিঞা। সারারাত ঘুমোসনি। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে নে। ঘাটে আর এবেলা যেতে হবে না।

ছয়

হারানকর্তার নতুন বউকে শওকতের খুব ভাল লেগেছে। বেশি দিন তো থাকতে পারেনি। হারানকর্তার সঙ্গে তার চাকুরিস্থলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার যাবার আগে শওকতকে ডেকে বলেছে, আবার আসব। থাকব অনেক দিন। এগাঁয়ে একটা পাঠশালাও নেই। আমরা ছেলেমেয়েদের জন্য ইস্কুল করব।

আমার বড় ভয় করে কাকি।

কেন পাটনী ছেলে?

আমার দোস্ত ছোট তরফের যোগিন্দির আর আসেনি কাকি। সে বলেছিল বছরে একবার আসবে কিন্তু তার কথার খেলাপ হয়ে গেছে। তাই ভয় হচ্ছে, তুমি আসবে বললে, ঠিক আসবে তো নতুন কাকি।

আসব ঠিকই। তবে এখন ঠিক করে বলতে পারব না কবে আসব। আমার মনটা কিন্তু পড়ে থাকবে এই গ্রামটার ওপর।

যার জন্য এত হৈ-হৈ সেই নতুন কাকি প্রতিশ্রুতি রেখে চলে গেল হারানকর্তার সঙ্গে শহরে। যাবার সময় কাঁকনমালা বলে গেল, আবার আসব। এবার পরিবেশটা দেখে গেলাম। কেমন করে মানুষ জন্তু জানোয়ারের মত বেহাল অবস্থায় বাস করে তা প্রত্যক্ষ করলাম। আবার যদি আসি তাহলে চেষ্টা করব কি করে তাদের টেনে তোলা যায়।

কাঁকনমালার সদিচ্ছাটা শওকত বেপারি পুরোপুরি বুঝতে পারল না তবে এটা বুঝল যে তার নতুন কাকির জিউটা গাঁয়ের মানুষদের ভাল করতে চায়। আবার সে ভাবল, মানুষ হতে কি কি উপাদান দরকার তা তার বোধগম্য না হলেও, গাঁয়ের মানুষগুলোর এই দৈন্যদশা নতুন কাকির মনে ব্যথা দিয়েছে। তবে সে নিজেও মানুষ। গাঁয়ের সব মানুষই তো মানুষ, অথচ এদের মানুষ করতে হবে কি ভাবে তা সে বুঝতে পারে না।

শওকতের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁকনমালা বুঝতে পেরেছিল শওকত তার কথা বুঝতে পারেনি। সে তার কথার জের টেনে বলেছিল, হাত-পা, চোখ

্খ থাকলেই মানুষ হয় না। নিজের ভালমন্দ শেখাতে পারলে, ভাল মন্দ শিখলে তারা মন্দকে ভাল করতে পারবে। এর জন্য লেখাপড়া শেখানো বেশি দরকার।

ওঃ। বলে শওকত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। কাঁকনমালার কথা বুঝতে পেরে বলল, হুঁ কাকি। এলেম দিতে হবে। এলেম না থাকলে মানুষ জাহান্নামের পথে নিজেই পা দেয়। ঠিক বলেছ কাকি। এদের চোখ থাকতেও অন্ধ। যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এস নতুন কাকি।

তারপর আর কোন কথা হয়নি।

কাঁকনমালা চলে যাবার পর ডিঙির গলুইতে বসে ভাবতে লাগল কবে আবার নতুন কাকি ফিরে আসবে, কবে তার গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে নতুন কাকির পাঠশালায় যাবে। কবে গাঁয়ের লোক ডাক-পড়া শুনতে পাবে।

কাঁকনমালার কথাগুলো সব সময় মনে থাকে। এরপর পুজো পার্বন এলেই শওকতের চোখ দুটো খুঁজতে থাকে কাঁকনমালাকে। কাঁকনমালাকে না দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আবার ভাবে এবার পুজোয় কাঁকনমালা ঠিক আসবে। কিন্তু ছুটির পর ছুটি পেরিয়ে যায় কাঁকনমালার পায়ের ধুলো আর ধলাট গাঁয়ের তল্লাটে পড়ে না। তবুও শওকতের আশাহত মনটা নতুন কাকিকে খুঁজে বেড়ায়।

বড়কাকিকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত, কবে আসবে নতুন কাকি।

আসবার তো কথা ছিল এবার কিন্তু আসছে না কেন তা জানি না। ওরা হল শহুরে মেয়ে গাঁয়ে এসে ওদের দম বন্ধ হয়ে যায়। হেঁজি পেঁজি শহর নয়। খাস কলকাতায় থাকে। বুঝলে! এঁদো খাল বিল ওদের কি ভাল লাগে। কে জানে বাপু। সায়েব মেমের ব্যাপার, সবই অথান্তর!

কথা অসমাপ্ত রেখে বড়কাকি নিজের কাজে হাত দিল।

শওকত সব কথা শুনতে পেল না। বড়কাকিও শওকতের মনের কথা বুঝত তাই তাকে হতাশ করত না, আঘাত দিত না, কাঁকনমালার গাঁয়ে আসাটা অন্যের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে হারানকর্তার ইচ্ছার ওপর।

বড়কাকির মুখে শুনল হারানকর্তা নতুন কাকিকে নিয়ে কোথায় অনেক দূরে চলে গেছে বড় চাকরি নিয়ে। সে নাকি অনেক দূর। রেলের টিকিট লাগে পাঁচগণ্ডা টাকার। তিন তিনটে রাত দিন কেটে যায় রাস্তায়। শওকত মনে মনে হিসাব করছিল সে জায়গাটা কতদূর। তাদের কাছের স্টেশন থেকে মাধনগর স্টেশনের ভাড়া যদি পাঁচ পয়সা হয় তা হলে পাঁচ গণ্ডা টাকার রাস্তা তো বহুত দূর। তার হিসাব হল নদীর ভাটিতে চারদিনের পথ উজানে সাতদিন। রেলের উজান ভাটি নেই। একদিনের পথ উজানে, একদিনের পথ ভাটিতে। কি জানি কি হবে। শওকত আর ভাবতেও পারে না।

দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। মুক্তোর মত ঝক্ ঝকে পাথরের মত শক্ত দাঁতের গোড়া আজকাল কন্ কন্ করে। চুপি চুপি আড়াই কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো ধীরে ধীরে রঙ বদল করছে। শেষ বয়সের ডাক এসে গেছে।

অনেক দিনের পুরানো কথা প্রায় সবই ভুলে যাচ্ছে। নতুন কাকির পাঠশালা অ
হয়নি, ইউনিয়ন বোর্ড থেকে পাঠশালা বসেছে।

বছরের পর বছর পেরিয়ে গেছে। নতুন কাকির কথাও ঝাপসা হয়ে এসেছে
পুরানো দিনের স্মৃতিও ঝিমিয়ে গেছে। শওকত হাঁস ফাঁস করে। এখন সে ভা
করেই বুঝেছে, নতুন কাকি আর আসবে না, তার এই বুড়ো ছেলেটাকে ভুলেই গেছে

সেই পুরানো জীবন। যশাইয়ের ঘাটে ডিঙির গলুইতে বসে সোয়ারির অপেক্ষ
করে। লগিটা অল্প জলে পুঁতে মালসার আগুনে ফুঁ দিয়ে ঘুঁটের টুকরো চাপি
দেয়। যা চিরকাল করেছে, আজও তাই করে।

পাঁচটা বছর।

পাঁচ বছরে কত পরিবর্তন ঘটেছে দুনিয়াতে।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা কত কি হয়েছে শওকত যেমন ছিল তেমনি আছে।

সব চেয়ে তাজ্জব মনে হয়েছে জোলাপাড়ার মসজিদের ঘটনা। সাদা বড় ব
কাগজে বড় বড় হরফে কি যেন লেখা। এই কাগজগুলো গাঁয়ে গাঁয়ে সজে
আঠা দিয়ে চপকে দিয়েছে। কজনই বা পড়তে পারে সেই লেখা। তবে শহু
মিঞা ভাইরা পাঠিয়েছে সেঁটে দিতে তাই এত যত্ন করে চপকেছে উঠতি বয়সে
ছেলেরা। কদিন থেকে বদন চৌকিদার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ি
সকাল বিকাল দৌড়াদৌড়ি করছে, কি যেন একটা হবে তার জন্য প্রেসিডেন্ট, মেম্বা
চৌকিদার সবাই ব্যস্ত। সবাই জানতে চায় কিন্তু জানাবে কে? সাদা কাগজে কে
হরফ চোখের সামনে লাল চক্কর দিচ্ছে। তবে নতুন কিছু ঘটবে এটা সবাই বুঝেছে

ওপার থেকে বদনের হাঁক শোনা গেল।

শহর থেকে লাল-নীল নানা রঙের কাগজ বগলে করে এসে শওকতকে ডা
সোঁতা পার করে দিতে। অবশ্য সরকারের চাকুরে বদন, তার খাতির আলাদা, এ
সুযোগে বিনা পয়সায় কিছু মাছ সংগ্রহও তার উদ্দেশ্য ছিল।

শওকত জিজ্ঞেস করল, এত সব নানা রঙের কাগজ কি হবে?

মোনতাির আসবে চাচা। সবাই জানে তুমি জান না। জোলাপাড়ায় মি
হবে।

মিটিং। সে আবার কি?

আরে মজলিস বসবে, দশ গাঁয়ের লোক আসবে। মোনতাির ওয়াজ করে
বক্তিতা দেবে। এসব শোননি চাচা!

তাই বুঝি তুই ঘোড়ার নাকাল ছোটাছুটি করছিস!

হ। মহারাণীর রাজ্যে লাট মোনতাির এলে আমাদের কি আর দম ফেলার সম
থাকে। জান মাল কবুল করতে হয়। আমরাও তো সরকারের চাকর।

বুঝলাম। একটু সেবা কর। বলে শওকত মাথা নাড়তে থাকে।

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে বদনের হাতে দিল। বদন দুহাতের চেটো
কলকেটা ধরে দু-একটা টান দিয়েই কলকে ফেরত দিতে দিতে বলল, আর দেরি করতে
পারব না চাচা। কখন যে ডাক আসে তার ঠিক কি। মনসুর প্রেসিডেন্ট বড়

৮ রোখা। পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ।
মাথার ফেটি বাঁধা নীল কাপড়টা মেলে ধরে বলল, আছে কিছু?
গাঙ্গে নতুন পানি না এলে তো ভাল মাছ পাওয়া যায় না, বলে শওকত খোলুই কে এক মুঠো পুঁটি মাছ বের করতে করতে আবার বলল, তোদের মোনাতিরি ঝি খেতে দেয় না।
বদন একটু লজ্জিত হয়ে বলল, খাই তো সরকারের কিন্তু পাঁচটা টাকায় কি করে জনের পেট কুলান হয়। তাই চেয়ে মেগে খেতে হয় চাচা। এবার লড়াই আর কালে সব শেষ।
শওকত ঠাট্টা করে বলল, জান-মাল কবুল করতে হয়। কি বলিস?
বদন আর উত্তর খুঁজে পেল না। এত বড় কঠিন সত্যটা অস্বীকার করার কোন থ নেই। শওকত হেসে বলল, তার চেয়ে তুই জেলের ছেলে জাল মেরে খা। পেট রবে নগদ কড়িও ঘরে আসবে। উর্দি পেটি ফেরত দিয়ে দে, ইজ্জত থাকবে। রাতের লায় লণ্ঠন হাতে করে গেরাম পাহারা দিতেও হবে না। এই আক্রা মাগ্গির জারে পাঁচ টাকায় একটা কুকুরও পোষা যায় না রে বদন।
এটা কিছু নতুন কথা নয়। বদনের মনেও এই কথা জেগেছে। তবে সরকারের ের চৌকিদারের ইজ্জত আর জেলের ইজ্জত তো এক নয়। তাই কাজ ছেড়ে বার মন করেও কাজ ছাড়তে পারেনি।
বদন চলে যেতেই শওকত ডিঙিটা ঘাটে বেঁধে বাড়ির দিকে গেল।
জানিস পরী?
কি?
মোনাতিরি আসছে জোলাপাড়ায়। মজলিস বসবে মসজিদের মাঠে। মোনাতিরি ়তিতা দেবে। যাবি?
তোর যে মগজে কিছু নেই তাই এসব ঝুটঝামেলার কথা বলছিস। মোনাতিরি মাদের দানা পানির ব্যবস্থা করবে কি? কাল পারঘাটায় যদি না যাস তাহলে ‑চারটে নগদ কড়ি মোনাতিরি তোর পকেটে দেবে কি
শওকতের এত উৎসাহে ভাটা পড়ল পরীর কথা শুনে।
নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকে দলে দলে লোক চলল জোলাপাড়ার মসজিদের মাঠে ানাতিরির কথা শুনতে নয়, মোনাতিরি দেখতে। এই সব অজ গাঁয়ে কোনদিন ান মোনাতিরি আসবে এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।
মন্ত্রী এল সোরগোল সাজগোজের কোন অভাব ঘটল না।
পিরজিপাড়ার কেরেস্তান, বারোহাটের নমো, কাশিমপুর, নুরপাড়ার মুসলমান, াটের হিন্দু মুসলমান সবাই ছুটছে জোলাপাড়ার ডাঙার দিকে।
শওকতের এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, হুঁসও নেই, সে নিজের চিন্তায় মশগুল।
সবচেয়ে বেশি গেল মুসলমান শ্রোতারা। মোনাতিরি তাদেরই লোক। বাদশাহ‑ মীর দর্শন বড়ই নেক কাজ। সে কাজে কোন গাফিলতি যাতে না হয় তার জন্য ার কম হয়নি। শওকতের পারঘাটায় ভিড় আর কমে না কিন্তু শওকতের ভ্রূক্ষেপ

নেই। নজর তার মানুষের মাথায়। যাতে বেশি লোক নৌকায় না উঠে তা হবে
নৌকা ফেঁসে যাবে। মরবে সব মজলিসের লোক। শওকত ভেবেছিল এসময় কাসম
আসবে। লগি ঠেলবে। হাল ধরবে। কাস্মুর টিকিও দেখা গেল না। সে:
বুধবারে বিহানে বাড়ি এসে পান্তা খেয়ে সবুজ টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়েছে। আজও
ফেরেনি। সে নাকি ভেলেন্টারী করছে। অন্য ঘাটে পারও হতে পারে মোনতিরি
নাওতে। কে জানে।

কাল বিকেলবেলায় সরকার বাড়িতে শুনে এসেছে সরকার কর্তারাও নাকি যাবে
দুপুরের মজলিশে। তাদের কাছেই সব শোনা যাবে। নৌকা ছেড়ে যাওয়ার উপায়
নেই। গিয়েই বা কি হবে। দুপুর নাগাদ ঘোষদের অমূল্য এল পারঘাটায়। দুধে
জোগান দেয় শহরে, অনেক খবর সে রাখে। শওকতকে জিগ্যেস করল, বড়মিঞা তুমি
যে গেলে না।

কোথায়?

মিটিং শুনতে। মন্ত্রী এসেছে। হাকিম হুকুম এসেছে। তুমি যাওনি। মানুষে
মানুষে নাকি গাদাগাদি।

শওকত হেসে বলল, কি হবে গিয়ে। তার চেয়ে মিটিং-এর লোকদের খেপ দিলে
দু'পয়সা হবে বাপ্। রোজতো আর মোনতিরি আসবে না, ঘাটে এত ভিড়ও হবে না
ওরা মোনতিরি দেখুক, আমি কিছু কড়ি কামাই করি, কি বল ভাই?

কড়ির আশায় শওকত পারের খেপ দেয় না। বেশি লোকজন দেখলে কেমন ঘাবড়ে
যায়। যত কম খেপ হয় ততই ভাল। বাইরের লোকের আনা গোনা তাকে মনমরা
করে তোলে। আগের দিন আর নেই। বাইরের লোকগুলো এসে গ্রামের সহজ সরল
অনাড়ম্বর জীবনের কোথায় যেন একটা ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। নতুন সোয়ারিকে
সে সহ্য করতে পারে। মনে হয়, গ্রামের চেয়ে ব্যক্তির খাতির বেশি। ব্যক্তি স্বার্থ
বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাঝে মাঝেই সে শিউড়ে উঠে
মনের কথা বলার মত লোক সে খুঁজে পায় না। তার সব কথার পুঁজি উজাড় করত
পরীর কাছে, আজকাল পরীকে দু এক কথা বলতে বলতে থেমে অর্ধেক কথাই
বলতে পারেনি। পুরানো দিনের আর নতুন দিনের ধাক্কায় লজ্জাবতী লতার মত
জড়সর হয়ে গিয়েছে। অমূল্যের কথা কোন আবেগ অথবা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে
পারল না। তবুও জানার একটা ইচ্ছা থাকে সব মানুষের মনে। এই শাশ্বত ইচ্ছা তাকে
অজানার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এই প্রবল ইচ্ছাকে দমন করে শওকত চুপ করে রইল

অমূল্য হেসে বলল, কড়ি যা কামিয়েছ বড়মিঞা তাতেই তোমার জীবন কেটে
যাবে। একটা বেলা তোমাদের জসিমকে বসিয়ে যেতে পারতে।

হঃ। জসিম জোয়ান ছেলে, সে কি বসে আছে। সেও গেছে সবার আগে।

তাহলে, ভেবেছিলাম তুমি গেলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম।

এবারটা ক্ষ্যামা দাও ভাই। ভাতের অভাব আল্লা রাখেনি। জমি জিরেত যা
আছে তা দেখে শুনে খেতে পারলে আর দুঃখ থাকে না। সেবার পালা জ্বরে প্রায়
পাঁচ গণ্ডা দিন ঘাটে আসতে পারেনি। তাতেও তো দিন গুজরান হয়েছে।

কি ভাবছ বড়মিঞা। উঠে পড়। চল।

তুমি কি বলতে চাও?

চল না। মন্ত্রী দেখে আসি এতেও পুণ্যি। সবাই কি আর মন্ত্রী হয়? যাদের কপাল ভাল তারাই অত উচুঁতে ওঠে।

অনেক ইতস্তত করে জসিমের বদলে ইরফানকে ঘাটে বসিয়ে শওকত রওনা হল মোনাতিরির মজলিস দেখতে।

মোনাতিরি উঠে দাঁড়াল। হাততালি পড়ল। ভেলেণ্টাররা জিগীর দিল, নারায়ে তগদীর আল্লা হো আকবর।

মোনাতিরির বর্কাতিঙ্গা শেষ হল। তার একবর্ণও শওকত বুঝতে পারল না। কে একজন খোরসেদ হোসেন মোটামুটি বাংলা করে দিল। তাও সে অবোধ্য বাংলা। শওকত অবাক হয়ে দেখছিল সাজগোজ আর হৈ-হুল্লোর।

মোনাতিরি কি বলল রে অমূল্য?

আমিও কিছু বুঝতে পারিনি। আমাদের খোট্টা বেহারাগুলো বোধহয় বুঝেছে। দেখি যদি কাউকে পাই। তা হলে শুনে এসে বলব।

তা হলে পশ্চিমা খোট্টা ভাষায় বক্তিঙ্গা হল। তাই সে বুঝতে পারেনি। বাংলাদেশের মোনাতিরি বাংলা জবানে বক্তিঙ্গা না দিয়ে খোট্টাই জবান ঝাড়ল। গাঁয়ের চাষা বুঝবে কি করে। একি সোজা কথা। এতো শুধু মোনাতিরি নয়। কোথাকার যেন নবাব। খাঁটি মুসলমান কিনা তাই বক্তিঙ্গা মুসলমানী ভাষায় দিয়েছে।

অমূল্য ঘুরে এসে বলল, খোট্টারা আসেনি বড়মিঞা তবে ভলানটিয়াররা বলল, খাসা বলেছে মন্ত্রী, খাসা তার নজর, খানদানী লোক কিনা।

তারা হয়তো বুঝেছে।

সবাই যা বোঝে না সে কাজ মোনাতিরি করে কেন? শওকত ভেবে পেল না এ কেমন খানদানী নবাব মোনাতিরি। দেশের মানুষ দেশের মোনাতিরির সওয়াল কেন বুঝবে না।

ধলাটের দশা মণ্ডল এসেছিল। তাকে দেখে শওকত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই দশা মিঞা। মোনাতিরি কি বলল রে?

দশাও বোঝেনি তবে শুনে এসেছে। আসল খানদানী মোছলমান যারা তারা কাফেরী জবানে বাতচিত করে না। তারা খাস মোছলমানী ভাষায় বাতচিত করে।

এক্ষণে শওকত কিছুটা বুঝল। ভাল করে বুঝল মুসলমান আর খানদানী মুসলমানে কত ফারাক। সে নিজে, জসিম, ইরফান, দশা মণ্ডল, হুরমত, এমন কি তামাম-তল্লাটের মুসলমান কেবল মাত্র মুসলমান তারা খানদানী নয়। শুধু মোছলমান। এবার সে ভাল করে বুঝল কেন তার ছেলে নাম পালটেছে, কেনই বা রহিম তর্কবিশারদ না-পাক পানির হিসাব দিচ্ছিল। এত দিনে সে বুঝলে মোছলমান-দেরও জাত আছে।

আরে বদন যে, শোন্ শোন্, ডাকল শওকত।

কি চাচা তুমিও এসেছিলে, তা শুনলে তো সব।

শুনলাম, বুঝলাম না।

আমিও বুঝিনি তবে খোরসেদ বলল।

কি বলল ?

মোনাতিরি বলল, এবার চৌকিদারদের দর্মা বাড়বে। পাঁচ টাকা আর থাকবে না, এবার থেকে দর্মা পুরো নয় টাকা দেবে সরকার। আর গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা হবে। টিউকল হবে। মানুষের আর দুঃখ থাবে না।

শওকত খুশী হল। খোশ খবর ঝুট হলেও শুনতে ভাল। হেসে বলল, তোদের নসীব, বুঝলি বদন। মোনাতিরি এসেছিল তাই না তোদের কপাল ফিরল।

সাত

সব জায়গাতেই একই কথা। মন্ত্রী, মন্ত্রী আর মন্ত্রী। মন্ত্রীতো যে সে লোক নয়, কোথাকার নবাব। বাদশাহী আমল থেকেই নবাবী। সেই নবাব দিয়েছে আশা, সেই আশা গাছের ফল খেতে সবাই অধীর প্রত্যক্ষ করছে। খানদানী মুসলমান নবাব তার কথা তো মিথ্যে হতে পারে না। সবাই ভবিষ্যতের আশা নিয়ে সরকারী দয়া পাবার আশায় দিন গুনছে। তারপর ঝিমিয়ে আসে উত্তেজনা। সময় হাঁটে, মনের কোণায় প্রলেপ পড়ে। কোথায় পাঠশালা, কোথায় মক্তব, কোথায় ইঁদারা, কোথায় টিউকল। বছর পেরিয়ে গেল অথচ মন্ত্রীর কথামত কিছুই হল না। কিছুই পেল না গ্রামের আশাতুর লোকের দল।

মন্ত্রীর আশ্বাস সবাই ভুলে গেলেও বদন ভুলতে পারেনি। বছর কাবার হল অথচ পিসিডেন আর নয় টাকা দর্মা দিতে চায় না। তা হলে নয় টাকা দর্মা আর হল না। বদন কিন্তু পিসিডেনের কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। তার ধারণা পিসিডেন তাদের ঠকিয়ে টাকাটা নিজের পকেটে রাখছে।

সেবার মাইনের সময় সে বলল, মন্ত্রী বলেছে পঞ্চায়েত টাকা দেবে। তোমাকে বললে, জবাব দিচ্ছ, জানি না। আসলে তোমরা দেবে না। মোনাতিরি তো যে সে লোক নয় পাঁচ মুলুকের নবাব। তার কথা মিছে হতে পারে না। গরীব মেরে আসান হবে না। পিসিডেন, খোদার গজব পড়বে।

প্রেসিডেণ্ট আর ধৈর্য ধরতে পারল না। রেগে মেগে বলে উঠল, তোর মোনাতিরির বাপের জমিদারী আছে এখানে ? ট্যাক্‌সো আদায় করে মাইনে মেটাতে হয়। তোর মোনাতিরি একটা ফুটো পয়সাও ইউনিয়ন বোর্ডকে দেয় না। যে কটি টাকা ট্যাক্‌সো আদায় হয় তাতো জানিস। ওই টাকা দিয়ে চৌকিদারদের দর্মাই মেটাতে পারি না। দেশের লোক হরসালে কলেরায় মরছে। একটা চাপা কল করতে পারছি না। যা তোর মোনাতিরির কাছে সেই তোকে নয় টাকা দর্মা দেবে।

বদন আর 'রা' কাড়ে না।

নিজের মনেই বলতে থাকে, তা হলে সবই মিথ্যে, মোনাতিরি মিথ্যে, নয় টাকা দর্মা

মিথ্যে। পিসিডেন মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় তাদের পাঁচ টাকা মাস মাইনে।

ঘুরতে ঘুরতে যশাইয়ের ঘাটে এসে শওকতকে বলল, কল্‌কেতে তামুক আছে চাচা, দাও দু'একটা টান দিয়ে গাটা গরম করি।

শওকত কল্‌কেটা এগিয়ে দিতেই বদন বলল, তোমার কথাই ঠিক চাচা। এবার থেকে জাল মেরেই খাব।

কেন রে বদনা? কৌতুক অনুভব করছিল শওকত।

বদন মুখ নিচু করে বলল, মোনাতির বলল, নয় টাকা দর্মা দেবে। বলতে গেলাম তো পিসিডেন তেড়ে মারতে এল। আর গোলামি নয়। এমন গোলামির মুখে আগুন। মোনাতিরি কলকাতায় নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়, আর পিসিডেন তার নতুন বিবি নিয়ে মৌজ করে। মরতে মরণ আমাদের। রাত নেই বিরেত নেই 'জাগো জাগো' হাঁক ছাড় আর বউবেটা নিয়ে পেটে গামছা বেঁধে মর। সেবার অজন্মার বছরে তিন বিঘে গিয়ে ঢুকল মহাজন ন্যাদা তৌলির গব্বে। এখন শুকিয়ে মর। আর গোলামি নয় চাচা।

কবার হল? শওকত হেসে জিজ্ঞেস করল।

কিসের কবার?

এই গোলামি ছাড়ার পিত্তিগ্যে!

শওকত মন্তব্যটা বদনের যেন কলিজা ভেদ করল, অন্য কেউ এভাবে কথা বললে তার সরকারী মেজাজটা না দেখিয়ে ছাড়ত না, তবে শওকত বেপারিকে বদন খুব মান্যি করে, ভয়ও করে। শওকতের কথার জবাব খুঁজতে হল অনেকক্ষণ। বিষন্ন-ভাবে বলল, মনে করলেই তো হয় না চাচা। দুনিয়াতে দুজনের গোলামি না করলে মানুষ তো বাঁচতে পারে না। ভগবানের গোলামি আর রাজার গোলামি। মহারানীর চাকরি ছাড়ব বললেই তো ছাড়া যায় না। হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে, না দিতে পারলে হাজতে ভরে দেবে। এসব তো তুমি ভাল করেই জান।

তাই বল। তুই তো ছোটখাট একটা সরকার।

বদন হু-হু করে হাসল। বলল, তা বলতে পার। আমরা হলাম গিয়ে গাছের শেকড়। আমরা না থাকলে সরকার তো চলবে না চাচা।

ঠিক বলেছিস। তুই বা কম কিসে। মোনাতিরি এসে তোর পিঠ চাপড়ে দিল। একি কম কথা।

বদন আগের মতই বোকার হাসি হেসে শওকতকে সমর্থন করল। শওকত বেশ উপভোগ করছিল বদনের হাসিকে। বদনের হাসির রেশ তখনও শেষ হয়নি; শওকত বাধা দিয়ে বলল, এবার কি করবি ঠিক করেছিস বল।

ভেবে বলব চাচা। মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেছে।

হাঁ। ওটাই ভাল। বাড়িতে গিয়ে বউকে শুধিয়ে শলাপরামর্শ করে এসে বলবি। এমন ইজ্জতের গোলামি ছাড়বি কিনা তা শুনে আসিস। তবে মোদ্দা কথা শোন্ বদনা, আজ না ছাড়লেও একদিন তোকে ছাড়তে হবে। সেদিন কেঁদে কুল পাবিনে।

বদন শওকতের হুঁকো থেকে আবার কলকেটা নামিয়ে হাতের চেটোয় জুতসই করে বসিয়ে এক মনে তামাক টানতে থাকে।

শওকত বদনকে ভাল করেই জানে। ভাল করে জানে রাজা-উজিরদের। এদের কথা আর কাজে কোন মিল থাকে না কোনদিন। আহাম্মকরা ওদের কথায় নাচে, তারপর যখন পায়ে খিল ধরে তখন দুই চোখে আঁধার দেখে। তার জীবনে এমন অনেক দেখেছে। দুনিয়ার চাকা ঘুরছে লোকের ভাগ্যও বদলাচ্ছে। কিন্তু শওকত পাটনী যেমন ফেরীর খেয়া দিত ঠিক তেমনি খেয়া দিয়ে চলেছে। কোথাও কোন বদল হয়নি। আজও আগের মতই সরকার বাড়ির ফাই-ফরমাইস খাটে। সরকার বাড়িকে ভাবতে হলে শওকতকে বাদ দিয়ে কেউ ভাবতে পারে না। সরকার বাড়ির নিমকে নিজেকে বেঁধে জিন্দগী গুজার করে এনেছে প্রায়।

বছরের পর বছর কেটেছে। জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঘটনার প্রবাহ বয়ে গেছে সব কিছুই সে মেনে নিতে পারেনি। কোথাও সহ্য করতে হয়েছে। কোথাও প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে। কোথাও মৃদু প্রতিরোধও করতে পেছপা হয়নি। ওসব ঘটনা শওকতের মনে সবসময় ভেসে ওঠে, নীরবে সে সব কথা ভাবে, পুরানো ঘটনাগুলো ভেবে কখনও আনন্দ পায়, কখনও বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

এই ভাবেই তো তার মাথার চুলগুলো সাদা হয়েছে, দেহের শক্তি কমে আসছে।

আকালের বছরের একটা ঘটনা নতুন করে মনে পড়ল। মনে পড়ার কারণ, ঘটনা নয়, তার পরের প্রতিক্রিয়া। সেই তাকে আচ্ছন্ন করেছিল কয়েকদিন।

পুরন্দর অনেকদিন পরে এসে বলল, তার বোনের বিয়ে, শওকত ভাই তোমাকে যেতে হবে।

শওকত অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে পড়ল সেই আকালের দিনের কথা। কতলোক যে না খেয়ে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। শেয়ালশকুনে লাশগুলো খেয়েছে। কত লাশ সোঁতার জলে ভেসে গেছে। কেউ কেউ চেনা, কেউ কেউ অচেনা। শওকত নীরবে সবার অলক্ষ্যে গামছা দিয়ে চোখ মুছেছে। সেও নিরুপায়; দু-চার-জনের দু-দশদিনের খোরাক সে জুগিয়ে দিতে পারলেও হাজার হাজার মানুষের পেটের জ্বালা মেটাবার সাধ্য তার ছিল না। সেই বছরে পুরন্দরের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়টা সহজ পথে হয়নি। হয়েছিল ঘোরালো পথে। পুরন্দর বিশ্বাস বামুন ঘরের ছেলে; খাস আল্লার এজেন্ট। হিন্দুদের ভগবানকে ডাকতে হয় এজেন্ট মারফত। মুসলমান-দের মত সবাইয়ের জন্য আল্লাখানা খোলা থাকে না। পুরন্দর হল বংশগত ভাবে পুরোহিত। পুজো-আর্চা করে যজমান ঠেঙিয়ে দিন তার মন্দ কাটছিল না।

এল আকালের বছর। সরকার গ্রামের পর গ্রাম ঝেঁটিয়ে চাল নিয়ে গেছে। নগদ কড়ি পেয়ে গরীব চাষী পেটের ভাত তুলে দিয়েছে সরকারী এজেন্টদের হাতে। যাদের বিত্ত ছিল তারাও ধান কিনে গুদাম ভর্তি করেছে। এরপর এল হাহাকার, নাই, নাই, নাই, সর্বত্র। চোরাবাজারীরা শুকিয়ে মারল গরীবদের, লাশের গাদার ওপর তাদের টাকার ইমারত তৈরি হল।

এই আকালের বছরে পুরন্দরের জাত ব্যবসায় টান ধরল। সবার মত তারও দিন

চলাই হয়ে উঠল কঠিন। চাল কলার পোঁটলার পেট শুকিয়ে ছোট হতে লাগল। যখন পোঁটলার পেট শুকিয়ে গেল তখন দেশের গরীব মানুষদের মতই শেষ পর্যন্ত পুরন্দরকে তিনজন পোষ্য নিয়ে মহা ভাবনায় পড়তে হল। ছোট ভাই-বোন আর বিধবা মা, সবদিন দুবেলা আহার জোটে না। বামুনের বিধবার মত এক বেলা হবিষ্যান্ন করত প্রায় দিনই, শেষে একবেলার ব্যবস্থাতেও টান ধরল।

এমন একদিনের বিচিত্র ঘটনা।

সাঁঝের আঁধার নেমেছে। শওকত তার ডিঙি নিয়ে সোঁতার ঘাটে অন্য দিনের মতই বসে রয়েছে সোয়ারী পারাপার করতে। কার্তিকের খোলা আকাশে সবে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। রুপোলি জলের বুকে চাঁদের আলো হেলেদুলে বাতাসের সাথে নেচে বেড়াচ্ছে। শওকত কবি নয়, ভাবুক। প্রকৃতির বুকে বড় হয়েছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করছিল অন্যমনা হয়ে, প্রকৃতির সেই রূপের নর্তন উপভোগ করছিল এমন সময় দুজন সোয়ারি এসে উঠল ডিঙিতে।

শওকত জানতে চাইল, কোথায় যাবে গো?

রামেশ্বরপুর। উত্তর দিল পুরুষ সোয়ারি। চাঁদের আলোয় দেখতে পেল বেশ নাদুস নুদুস প্রায় তিরিশ বছর বয়সের কালো কুচকুচে টেরি বাগানো একটা শহুরে কাপ্তান, তার পাশে বসে আছে চাঁদপানা মুখ নিয়ে একটা ষোল সতের বছরের মেয়ে। শওকত কাউকেই চেনে না। আশে পাশের দশখানা গাঁয়ের মানুষ তার ঘাটে পার হয়। কমবেশি সব পুরুষকেই চেনে। এই কাপ্তানবাবুকে তো কখনও এ-তল্লাটে দেখেনি। ওদের চলন বলনে নতুন জামাইও মনে হল না। মেয়েটার কপালে সিঁদুর নেই। অর্থাৎ বিবাহিতা নয়। কেমন সন্দেহ হল তার মনে।

কোথা থেকে আসছ তোমরা?

বিশা থেকে, উত্তর দিল পুরুষ সঙ্গী।

কাদের ঘরের?

পুরন্দর ঠাকুরের।

শওকত জানত পুরন্দরের অবস্থা, সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করল, গিয়েছিলে ন?

সোয়ারির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। দাঁত খিঁচিয়ে বলল, তাতে তোমার কি দরকার।

শওকত মোলায়েম ভাবে বলল, চটো কেন মশাই। সরকারের ঘাটের ইজারদার সরকারেরই লোক। অনেক খবর রাখতে হয়। রাতের বেলায় অচেনা লোক সোঁতা পেরোলে তাদের হদিস জানা দরকার। এইতো কয়েক মাস আগে একদল ডাকাত যাচ্ছিল চবারিয়াতে ডাকাতি করতে। আমার ঘাটে আসতেই সন্দেহ হল। উপায় কি। চবে না পেয়ে মাঝ গাঙ্গে নাও ডুবিয়ে ওদের মতলব ফাঁস করে দিয়েছিলাম। তারপর পুলিশে খবর গেল। তোমরা কে, কোথায় যাচ্ছ না জানলে রাতের বেলায় গাঙ্গ পার করব না মশাই। সরকারের আইন হল সূর্য ডুবলে গাঙ্গ পার করা বারণ। তবুও কোন বিপদ হলে জানা লোকদের গাঙ্গ পার করি।

পুরুষ সোয়ারি বুঝল, এই পাটনী সহজ লোক নয়। সেও মনে মনে বিপদ

গুনল। শেষে বলল, সওদা করতে গিয়েছিলাম।
শওকত হেসে বলল, মেয়েলোকের সওদা। নাটুরার হাটে বড়ই দাম। আকালে বছরে সস্তায় সওদা করেছ মনে হচ্ছে। দুবেলা পেটপুরে খেতে পাচ্ছে না তা সহজেই সওদা করেছ, এই তো। কত দাম দিলে মশাই? পয়সা দিয়ে মেয়ে কেন যায়। এ ব্যবসায়ে মূলধন কম, আমদানী বেশি, তবে মাঝে মাঝে ব্যবসায়ে চড় সুদ দিতে হয় মশাই বুঝলে?
পুরুষ সঙ্গী ভয় পেলেও মুখের তম্বি ছাড়েনি।
পুরুষ সঙ্গীটা জোর দিয়ে বলল, ডিঙ্গি ছাড়বে কি না বল।
নিশ্চয় ছাড়ব কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না। নোলায় জল ভর্তি হয়েছে বুঝি তোমার মা-বোন নেই। তাদের নিয়ে ব্যবসা করতে বুঝি ইজ্জত যায়।
পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে শওকতের সামনে রেখে বলল, এই নাও এবার সোঁতা পার কর।
তোবা, তোবা, পয়সা দিয়ে মেয়েদের ইজ্জত বেচা যায় না মশাই। তুমি এ তল্লাটে নতুন এসেছ। শওকত বেপারির নাম শোননি তাই দশ টাকা দিয়ে তার ইমান কিনতে চাও। ও টাকা ওঠাও, ও হারাম ওঠাও। তুমি বল দিকি মা, তোমার সাথের লোকটি কে! এ রাস্তায় ওকে তো কখনও দেখিনি। বাইশ গাঁয়ের লোক চিনি আমি আর একে তো চিনি না।
মেয়েটা উত্তর না দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।
কেঁদ না মা। যশাইয়ের ঘাটে পাপ হতে দেব না। তুমি সত্যি কথা বল, এই লোককে চেন?
ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেয়েটি বলল, না।
গর্জে উঠল শওকত বেপারি, গাঁয়ের সহজ সরল বেগুনা মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছ বদমাশ। দেখছ বৈঠা, মাথা দু ফাঁক করে দেব। শওকত বেপারির ভয়ে বাগদী পাড়ায় নোটন ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে, এখন সে হাল বয়ে খায়।
নৌকা থেকে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল পুরুষ সঙ্গীটা। শওকত লাফ দিয়ে তার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে সোঁতার জলে ঠেলে ফেলে দিল। কার্তিকের ভরা সোঁতার ঠাণ্ডা জলে সদ্য-কাটা কৈ মাছের মত ছটফটাতে থাকে শহুরে কাপ্তানবাবু। শওকত বৈঠা উঁচিয়ে বলল, এ ডাঙ্গায় এলেই তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব।
শওকত লক্ষ্য করল গাঙ্গ পার হয়ে কাপ্তান খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ে ঝোপঝাড়ের পেছনে লুকিয়ে পড়ল। পলায়নমান কাপ্তানবাবুর দিকে চেয়ে থেকে মনের দুঃখ চাপতে তার মুখে ঘৃণার হাসি ফুটে উঠল।
এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। শওকতের হিসাবে ভুল হয়নি। আকালের দিনে পেটের দায়ে পুরন্দর নিজের যুবতী বোনটাকে আট কুড়ি টাকায় বেচে দিয়েছিল। এই পাপ কাজের দালাল ছিল পুরন্দরের পরিচিত হোগলবেড়িয়ার বিশু বোরেগী। বিশু হল কমিশন এজেন্ট। চমৎকার!

পুরন্দরের বোনকে নিয়ে সেই রাতেই শওকত গেল বিশা গ্রামে।

একে চেন ঠাকুর?

পুরন্দর নির্বাক।

বোনকে বিক্রি করে পেটের ভাত জোগাড় করা গুনাহ্। আল্লার গজব পড়বে ঠাকুর। তোমাদের কোন দেব-দেবতা রক্ষা করতে পারবে না। যতদিন খাবার না জুটবে আমার কাছে এস। যশাইয়ের ঘাটেই পাবে আমাকে। ধান দেব। তাই দিয়ে আকালের বছরটা কোনরকমে কেটে যাবে।

পুরন্দর হাত জোড় করে দাঁড়াল। বলল, একথা কাউকে বল না মিঞা সাহেব? অনেক লজ্জা পেয়েছি, লোকে জানলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। আমার বিধবা মাকেও বাঁচাতে পারব না।

শওকত তার পিঠে হাত বুলিয়ে শুধু হেসেছিল। বড়ই পরিতৃপ্তির হাসি।

তারপর কতদিন কেটে গেছে।

সপরিবারে পুরন্দর প্রাণে বেঁচেছিল। মানে বেঁচেছিল শওকত সহযোগিতায়। গাঁয়ের মেয়ে যাবে হাটে পেশা করতে তা শওকত সইতে পারেনি। মানুষের ধর্ম যারা পালন করে তাদের কেউ-ই এটা সহ্য করতে পারত না। নিজের খাবার তাদের মুখে তুলে দিয়ে কষ্ট সইতে কসুর করেনি। তার এই মহত্ত্ব লোক চক্ষুর অন্তরালে ঘটলেও পুরন্দর ভুলতে পারেনি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে সব সময়।

পুরন্দরের কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি কয়েক বছর পরে জানতে পারল শওকত।

সেদিন পুরন্দর এসেছিল দাওয়াত দিতে।

কি খবর ঠাকুর?

খবর! তোমাকে নেমতন্ন করতে এসেছি মিঞাসাহেব।

কিসের জন্য?

আমার বোন আশালতার বিয়ে। সব ঠিক। গরীব গোবরা যাই হোক খেয়ে পরে সংসার করতে পারবে।

পাত্রটা কোথায় পেলে ঠাকুর?

আতাইকুলার চক্কোত্তি বাড়িতে বিয়ে ঠিক করেছি। খেয়ে পরে বাঁচবে, এর চেয়ে বেশি আর আমরা কি আশা করতে পারি।

ছেলের স্বভাব চরিত্র জেনে নিয়েছ তো ঠাকুর?

ছেলে ভাল সবাই বলেছে। তোমরা যাবে তো?

শওকত আশ্বস্ত হয়ে বলল, ভাল হলেই ভাল।

পুরন্দরকে দেখতে পেয়ে পুরানো ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ল।

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে শওকত জোর দিয়ে বলল, যাব ভাই। নিশ্চয়ই যাব। তোমার বোনের বিয়ে আমি না গিয়ে পারি।

পুরন্দর হাত জোড় করে বলল, তুমি না গেলে আমার বোনের বিয়ে বন্ধ রইবে। তোমার কাছে আমাদের কত ঋণ, কত বড় কাজ করেছিলে সেটা তো ভুলতে পারিনি।

আমার বিবিও যাবে কিন্তু।

আমরা খুবই খুশি হব।

পুরন্দর বেইমান নয়। আকালের বছরে সে বাঁচতে চেয়েছিল। অন্যান পোষ্যদের প্রাণ বাঁচাতে তাকে কুৎসিৎ পথে পা বাড়াতে হয়েছিল। ঘরের শেষ সম্বল হস্তান্তর করেও যখন পোষ্যদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতে পারেনি তখ বিবেক বহির্ভূত কাজ করতে এগিয়েছিল। আদ্যিকাল থেকে খাবারের আশায় মানু অন্যকে বঞ্চনা করেছে। নিজেকে বঞ্চিত করতে চায়নি। অপরের স্বার্থ যুপকাষ্ঠে বলি দিয়ে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে সর্বদা চেষ্টা করেছে। সামনে তাকিয়েছে পেছনে তাকাবার অবসর পায়নি। ন্যায়শাস্ত্রে এটা অপরাধ হলেও সে সময়ের সে অবস্থায় বৃত্তিগত বাস্তব নেশায় সাধারণো এটা অপরাধ নয়। অপরাধ পুরন্দর করেনি অনাচার ঘটেছিল কিছু। বিচারক যারা তারা কিন্তু নীরব থাকে ডুবন্ত মানুষকে টেনে তুলতে অথচ বিচার করে।

শওকত শুধু বুঝেছে অনাহারীর কোন ধর্ম থাকে না। ন্যায় নীতি থাকে না।

আকালের ঋণশোধ করতে বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছে পুরন্দর।

শওকতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পুরন্দর বলল, সেদিন আমার, আমার বোনে ইজ্জত রেখেছিলে, বিয়ের দিন হাজির থেকে আবার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ দি বেপারি। কেমন?

শওকত হেসে শুধু মাথা নাড়ল। এমন দরদভরা আকুতিকে অপমান করতে পারেনি। পরীকে সঙ্গে করে হাজির হল পুরন্দরের ঘরে।

খবর পেয়ে আশালতা ছুটে এল। পরীর হাত ধরে কিছু বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। পরক্ষণেই মাথা নিচু করে পরী আর শওকতকে প্রণাম করল। এটা কেউ-ই আশা করেনি, শওকত পরী ভাবতেও পারেনি। তারা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল পরীর চোখে আসল আনন্দাশ্রুর ধারা।

পরী আশালতার সব ঘটনাই জানে, শওকতকে নিয়ে তার বড় গরব। সে গর পুরণ হল আশালতার চোখের জলে বুক ভিজিয়ে।

মৃদুস্বরে পরী বলল, তুমি পেন্নাম করলে, আমরা যে মোছলমান।

আশালতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, মোছলমানও দেবতা হয় চাচি। গায়ে তে জাত লেখা থাকে না। কাজ দিয়ে জাত বুঝতে হয়।

আশালতা কাঁদছে। পরীও কাঁদছে।

এই অপূর্ব দৃশ্য অবাক হয়ে দেখছিল উপস্থিত সবাই।

আট

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই দিনটি এল শওকতের। বলতে গেলে অনেকটা বিস্মৃতির অতলে সেই আশা অঙ্কুরেই লীন হবার উপক্রম হয়েছিল। এমন সম শওকত নৌকায় বসেই লক্ষ্য করল, পায়ে হেঁটে একজন মহিলা অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে

ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। এবার আর হেঁইও-হেঁইও করে পালকি করে আসেনি তার নতুন কাকি। সেবারের মত ঘাটে কলাগাছও পোঁতা হয়নি। ছয় পোয়া রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছে নতুন কাকি। এত বছর পর নতুন কাকি আসবে তা ভাবতেও পারেনি শওকত।

প্রথমে সে বিশ্বাস করেনি, চিনতেও পারেনি।

শওকতের বয়স বেড়েছে, চোখের শক্তি কমেছে, কানেও ঠিক ঠিক শুনতে পায় না, চিনতে না পারাটা আশ্চর্য কিছু নয়। একজন মহিলা, মাথায় ঘোমটা অর্ধেক খোলা, জুতো পায়ে দিয়ে গট্ গট্ করে হেঁটে পারঘাটায় আসছে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। পেছনে বাক্স আর বিছানা মাথায় করে দুজন লোক আসছিল। তারা ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। মহিলাটির মুখের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছতে দেখে অবাক হয়ে গেল। তার ইজারদারি জীবনে এমনটা কখনও দেখেনি।

শওকতের কাছে সবই যেন নতুন। সবাইকে যেমন জিজ্ঞেস করে তেমনি জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে গো তোমরা?

তার সামনে এসে কাঁকনমালা থমকে দাঁড়াল। মাথার ঘোমটা আরও একটু সরিয়ে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ পাটনী ছেলে? চিনতে পারনি বুঝি।

শওকত অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, চেহারায় মালুম হচ্ছে না, কিন্তু মিঠে গলার শব্দে মনে হচ্ছে তুমি আমার নতুন কাকি।

ঠিক ধরেছ, খুশিতে কাঁকনমালার মুখ রাঙিয়ে গেল।

শওকতের আনন্দের সীমা নেই। সে আনন্দের আতিশয্যে হাত দুটো জোড় করে বলল, এই বুঝি তোমার শীগ্‌গীর আসা। মা হয়ে এতদিন বুড়ো ছাওয়ালকে ভুলে ছিলে কি করে, বলত কাকি?

পেছনের মোটবাহী দুজন ততক্ষণে বাকস্ বিছানা নামিয়ে রেখে মাথার বিড়ে করে বাঁধা গামছা খুলে পাখার মত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খেতে শুরু করেছে।

শওকত নতুন কাকিকে লক্ষ্য করে বলল, আজ রোদের তাপ বেশি। ছইয়ের তলায় বস কাকি। লহমার মধ্যে তোমাকে সোঁতা পার করে দেব।

ভেতরে আর বসব না। অনেক দিন পর নিজের ঘরে যাচ্ছি দেরি করব না। তুমি কিন্তু আমাদের ঘরে এস।

তুমি একা এলে, হারানকর্তা এল না?

তার তো ছুটি নেই। বড় ছেলেটা আর মেয়েটাকে রেখে এসেছি। তাদের পড়াশোনা আছে। এতগুলো বছরে তোমার হারানকর্তা ছুটি করতে পারেনি তাই আসাও হয়নি, এবার জোর করে একাই এলাম। নইলে আর আসাই হত না।

বড়কর্তা জানে তোমার আসার কথা।

সময় পাইনি খবর দেবার। ডাকে চিঠি দিলে সাতদিনের আগে তো পেঁছিয় না। তার চেয়ে হুট্‌হাট্ চলে আসাই ভাল। তবে তার করেছিলাম। সেটা পেয়ে তিনিই স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছেন। সন্ধ্যার আগেই এসে যাবেন। আচ্ছা এবার চলি। তুমি এস কিন্তু।

একটু সাবধান নতুন কাকি। পা হড়কে না যায়।

সাবধানেই নামল কাঁকনমালা।

শওকত শুধু মাথা নেড়ে ছিল। তার বুকের ভাষা মুখ ফুটে বের হল না। পরিতৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরে উঠেছিল।

নতুন কাকি এসেছে খবর পেঁছে গেছে গ্রামের ঘরে ঘরে। মেয়েরা ভিড় করছে নতুন কাকিকে দেখতে। সেই সেবার এসেছিল। আর আসেনি। তাকে দেখতে যে ভিড় হবে এটা অবাক হবার মত ঘটনা নয়।

চন্দরের হাতে নৌকা দিয়ে শওকতও বেরিয়ে পড়ল সরকার বাড়ির পথে। যাবার পথে সুখবরটা পরীকে দিয়ে যখন যশাইয়ের পেছনে সরু পথ দিয়ে এগোচ্ছিল তখন দেখা হয়ে গেল বড়কর্তার সঙ্গে, মুখোমুখি দেখা হল। শওকতকে দেখেই উৎফুল্লভাবে বড়কর্তা বলল, হারুর বউ এসেছে শওকত।

হেসে শওকত জবাব দিল, আমার নাওতে পার করেছি। মোলাকাত হয়েছে বড় কাকা। তোমাদের উঠোনে যাচ্ছি।

চল্ চল্। বলেই পেছনে যে মোটবাহী ঝাঁকাভর্তি মালপত্র শহর থেকে আনছিল তাকে লক্ষ্য করে বলল, এই রামধারিয়া তুই সোজা বাড়ি যা। আমি শওকতের সঙ্গে আসছি। বাড়ির মুনীষ রামধারিয়া এগিয়ে যেতেই বলল, আচ্ছা মেয়ে বাপু একটা চিঠিপত্তর কিছু না। আজ সকালে শহরের ঠিকানায় তার পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম। দশটার গাড়িতে বউমা আসবেন। খবর পেয়ে আর দেরি করা যায়। স্টেশনে যেতে হল। একা মেয়েছেলে আসছে। একি কম সাহসের কথা। শহুরে মেয়ে বলেই পারল। শুনেছিস কি, আজকাল কলকাতায় কি হালচাল চলছে। শুনলাম, কলকাতায় নাকি কাটাকাটি চলছে। লোক শহর ছেড়ে পালাচ্ছে, কি গেরো দেখ। এই দাঙ্গা হাঙ্গামার দিনে কেউ একা একা আসে নাকি! বল দেখি, গাঁদেশে এত অল্প নোটিশে সব ব্যবস্থা করা যায় নাকি। তাড়াতাড়ি ঘরের মুনীষের মাথায় কিছু মাল কিনে ফিরতে হল।

শওকত কাটাকাটির কথা জানে না। এসবে তার কোন আগ্রহও নেই। নতুন কাকি এসেছে এতেই খুশি, তার বেশি আর কিছু শুনতে চায় না।

তাজ্জব ব্যাপার মেয়েছেলে তিনদিনের পথ ঠেঙ্গিয়ে একাই এসেছে। একেই বলে লেখাপড়া শেখার কদর। চাকরি করছে, ভাত রাঁধছে। বাচ্চা সামলাচ্ছে, আবার দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে। একি কম কথা।

ভ্রাতৃবধূর মহিমা বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল বড়কর্তা। শওকত নীরব শ্রোতার মত পেছন পেছন যেমন চলছিল তেমনিই চলতে থাকে।

এদিকে তোদের খবর কি?

পিরজিপাড়ার চড়কে বড়ই জোলুষ হয়েছে বড়কর্তা। বেশ ভাল মেলা বসেছিল। নাগরদোলা এসেছিল। এবার পিঠ ফোঁড়ার হিড়িক তো দেখনি। পেটা সাঁওতাল পিঠ ফুঁড়িয়ে বন্ বন্ করে পাক খেতে খেতে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে আর কি। সাঁওতালদের জান, আমাদের মত বাঙ্গালী হলে আর ঘরে ফিরত না। আমাদের

হাতেম মিঞার পিঠের ফোঁড় এখনও শুকোয়নি। পিঠ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। আমাদের নিধু বাগ্দীর কথা তো শোনইনি। বাঘের ছাল পরে শিব সেজে গলায় শুয়ে বোম্ বোম্ করছিল। আর বাগ্দী পাড়ার ছোঁড়ারা মুখোস পরে ভূতের নাচ দেখাচ্ছিল। মন্দ মজা হয়নি বড়কর্তা।

এটা হর বছর হয়। তা হলে জোলুষ হল কি রে?

বারে। নাগরদোলা তো এসেছিল এবার। আর রাতের বেলায়, সে কথা তো জানেন না। কেষ্ট যাত্রা এসেছিল। দশ গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়েছিল। সবাই তো কেত্তন শুনেছে জন্মকাল থেকে। এবার কেষ্ট যাত্রা। তিন রাত্তির কেষ্ট যাত্রা। দল এসেছে নদে থেকে। জবরদস্ত দল, গেয়েছেও ভাল। তবে যাই বল আমাদের কেত্তনের চেয়ে ভাল নয় মোটেই।

বড়কর্তা বলল, ওটা সমঝদারি। কেউ এটা ভালবাসে কেউ ওটা ভালবাসে।

ছাই, এরা যা বলে, ওরাও তাই বলে। একই গান একই সুর, শুধু হারমনি বাজায়, ঢোলক বাজায় আর ছোঁড়ারা কেষ্ট রাধা সেজে নেচে নেচে গান ধরে। আর সমঝদারির কথা না বলাই ভাল। লোকে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল তিনদিন। তাতেও রক্ষা নেই। এখান থেকে ওদের বায়না ছিল লক্ষ্মীকোলের হাটে। সেখানেও ছুটেছিল এই সব পাগলের দল।

এত যখন জোলুষ তখন চাষার ঘরে টাকা হয়েছে। কি বলিস?

পেটের ভাত জোটাতে টাকায় টান ধরে কিন্তু বাঙ্গালীর মজা হল, হুজুগে মাতালে আর ডান-বাঁ জ্ঞান থাকে না। টাকার অভাব হয় না। এমনই হুজুগ যে তিরিশ টাকার পাট আঠার টাকায় বেচে জোলুষ করেছে। একেই বলে চাষার বুদ্ধি।

বড়কর্তা সব কথা খেয়াল করেনি। তার মাথায় ঢুকেছে কেষ্টযাত্রার কথা। জিজ্ঞেস করলে, হাঁরে, ওরা চলে গেছে বুঝি?

কারা কাকা?

ঐ কেষ্টযাত্রার দল।

সেতো কয়েক মাস আগেই চলে গেছে।

তাইতো। নতুন বউমা এসেছে, দু-এক পালা লাগিয়ে দিতে পারলে মন্দ হত না, কি বলিস? যাবি ওদের খোঁজে।

শওকত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তোমার হুকুম হলে যাব বইকি। কিন্তু ওদের হদিস করতে পারব কি। কিন্তু কেষ্টযাত্রা বেয়া লাগবে কাকা, ওদের গলায় সুরও নেই, হাতে বোলও নেই। নাকি-নাকি সুরে সখিগো শুনতে মোটেই ভাল লাগবে না।

আমতা আমতা করে বড়কর্তা বলল, তবুও গাঁ দেশের মানুষ ওদের গান শুনলে বেঁচেবর্তে রইবে। এদের তো আমোদ-আহ্লাদ করার কিছুই নেই। শহরে কত মজা থাকে, এখানে তো কিছুই থাকে না। এরা কখনও টকি-থিয়েটার দেখতে পায় না। ওদেরও তো কিছু দরকার। তুই খবর নে, লক্ষ্মীকোলের হাট থেকে কোথায়

গেছে জেনে আসবি। এই মুল্লুক ছেড়ে কোথাও যায়নি। হয়ত একটু দূরে গেছে। খবর করে ধরে আনা চাই।

শওকত আর প্রতিবাদ না করে শুধু আচ্ছা বলে চুপ করে চলতে থাকে।

বাড়ির আঙিনায় পৌঁছেই বড়কর্তা বলল, বদন চৌকিদারকে খবর দে শওকত জেলেপাড়া থেকে লোক ডেকে খিড়কি পুকুরে জাল ফেলুক। দু-একটা রুই কাতলা যা পায় দেখুক। বলবি তোর নতুন কাকি এসেছে। তার জন্য মাছ দরকার। আর কাল সকালে সে যেন বিলের ধারে যায়, পাকা পাকা কইমাছ কয়েক হালি যেন জেলেরা দিয়ে যায়। যা নায্য দাম তাই পাবে।

বাইরের বৈঠকখানায় সারিসারি হুঁকো সাজানো। গলায় কড়িবাঁধাটা সরকার কর্তাদের, বামুনের হুঁকো আলাদা। আর মুসলমানদের হুঁকোও আলাদা। শওকত কল্কেতে আগুন দিয়ে নিজেদের হুঁকোয় চাপিয়ে মনের সুখে কয়েক টান দিয়ে হুঁকোটা জায়গা মত রেখে ভেতর বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই হাঁক দিল, কইগো নতুন কাকি। আমি এসেছি।

নতুন কাকি সবে কাপড়জামা বদল করে বড়কাকির সঙ্গে ঘাটে গিয়ে গা ধুয়ে কাপড়জামা কেচে উঠোনে পা দিয়েছে এমন সময় শওকতের ডাকশুনে জোর কদমে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কোনরকমে শুকনো কাপড় গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, কেন পাটনী ছেলে?

মাপ চাইতে এসেছি। তোমাকে চিনতে না পারা মস্ত বড় অন্যায়, বুড়ো-হাবরা লোক, চোখে কম দেখি আজকাল। কসুর মাপ করে দিও নতুন কাকি।

নতুন কাকি নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল, শওকতকে বাধা দিয়ে বলল, তোমার কোন কসুর হয়নি ছেলে। দশ বছর পর মা-ও ছেলে চিনতে ভুল করে, তুমি আর কবার দেখেছ আমাকে। ভুল হতেই পারে। সেবার ছিলাম তো দিন কয়েক, দেখেছ আর কবার। ও দিয়ে মানুষ চেনা যায় না ছেলে।

আপ্যায়নের হাসিতে শওকতের চোখ ছলছল করে উঠল। এমন মন না থাকলে কি মা হওয়া যায়।

তা হলে চলি কাকি।

কোথায় যাচ্ছ?

জেলে ডাকতে, মাছ ধরতে হবে।

বড়কত্রী সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, কাঁকনমালা তাকেই লক্ষ্য করে বলল, মাছ দিয়ে কি হবে দিদি?

শওকতের নতুন কাকির খানাপিনা হবে।

আমার মাছ না হলেও চলে, তোমাকে যেতে হবে না ছেলে।

বড়কত্রী হেসে বলল, যেও না বললেই যাওয়া আটকায় না কাঁকন। এ বাড়িতে তো তুমি কয়েকদিন বাস করেছ। বাড়িতে হালচাল ঠিক জান না। হুকুম এসেছে খোদ বড়কর্তার কাছ থেকে।

শওকত সঙ্গে সঙ্গে বলল, এই হুকুম তামিল না করলে শওকতের ইজ্জত থাকবে না। এমনিতেই বড়কর্তা খুবই ঠাণ্ডা শান্তশিষ্ট মানুষ। কিন্তু ওই মানুষটির মুখ থেকে যখন হুকুম বের হয় তখন অমান্য করার জো থাকে না কারুরই। কাকি তুমি মাছ খাও আর না খাও, পুকুরে জাল ফেলতেই হবে, মাছ না উঠে গুগলি উঠলেও কেউ ঘাড় কাত করবে না।

কাঁকনমালার নতুন অভিজ্ঞতা। বেশ উপলব্ধি করে নিল অবস্থাটা। বড়কর্ত্রী কাঁকনমালার অপ্রস্তুত অবস্থা লক্ষ্য করে বলল, তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে বড়কর্তা। বাধা দেওয়া যাবে না। কর্তারা যখন হুকুম করে তখন তা নড়চড় হয় না। বরং—

বরং কি দিদি?

শুনলি তো এখানে জোর গলায় কেউ হুকুম দেয় না। সামান্য মিনতির মত শোনায় অথচ তার ওজন খুব বেশি, হুকুমের চেয়েও কঠিন। তবে তুই তোর ভাসুরকে ডেকে বল, সে তোর কথা শুনতে পারে। যাও শওবেটা বড়কর্তাকে ডেকে বল, নতুন বউ তাকে ডাকছে!

বড়কর্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বড়কর্তা সশরীরে উঠোনে এসে দাঁড়াল। বড়কর্ত্রীর অসমাপ্ত কথার জের টেনে বলল, ডাকবার আগেই বড়কর্তা এসে হাজির। এখন নতুন বউমার আদেশটা শোনাও।

কাঁকন বলছিল, এই অবেলায় মাছ না ধরলেও চলবে।

বড়কর্তা হেসে উঠল, বলল, কথাটা নতুন বউয়ের মত কিন্তু নতুন বউরা অনেক কিছুই বলে। তবে বউমা। তুমি জন্মেছ পশ্চিমে, বড় হয়েছ পশ্চিমে, তোমার কাজকর্মের জায়গাও পশ্চিমে। পশ্চিমের মানুষ আর পুবের মানুষে কিছু ফারাক থাকে। পশ্চিমে মাছ খাওয়াটা অনেক সময় বিলাসিতা মনে হলেও পুবের বাঙ্গালীর মাছ হল নিত্যকার আহার্য। আমাদের মাছ না হলে বউ ছেলেমেয়ের পেটই ভরে না।

কাঁকনমালা মৃদু প্রতিবাদ জানাবার আগেই বড়কর্তা বলল, তুমি যা বলতে চাও তা বুঝি বউমা। তোমার যুক্তি সবই ঠিক, কিন্তু কোন্ যুক্তিতে তুমি অবেলায় এঁদো পুকুরে নেয়ে এলে বলতে পার। বলবে এটাই মেয়েদের নিয়ম। আমাদেরও কিছু নিয়ম আছে। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এলে তার সুখ সম্ভোগের দিকে আমাদের নজর রাখতে হয়। তোমার স্নান করাটা যদি চলতে পারে তাহলে গরম গরম মাছের ঝোল আর শালি ধানের মোটা ভাত বেশ চলবে। কেমন? এটা যে সরকারবাড়ির রীতি। ঘরের বউ আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, বুঝলে।

হাসতে হাসতে বড়কর্তা দাওয়ায় উঠে বলল, যা শওকত বদনকে বলে আয়।

শওকত আর দাঁড়াল না।

বড়কর্তার কথার প্রতিক্রিয়া কতটা ঘটল কাঁকনমালার মনে বুঝা গেল না। কিন্তু কাঁকনমালা বুঝল, এসব কিছু বাহ্যিক নয়। গভীর স্নেহের পরিচয়, কোথাও কোন ত্রুটি ঘটে এমন রাস্তা কোথাও খোলা নেই।

যে ব্যক্তি মিষ্টি কথা দিয়ে নিজস্ব বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় তার ব্যক্তিত্ব যে বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এ বিষয়ে কাঁকনমালার কোন সন্দেহ রইল না। এর আগে এই ব্যক্তিটিকে জানার সুযোগ সে পায়নি। ব্যক্তিগত ভাবে কাঁকনমালার মন নুইয়ে পড়ল এই ব্যক্তিত্বের পায়ে।

সাঁঝের আঁধার নামার আগেই বদন চৌকিদার আড়াই-সের ওজনের দুটো কাতলা মাছ এনে উঠোনে রেখে চিৎকার করে ডাকল, বউমা এদিকে এস, দেখ তোমাদের হবে কি না। এর চেয়ে বড় মাছ খিড়কি পুকুরে পাওয়া গেল না।

বড়কর্ত্রী তখন গোয়ালে সাঁজাল দিচ্ছিল। বদনের চিৎকার শুনে কাঁকনমালাকে লক্ষ্য করে বলল, মাছ দুটো তুলে রাখ কাঁকন, বাগদি বউ আসবে, কেটেকুটে ঠিক করে দেবে।

বাগদি বউ এসে মাছ কেটে ভাগ দিতে বসল। বড়কর্ত্রী ভাগ করে কচুর পাতায় জড়িয়ে বাগদি বউয়ের হাতে দিয়ে বলল, এটা তোর, এটা শওকত বেটার, এটা বদন চৌকিদারের, আর দুটো ভাগ দিয়ে আসবি ও-বাড়ির সেজকর্ত্রীকে।

ভাগ বখরা করে বড়কর্ত্রী উঠতেই কাঁকনমালা হেসে ফেলল।

হাসছিস যে বড় ?

তোমার ভাগ বাঁটোয়া দেখে।

বড়কর্ত্রী গভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোরা লেখাপড়া শিখেছিস, তোরা তো হাসবি-ই। তোদের তো পাঁচ থালায় ভাত দেবার অভ্যাস নেই। এদের বাদ দিয়ে সরকার বাড়ি নয়। আজ যে আমরা মান সম্মান নিয়ে বাস করছি তার পেছনে আছে এবাড়ির কর্তাদের অনেক দান। তুই তো অনেক পরে এসেছিস, থাকিসও না এখানে। যখন আমার শ্বশুর বেঁচে ছিলেন তখন তিনি খবর নিয়ে বেড়াতেন গাঁয়ের কার ঘরে খাবার আছে আর কার ঘরে নেই। যাদের থাকত না তাদের ধান পাঠাতে হত গোলা ভেঙ্গে বুঝলি।

আমার যখন বিয়ে হয়েছিল সেই ঊনত্রিশ সালে তখন দাদাশ্বশুর জীবিত ছিলেন। আমরা তো রাজা জমিদার নই, চাষীর ঘরের বউ, জমির ফসলই সব কিছু। ঊনত্রিশ সালের বন্যা তোরা তো দেখিসনি, তোর জন্মও হয়নি। উঃ কি বন্যা। বন্যায় সব ভেসে গেল। লোকে আমায় বলত বাদলা বউ। লোকের ঘরে খুদ কণাও ছিল না সেবার।

আজ যে সরকারবাড়ির খ্যাতি মান সম্মান তা একদিনে হয়নি। এর বুনিয়াদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। কেমন করে তা হয়েছিল তার সাক্ষী আমি স্বয়ং। বন্যায় যা হয় তাতো বুঝিস। পেটে ভাত নেই, তার ওপর মড়ক। নৌকা বিনা এক পাও চলা যায় না। দাদাশ্বশুর আর শ্বশুর বসলেন পরামর্শ করতে। আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা যদি গায়ের গহনাগুলো দাও তা হলে এই লোকদের বাঁচানো যেতে পারে। আমরা গায়ের গহনা খুলে দিলাম। মহাজনের ঘরে গহনা বন্ধক দিয়ে শহর থেকে চাল জোগাড় করে বাইরের উঠোনে লঙ্গর খুললেন কর্তারা। একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন।

এদের কাছে সবাই সমান। ছোট জাত বড় জাত ছিল না। হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান ছিল না। তাদের কাছে সবাই ছিল সমান। পাঁচটা গ্রামের মানুষ আসত তাদের পারিবারিক গোলযোগ মেটাতে। তাদের শহরে যেতে হত না মামলা মোকদ্দমা করতে। সালিশী বসত। এখানেই বিচার হত, বিচারের ফল সবাই মেনে নিত।

এতগুলি কথা একটানা বলে বড়কর্ত্রী বলল, এই বাড়ির বউ হওয়াও সৌভাগ্য কাঁকন।

কাঁকন যেন রূপকথা শুনছিল। সে অবাক হয়ে বড়কর্ত্রীর কথাগুলো শুনছিল। তার বিস্ময় ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বড়কর্ত্রী বলল, সেদিন আর নেই রে কাঁকন, ভাগে বাঁটোয়ারাতে সরকারবাড়ির তলায় ঘুণ ধরে এসেছে। এখনকার বাবুরাও গাঁয়ে থাকতে চায় না। সবাই কাঁচা পয়সা কামাই করে, চাষা হতে চায় না, চাল কিনে খায় জমির দিকে নজর দেয় না। ঠাট বজায় আছে কিছু নগদানগদ আসে, তাই। যাদের সঙ্গে ভাগ করলাম, এখন তারাই আমাদের আপন, তাদের বাদ দিতে তো পারি না ভাই। আমরা আর কদিন, তোদের হাতে ঘর সংসার দিয়ে মানে মানে যেতে পারলেই বাঁচি। তোরা যা হয় করিস। আর কথা নয়। এবার চল হেঁসেলে। মাছের ঝোলটা তুই রাঁধবি।

আমি কি তোমাদের মত রাঁধতে পারব দিদি ?

খুব পারবি। তুই না রাঁধলে তোর ভাসুর রুচি নিয়ে খাবেই না।

নতুন বউয়ের আসার খবর পেয়ে বাইরের বৈঠকখানায় গাঁয়ের অনেকেই জমায়েত হয়েছে। ঘন ঘন তামাক সাজা হচ্ছে। হুঁকো কল্কে হাত বদল হচ্ছে। তামাকের ধোঁয়াতে ঘর ভর্তি। বড়কর্তা পঞ্চমুখে নতুন বউয়ের প্রশংসা করছে।

জানিস মোহন, নতুন বউমা কিনা মাছ না খেয়ে থাকতে পারে। বলছিল, মাছ না হলেও চলবে। তা চলবে বইকি। পশ্চিমে থেকেছে। দেশেও আসেনি কত বছর। বাংলাদেশের হালহকিকতে জানবে কি করে। আর আমাদের হারু। সেও চাকরি করে ছেলেমেয়ের খোঁজও রাখতে পারে না। আর নতুন বউমা চাকরিও করে, রান্নাও করে, বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখায়। যাই বলিস মোহন, খুব কাজের মেয়ে। এমনিটাই তো আজকের দিনে দরকার।

পশ্চিমে নাকি রুটি আর ভাজি খায় বড় কাকা ? মোহনের প্রশ্ন।

খেতে হয়। এত কাজ করে বসে বসে রান্না করার সময় কোথায়। তবে আমাদের জমিজমা আছে আর ভাই ভাইয়ের বউ যদি জমির ধানের ভাত না খায় তা হলে জমির দরকার কি বল দেখি।

তাতো বটেই।

তাইতো বললাম, পুকুরের মাছ আর শালি ধানের ভাত না খেলে কি চলে।

জেলেপাড়ার মুচ্ছুন্দি মোহন। জাল মেরে হাত পা ধুয়ে বসেছে বিদায়ী নিতে। সেই সঙ্গে দা কাটা তামাক সেবা করছিল। বড়কর্তার কথায় সায় দিতে দিতে বলল, একি কথা এয়োতি মানুষের মাছ চলবে না, এতো শুনিনি।

আরে সেটা তার দোষ নয়। ওরা যে দেশে থাকে সেখানে তো সব সময় মাছ পাওয়া যায় না। ওরা হল মরুভূমির দেশের লোক। আমাদের গরু যেমন শুকনো পোয়াল খায়, ওদেশের মানুষের তেমনি শুকনো বাজরার রুটি খায়। তা বলে বাংলাদেশে তো বাজরার রুটি খেয়ে বাঁচা যায় না। বাংলায় এসেছ, বাঙ্গালীর খানা খেতেই হবে।

পাশ থেকে জসিম বলল, তাই ওরা আমাদের বলে মছলিখোর। আর তোর পাস না তাই খাস না। পেলে কি ছাড়তি!

জসিম নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

শওকত কখন যে দাওয়ায় এসে বসেছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি। এতক্ষণ চুপ করে বসে ওদের কথাই শুনছিল, অনাবশ্যক মনে করে কোন কথাই বলেনি। জসিমের হাসি থামতেই শওকত উঠে এসে ঘরের চাটাইতে বসল।

একটা খবর শুনলাম কাকা।

ব্যস্ত হয়ে বড়কর্তা বলল, কি খবর?

শুনলাম, সোঁতার ওপার বরাবর সবজমি চিনি কোম্পানি কিনে নিচ্ছে।

আমিও শুনেছি তবে পাকাপাকি কিছু শুনিনি।

সত্যই যদি নেয়।

ক্ষতি কি তোদের, দাম তো পাবি।

দাম পাব ঠিকই কিন্তু সে টাকা দিয়ে কি হবে। জমিই তো চাষার গরব। সেই জমি যদি না থাকে তাহলে চাষার রইল কি!

অত এখন ভাবতে হবে না। যদি কখনও চিনির কল বসে আর জমি কিনতে চায় তখন ঠিক করব কি করা যায়।

শওকত কিন্তু খুশি হতে পারল না বড়কর্তার উদাসীনতায়। কেমন একটা অশান্তি তার মনের কোণায় বারবার জট পাকিয়ে বইতে থাকে।

এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। মুরুব্বীদের কাছে শুনেছে যখন রেল লাইন পাতা হয় তখনও নাকি এই রকম কানাঘোষা কথা শোনা যেত। সেটা হল মহারানীর হুকুম। মহারানীর আমিন এল, জমী জরীপ হল। তারপর সরকার পেয়াদা এসে খুঁটি গাড়ি করল। লোকে আপত্তি করেছিল। সরকার থেকে বলা হল। জমির দাম পাবে চাষীরা। নায্য দাম পেতে আরও ছয় সাত বছর কেটে গেল। যার জমি গেল সে উপোস করল ছয় বছর ধরে। সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায়, বাপরে বাপ্। বদলি জমিও দেয়নি কাউকে। চাষার সম্পদ জমি। জমির বদলে জমি পেলে তাও সহ্য হত। না পেল জমি না পেল সময়ে টাকা।

শওকত বলল, তোমরা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না কাকা। জমি গেলে চাষা মরবে। বদলি জমিও পাবে না। টাকা পেতেও নাকাল হতে হবে।

বড়কর্তা বাধা দিয়ে বলল, জমি যাবে কেন, যার জমি সে যদি না দেয় তাহলে কারুর ক্ষমতা আছে তা নেয়। সরকারের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। চিনির কলের জন্য হুকুম দখল করা সরকারের কাজ নয়। যা দেখি। তোরা আমার

াথা খারাপ করে দিবি, কাল শহরে গিয়ে পাকা খবর নিয়ে আসব।

পরের দিন বড়কর্তা পাকা খবর শুনে এল ফৌজদারী আদালতের আমলাদের কাছ থেকে। চিনের কল বসবে বড়ভিটার উজানে সোঁতার বরাবর।

তিন চার মাইলে যত জমি আছে তা কিনে নেবে কোম্পানি। নতুন রাস্তা হবে, ল থেকে স্টেশন পর্যন্ত রেল লাইন বসবে। বিজলি বাতি জবলবে। নতুন নতুন র বাড়ি তৈরি হবে। আর যারা জমি বিক্রি করবে তাদের চাকরি দেবে চিনির কলে। াস মাস মাইনে পাবে।

এই বিরাট কর্মযজ্ঞের কথা ক্রমে ক্রমে কাঁকনমালার কানে উঠল। শওকতকে ডকে বলল, জমি তোমরা বেচবে নাকি পাটনী ছেলে।

আমি কি দেবার কর্তা নতুন কাকি। আমি না দিলেও জমি দেবার লোকের অভাব নই। নগদ কড়ি বড়ই লোভের। ওরা নগদ টাকার ঝলকানিতে লোভ সামলাতে ারবে না। তারা কি ভাববে চাষার জমি গেলে সে আর চাষা থাকবে না। কলে াকরি করে কুলি হবে। নগদ টাকা। চাকরির লোভ। একি কম কথা। নাকের দলে নরুণ পাবে। বুঝলে নতুন কাকি।

কাঁকনমালা অবস্থাটা ভাল ভাবেই বুঝেছিল। কোন কথা না বলে সোজা গেল ড়কর্তার দরবারে।

যে ভাবে কাঁকনমালা বড়কর্তার দরবারে যাচ্ছিল তা দেখে বড়কর্ত্রীর কেমন ভয় ল, জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার কাঁকন?

ওদের কথা ওরা নিজেই বলতে পারে না কখনও। আমার কথা আছে।

তোর আবার কি দরকার পড়ল?

তেমন কিছু নয়। একটা খবর শোনার জন্য।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁকনমালা দেখল শওকত তখনও দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে এসে বলল, এখুনি তুমি যেও না পাটনী ছেলে। গাঁয়ের মানুষদের কাছে একবার যেতে চাই। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

তুমি কেন যাবে কাকি। সবার দরজায় তোমার যাওয়াটা মানসম্মানের ব্যাপার। তুমি হুকুম দিলে আমি সবাইকে ডেকে তোমাদের আঙ্গিনায় হাজির করব। আমি থাকতে তোমার ও-সব নিয়ে ভাবতে হবে না, কোথাও যেতেও হবে না।

তা হলে তাই কর। সবাইকে বুঝিয়ে বলবে আমি কেন ডেকেছি। আমি দেখতে চাই কলওয়ালারা কি করে জমি পায়!

কথা শেষ করে কাঁকনমালা যেন ফুঁপিয়ে উঠল! কাঁকনমালা নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ। তবুও চেষ্টা করতে হবে। চাষীদের মজুরে পরিণত হতে াতে না হয়, সে চেষ্টা করতেই হবে।

শওকতও বিশেষ ভরসা করছিল না গ্রামের গরীব চাষীদের। সেও চিন্তিতভাবেই াওনা হল সবাইকে খবর দিতে।

নয়

সরকার বাড়ির আঙ্গিনায় অনেকেই এসেছিল কাঁকনমালার ডাকে। সবাই বলল, ন
জমি দেব না। শওকত কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির ওপর কোন ভরসা করল না। জ
দেবার মৌখিক অনিচ্ছা কার্যকালে উল্টো পথ ধরেছিল। কিছু দিনের মধ্যেই জান
গেল শহর থেকে গাঁ অবধি দেড় মাইল মাঠটার তিন ভাগের এক ভাগ কলওলার
কিনে নিয়েছে। রেজেস্ট্রি অফিসে পাইকারী হারে হস্তান্তরের কোবালা জমা পড়
থাকে। চোত মাসের মাঠে ফসল নেই, দখল নেবার হাঙ্গামাও নেই। আলে
পাশে খুঁটো পুঁতে সীমানা টেনে দিল চিনিকলের মালিকরা, দখল নিতে মোটে
দেরি করল না।

কাঁকনমালা সংবাদটা পাকাপাকি ভাবে শুনেছে কদিন আগে। বার বার নিষে
করেও কোন লাভ হয়নি। নগদ টাকার ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ যে কত মিঠে তা গাঁয়ে
সহজ সরল চাষীরা যত বুঝল কাঁকনমালা তত বুঝল না। ভুঁড়িওয়ালার দালালর
সহজেই কাজ উদ্ধার করল। নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল হলেও পশ্চিমপাড়ার মাঠে
জমিগুলো হাতাতে না পেরে দালালরা হন্যে হয়ে কুকুরের মত ঘুরতে আরম্ভ করল

ওসব জমির মালিকানা শওকতের, জসিম শেখের আর সরকারদের। সরকারদে
জমির ভাগচাষী গ্রামের অনেকেই। অনেকেরই রুটিরুজি বাঁধা আছে ও-জমির সঙ্গে
শওকতের জমিটা পেলেই চিনিকলের চৌহদ্দিটা মানান সই হয়, সেজন্য দালালদে
নজর ওই জমির ওপর। কিছুতেই যখন শওকতের জমি পাওয়া গেল না তখ
কলওলার দালালরা খুশি হল না ঠিকই কিন্তু মালিক যদি জমি হস্তান্তর না কে
তাহলে করার কিছু থাকে না। তাদের মাথায় দুর্বুদ্ধির অভাব নেই কিন্তু ত
প্রয়োগ করার উপযুক্ত সময় তখনও হয়নি।

চৌহদ্দি ঠিক মনের মত না হলেও কলের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব করল ন
মালিক পক্ষ। মাঝের জমিটা বাদ দিয়ে চারদিকে কারখানা গড়ে উঠতে থাকে।

রাস্তা তৈরি হল। সেই রাস্তায় লরী বোঝাই দিয়ে এল ইঁট, সিমেন্ট, টিন, চো
আরও যন্ত্রপাতি, এর সাথে এল মিস্ত্রি, ইনজিনিয়ার, ছুতোর আর এক দঙ্গল মজুর
কেউ স্থানীয় নয়, বহিরাগত, ওদের ভাষাও আলাদা, ওদের কথা গাঁয়ের মানুষে
বুঝতেও পারে না।

যারা জমি বেচেছিল তাদের নগদ কড়িতে টান ধরতে দেরি হল না। তারা ছুট
কলের হাতায়। কলওয়ালারা ওয়াদা করেছিল কাজ দেবে। তারা কাজ দি
অস্বীকার করল না, তবে কলে কাজ করার মত গুণপণা ছিল না বলেই কারুর কা
জুটল না, তবে মুটে-মজুরের ঠিকা কাজ কেউ কেউ পেয়েছিল। সকাল আট
থেকে সন্ধ্যে অবধি কলের হাতায় বোঝা বয়ে বয়ে তাদের জীবনীশক্তি যেমন লো
পেতে থাকে, তেমনি তাদের সেই গ্রাম্যসমাজ ও গ্রাম্যজীবনের আওতা থেকে ক্রমে

দূরে সরে যেতে থাকে।

এত তাড়াতাড়ি ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে অথচ কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই। নিস্তরঙ্গ জলাভূমির বুকে শুকনো খড়কুটোর মত হাওয়াতে ভাসতে থাকে ভূমিহারাদের দৈনন্দিন জীবনধারা।

শওকত পারঘাটায় বসে সব খবরই শোনে, অনেক হা-হুতাশ করে; শওকত: শোনে, মন্তব্য করে না কিন্তু দুঃখ অনুভব করে। অনেক অনুরোধ করে তাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। জালের মাছ একবার বেরিয়ে গেলে সে আর ফিরে আসে না।

মাঝের জমি পাওয়ার আশা ছাড়েনি কলের দালালরা, তারা মাঝে মাঝে আসে শওকতের কাছে টাকার লোভ দেখায়, মাঝে মাঝে তরপায়। শওকত হাসে।

তা হলে জমিটা তুমি দেবে না? ওদের প্রশ্ন।

দেব কি করে বাবুমশাই। চাষার ছেলে। জমি না থাকলে আর কেউ তো আমাকে চাষা বলবে না। মান খোয়াতে রাজি নই। তার ওপর গোপন কথাটা তো বলাই হয়নি। মোছলমানের জমি, ভাগাভাগি হয়নি, ফারাজ না হওয়াতে স্বত্ব ঠিক হবে কি করে। কোন হক্দার ফ্যাসাদ বাধাবে তার কি ঠিক আছে। না জেনে শুনে মোছলমানের জমি নিলে আখেরে পস্তাতে হবে। বুঝলে! কথায় বলে মোছলমানের জমিতে বাড়ির মুরগীরও ভাগ থাকে। এ জমি নিও না বাপু।

শওকতের কথায় দালালরা মনে করেছিল মিঞাভাই নিমরাজি। তাই নাছোড়-বান্দা হয়ে বাড়ি আর পারঘাটায় দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করল।

প্রথম প্রথম ওদের কথা শুনে শওকত হাসত। হাসি মুখখানা বেশি দিন রক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে একদিন তাদের বলল, তোমরা তো নিমকের গোলাম, তোমাদের ভিটে মাটি, আছে কি? আমার বয়সটা নিশ্চয়ই বুঝতে পার। মাটি করতে দাঁত পড়ে গেছে বাপু। নতুন করে মাটি করার বয়স আর নেই। শক্ত দাঁতের আমার পুত্র রয়েছে, আমি মরলে তাকে বললে সে হয়ত তোমাদের মাটি ছেড়ে দেবে। মাটি আমার কষ্টের, মাটি আমার মা, সেই মাকে আমি বেচতে পারব না।

দালালরা মনে করল, বুড়ো খুবই চালাক চতুর। দাঁও মারার তালে আছে।

শোন মিঞা, পারবেলেতে জমি একশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ভাল জমি, তোমাকে তিনশ করে দেব, তুমি পারবেলেতে গিয়ে তা দিয়ে তিনগুণ জমি কিনতে পারবে।

তবুও শওকত মাথা ঝাঁকায় না।

দাম উঠল চারশ।

শওকত গালে হাত দিয়ে বলল, দেখ বাবু যত দামই দাও জমি আমি বিক্রি করব না।

দালালরা বলল, একথা আগে বললেই পারতে। তোমার পেছন পেছন ফেউ ফেউ করে ঘুরতাম না।

তোমাদের তো বলিনি আমি জমি বেচব। তোমরা না বুঝেই ঘুরছ। জমি বেচব বলে তোমাদের কথা দিয়েছিলাম কি, ডেকেছিলাম কি?

মুখেই কি সবাই কথা বলে। ভাবভঙ্গী দিয়ে কথা বুঝিয়ে দেয়।

শওকত গম্ভীরভাবে বলল, মানুষ চিনতে তোমরা ভুল করেছ বাবু মশাইরা। হাব-ভাবে মানুষ চেনার বয়স তোমাদের এখনও হয়নি। গাঁয়ে গেলে শুনতে পাবে এই শওকত বেপারির বৈঠার ঘায়ে এ রাস্তায় চোর-ডাকাত অবধি হাঁটতে সাহস পেত না, বুঝলে। টাকা তোমাদের অনেক আছে, কিন্তু শওকত বেপারির জমি টাকা দিয়ে কেনা যায় না, বুড়ো হাড়ে এখনও দুব্ব গজায়নি, মানে মানে পথ দেখ। এ রাস্তায় আর এস না, তা হলে বুড়ো কবজির শক্ত গাঁট্টা পড়বে তোমাদের নরম হাড়ের খুলিতে বুঝলে ?

কলওলার কর্মচারিরাও দাঁও বুঝে অপেক্ষা করছিল।

শওকতের জমির ধান আনতে কলওলাদের জমির আল দিয়ে আসতে হয়। কলওলাদের কর্মচারিরা বাধা দিয়েছিল। পরিনামে শওকতের ধান আটকাতে ভোজ-পুরীর একখানা হাত হাসপাতালে রেখে আসতে হয়েছিল। সেই থেকে আর কখনও শওকতের হকের ধান ঘরে আনতে কোন বাধা দেয়নি।

মোকসেদ জমি বিক্রি করেছে। তের বিঘে জমি। অনেক টাকা পেয়েছে। টাকা পেয়ে চার বাণ্ডিল ঢেউটিন এনে ঘর ছেয়েছে। আগরপাড়ার নুরুমোল্লার বিধবাকে নিকে করে এনেছে, প্রথম পক্ষের সাত বছরের মেয়ে পাতার বিয়ে দিয়ে মোক্ষলাভ করেছে।

পটলার মুখে খবর পেয়ে শওকত চমকে উঠল।

বলিস কিরে পটলা। মোকসেদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই।

তাইতো দেখছি। এদিকে টাকা ফাঁকা হয়ে গেছে চাচা। দু-এক মাস পর হাঁড়ি চড়বে না তার।

মোকসেদদের ভবিষ্যত ভেবে তার বুকে কে যেন একটা পাহাড় চাপিয়ে দিল। হাত থেকে হুঁকোটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সেই গাধাটা এখন করছে কি ?

কলে জোন খাটছে। সাড়ে তের আনা মজুরি।

সাড়ে তের আনা! বলিস কি রে! যার ঘরে একশ মন ধান উঠত সে খাটছে সকাল থেকে সাঁঝ অবধি, মেহনত করে মাত্র সাড়ে তের আনা।

হুঁকোর মাথা থেকে কল্কেটা নামিয়ে দু'হাতের চেটোতে বসিয়ে পটলা কসে কটা টান দিয়ে বলল, হাঁ, চাচা তাও ছিল ভাল। কাজ তো আধা সালের। আধা সাল কল বন্ধ, মজুরি বন্ধ, তখন যে কি হবে। সাতাশজনের এই হাল। দুতিনজন শলা পরামর্শ করে ভেদরার বিলে ক বিঘে জমি করেছিল তারাই বোধহয় বাঁচবে।

সত্যিই তারা বেঁচেছিল।

বাঁচল না মোকসেদ আর তার মত কয়েকজন হতভাগা।

একদিন মোকসেদ এসে কেঁদে পড়ল শওকতের কাছে।

চাচা বাঁচাও।

শওকত তার চোখের জলে ভোলার মত লোক নয়। উত্তেজিত ভাবে বলল, তখন তোদের বারণ করেছিলাম শুনিসনি তো। মরবার রাস্তায় পা দিয়ে এখন এসেছিস চাচার কাছে, বেইমান কোথাকার! মরদের বাচ্চা মরদ, চোখে তোর পানি। গলায়

বাড়ি দিসনে কেন।

মুখ্যুলোক। কৈফিয়তের স্বরে জবাব দিল মোকসেদ।

ভুল করে সে জমি বিক্রি করেনি, নগদ টাকার লোভে জমি বিক্রি করেছিল। এখন তার মাশুল সুদে আসলে দিতে হচ্ছে।

শওকত খিঁচিয়ে উঠল। বলল, মুখ্যু শুধু জমি বেচার সময়। দুটো বিয়ে করার সময় তুই তো মুখ্যু ছিলি না। যা যা তোর ভাল স্বয়ং খোদাতালাও করতে পারবে না।

মোকসেদ এতটা আশা করেনি। গামছার খুঁটে চোখ মুছে মাথা নিচু করে সে উঠে গেল।

যতই কটু কথা বলুক সে তবুও মোকসেদের কষ্টটা তার বুকে বাজের মত আঘাত করছিল। গত বছরেও মোকসেদ ছিল গাঁয়ের ছোট খাটো মুরুব্বি। মোটা ভাতের অভাব কোনদিন হয়নি। সেই মোকসেদ নুয়ে পড়েছে।

বিকেলবেলায় শওকত খবর পেল বারোহাটের জগৎ বিশ্বাসের গদিতে ঘরের চার বাণ্ডিল টিন মোকসেদ জলের দামে বিক্রি করে দিয়েছে।

নিজেকে অসহায় মনে করল শওকত। তার মুখ থেকে একটি মাত্র শব্দ বের হল, আল্লাহ্।

জমি বিক্রি বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদ এসেছিল কাঁকনমালার কাছ থেকে। শওকত সব সময়ই নতুন কাকির ভরসা করত। সেই নতুন কাকি চলে গেছে। শলাপরামর্শ করার লোক কেউ নেই। মোকসেদের মত আরও কয়েকজন বিপন্ন এবং দুরবস্থার মুখোমুখি অথচ শওকত নিজেকেই অসহায় মনে করছিল। মোকসেদকে টেনে তোলার নৈতিক দায়িত্ব যেন তারই, কিন্তু বাঁচাবার পথ কোথায়। কেবল মাত্র মোকসেদই নয় তার মত কয়েকগণ্ডা মোকসেদ নগদ পয়সার লোভে ফাঁদে পড়েছে। চিরকাল সরকার-বাড়ির ভরসায় তারা থেকেছে, বিপদে আপদে সরকাররাই ছিল নিরাপদ আশ্রয়। অনেক ভেবেচিন্তে শওকত হাজির হল সরকার বাড়িতে।

বড়কর্ত্রী গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে আসতেই তার সঙ্গে দেখা।

অনেকদিন শওকত সরকারবাড়িতে আসেনি। তাকে আসতে দেখে বড়কর্ত্রী বুঝেছিল কোন গুরুতর সমস্যা নিয়েই শওকত এসেছে। জানবার কৌতূহলটা দমন করে শওকতের দিকে শুধু মুখ তুলে তাকাল। শওকতের মুখের চেহারা স্বাভাবিক নয়, শওকতও বড়কর্ত্রীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে মুখ তুলে ঝাপসা চোখের ওপর গামছার খুঁট টেনে দিল।

কাঁদছ কেন শও বেটা?

কাঁদন আর নেই বড়কাকি। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। আর চোখের পানি দেখারও তো লোক নেই।

কি বলতে চাও?

তোমাদের রতনপুরের জলা জমিগুলো কাউকে ভাগ চাষে দিয়েছ কি?

তোমার বড়কাকা জানে, আমি অত খোঁজ রাখি না। তোমার বুঝি ভাতে টান

ধরেছে।

হায় আল্লাহ্, তা হলে তো বরং চাষ করতাম। কলওলাবাবুরা কি যে দুশমনি বরল।

বড়কর্ত্রী নতুন কোন অনিষ্টের আশঙ্কায় থমকে গেল। বলল, আবার কি হল? ওরা কি তোমার ওপর জুলুম করছে?

সে সাহস ওদের নেই বড়কাকি, জানত সেবার ভোজপুরী দারোয়ানের একটা হাত হাসপাতালে রেখে আসতে হয়েছে। এরপর আবার জুলুম হলে ফলটা উল্টো হবে।

বড়কর্ত্রীর মনে পড়ল সেদিনের কথা। ভোজপুরীর হাত ভেঙ্গে শওকত এসেছিল সরকারবাড়ির আঙ্গিনায়। তার মুখেচোখে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না। বুকের পেশীগুলো পাথর-খোদাই মূর্তির মত নিরেট মনে হয়েছিল। দৃষ্টিতে ছিল উত্তাপ, নিশ্বাস প্রশ্বাসে ছিল প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্খা। আজ যেন সবাই স্বতন্ত্র।

অতি মৃদু স্বরে শওকত বলল, নতুন কিছু নয়। পয়সার লোভে জমি যারা বিক্রি করেছিল তাদের পেটের ভাতে টান পড়েছে বড়কাকি। যাদের জমি গেছে তাদের চোখ ফুটেছে, বিড়ালের বাচ্চার মত, চোখ ফুটেছে তবে দেরি হয়েছে। তাই ভিরমি খাচ্ছে।

এরজন্য তো ওরাই দায়ী। কাঁকন বউ ওদের অনেক বুঝিয়েছিল, ওরা তো শুনল না।

বড়ই বেইমান ওরা। কিন্তু ওদের বাঁচাবার একটা পথ খুঁজছি বড়কাকি।

শওকতের কথায় বড়কাকি বেশ অসোয়াস্তি বোধ করছিল। হঠাৎ মনে হল পুরাতন ভ্রমকে সংশোধন করবার উপায় আঘাত করা নয়, সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে বাস্তব সমাধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশই বোধহয় সংশোধনের একমাত্র পথ। বড়কর্ত্রী বলল, তুমি তো বাঁচাবার পথ খুঁজছ?

ওদের বাঁচাতে হবে। চাষার বুদ্ধি কাকে বলে তা তো দেখলে বড়কাকি। নইলে সুখে থাকতে জিন পরী কিলোয় কাউকে। এই দেখ আমাদের মোকসেদ। জমি বিক্রি করে কয়েক কুড়ি টাকা পেয়েই নিজেকে লাটসাহেব মনে করল। ঘরে ঢেউ টিন দিল, আরেকটা নিকে করল, মেয়ের বিয়ে দিল, তারপর টাকা পয়সা ফু-ফ্যা হয়ে যেতেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। এখন হাঁড়ি চড়ে না। তাই বলছিলাম, তোমাদের ওই জমিটা থাকলে পাঁচ-ছ'জনের ভাত জুটত। জলা জমিতে আবাদ করা কঠিন তবুও মানুষ বাঁচার জন্য অনেক কিছুই করে, কঠিন কাজকেও সহজ মনে করে। তুমি একটু বড়কাকার কাছ থেকে শুনে নিও! যদি বন্দোবস্ত না হয়ে থাকে মোকসেদ ছিরি চরণ ওদের যাতে দেওয়া হয় তাই আর্জি জানাচ্ছি। বড়কাকাকে একবার বলে দেখ।

অনেকগুলো কথা একসাথে বলে শওকত হাঁপিয়ে উঠল। বড়কর্ত্রী অবস্থার গুরুত্ব বেশ বুঝল, শওকতের অসহায় মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, বেশ, দেখব জিজ্ঞেস করে, তবে তুমিও ওদের নিয়ে আসবে।

বড়কর্তাই শওকতকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, তোর বড়কাকির কাছে সব শুনলাম তোর উদ্দেশ্য তো ভাল কিন্তু যারা জমি নেবে তারা শেষ পর্যন্ত জমি ছেড়ে দেবে ন

তো ? কলের টানে হাল ছেড়ে পালাবে না তো ! ওরা কাঁচা তামার পয়সাকে ময়লা সোনার বাজুর চেয়ে বেশি দামী মনে করে। তবে তুই যখন বলছিস, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। যারা জমি চায় তাদের ডেকে আনিস।

এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে তা ভাবতেও পারেনি শওকত। বড়কর্তা যখন বলেছে তখন আর সে কথা বদল হবে না। শওকত গেল মোকসেদ আর ছিরিচরণের দলকে ডাকতে। সবাইয়ের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে বড়কর্তা বলল, বিকেলবেলায় তোমরা এস, রাজিনামা তৈরি করে রাখব।

বিকেলবেলায় রাজিনামায় টিপ দিয়ে মোকসেদ ছিরিচরণের দল জমির আধিয়ার হল। তারাও বুঝল নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বাঁচাল শওকত বেপারি। বড়কর্তা যে সত্যই বড় আর শওকত যে কত দরদী তা সবাই বুঝতে পারল।

ছিরিচরণ অতি বিনয়ের সঙ্গে শওকতকে বলল, একটা কথা বলব চাচা।

আবার কি বলবি ছিরিচরণ ?

জমি তো পেলাম ফসলের আধা বখরায় কিন্তু হাল গরু কি আমাদের আছে, সবই তো বেচে পেটের ভাত জোগাড় করেছি। আর বীজ ধান, সেটাও তো চাই।

বিরক্তির সঙ্গে শওকত বলল, অত আমি জানি না। আকাশের পানি জমি নরম করেছে। এবার যেখান থেকে প্যারিস হাল আনতেই হবে। আর বীজ ? সেটা আমিই দেব। মাংনা, পয়সা দিতে হবে না। তবে একবার মাত্র বছর বছর পাবি না।

সারা জীবন ধরে ভাল মন্দ অনেক কাজই করেছে শওকত। ভাল কাজের নির্মল আনন্দ যে কত গভীর তা আজই সে ভাল ভাবে বুঝেছিল। ছ'জন বিপন্ন চাষীর রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে ঘরে ফিরে এল। বাড়ি ফিরেই মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল দাওয়াতে।

পরী না ডাকলে বোধহয় হুঁশ ফিরে পেত না। পরীর ডাকে উঠে বসে উদাস ভাবে পরীকে দেখতে দেখতে বলল, জানিস পরী, চাষার যদি মাটি না থাকে তা হলে সে চাষাই নয়।

তাতো ঠিক। তুই কেন বেলা থাকতেই শুয়ে পড়লি। শরীর ভাল আছে তো ?

আছে। এক বদনা পানি দে তো, বড়ই তিয়াস, শরীর ভালই আছে।

পরীর সন্দেহ গেল না। গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে জল আনতে গেল।

চোঁ-চোঁ করে প্রায় এক বদনা জল খেয়ে শওকত হাঁফ ছাড়ল।

তোর মন মেজাজ ভাল নেই, তুই শুয়েই থাক।

শওকত পরীকে পাশে বসিয়ে বলল, জানিস, ওপারে কল বসেছে।

তা আর জানি না। সকালবেলায় মুর্গী ডাকার আগেই ভোঁ ডাকে।

ভোঁ কেন ডাকে জানিস ? তাজা বোকা মানুষগুলোকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে হজম করতে চায়। একদিনে তো হজম হবে না। ধীরে ধীরে হজম হয়ে যাবে বুঝলি। এমনি ধারা হজম হয়ে গেছে মোকসেদ আর ছিরিচরণের দল। আমি মানা করলাম, নতুন কাকি মানা করল। কারও কথা শুনল না। নগদ পয়সা না পেয়ে ভূতভবিষ্যত ভুলে মাটি বেচে এখন পেটের দায়ে পাগলা কুকুরের মত ছুটছে।

চরম হৃদয়হীন ঔদাসিন্যের সাথে পরী মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, ওদের ওটাই পাওনা ছিল। এতে তোর কি!

শওকত উদাসভাবে বলল, আমার আর কি। পিতিবাসী না খেয়ে মরবে বুঝলি তো তাই জানটা টন্‌টন্‌ করে।

ওরা আল্লার মাল, আল্লার পয়দা, আল্লা ওদের দেখবে।

আল্লার নেক নজর থেকে বদদোয়া আসবে সেটাই কি কেউ চায়।

ওরা কি তোর কথা শুনেছে যে হা-হুতাশ করছিস। ওদের নসীব ভেঙ্গেছে ওদের বুদ্ধি। বুদ্ধি যখন খারাপ হয় তখন দুঃখ কষ্ট হবেই। দেখ মিঞা, ওরা নিজের ঘরে আগুন দিয়েছে, আর তোর চোখে পানি। হায় খোদা!

প্রতিবাদের সুরে শওকত বলল, তোর যদি এমন হত?

যা হয়নি, কখনও হবে না তা নিয়ে পরীজান ঘাড় চুলকোয় না। নে ওঠ। হাত মুখ ধুয়ে নাস্তাপানি কর।

শওকত মনে করেছিল তার মনের ব্যথা পরীর সহানুভূতি পাবে। দরকার মত সহযোগিতাও পাবে। পরী যে এমন হৃদয়হীন হবে তা ভাবতেও পারেনি।

অথচ!

শওকত এই পরীকে দেখেছে খোলা হাতে ধান বিলিয়ে দিতে। সেই যে বন্যার বছর। গাঁয়ের পর গাঁ ভেসে গেছে। মাথা গোঁজার জায়গা তো দূরের কথা ওদের পেটে দানা দেবারও ছিল না। এই পরীই সেদিন গোলা থেকে ধান বের করে দিয়েছিল জলে ডোবা গাঁয়ের মানুষদের। সেই পরী আজ কেমন যেন উল্টোপাল্টা কথা বলছে। আশ্চর্য। পরীকে বোঝাতে পারত নতুন কাকি। সেও নেই। পরীর একরোখা স্বভাব শওকত জানে তাই ঘাঁটাতে চাইল না।

শওকত গুম হয়ে বসে রইল।

পরী বুঝল তার কথায় শওকত খুশি হতে পারেনি। বলল, তুই রাগ করলি?

না।

না বললেই সব না হয়ে যায় না মিঞা। তা হলে তুই খেতে যাচ্ছিস না কেন?

এতগুলো লোক না খেয়ে থাকবে, আমরা মৌজসে খানা খেয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবো। তোর সামনে এভাবে কেউ যদি না খেয়ে থাকে পারবি তুই ভাতের গেরাস মুখে তুলতে। জবাব দে।

পরী মৃদু ভাবে বলল, তুই বেপারির বেটা। বেপার বুঝবি তুই। আমি ভাত রাঁধি, পানি আনি, বাসন মাজি, অত বুঝি না। তবে আল্লার জাহানে উপাস কেউ করলে পিতিবাসীর মুখে অন্ন রোচা উচিত নয়, এ তো কোন নতুন কথা নয়। ওদের আক্‌কেল দেখেই মনে দুঃখ হয়েছে বলেই ওসব বললাম। আমিও চাই ওরা খেয়ে পরে বাঁচুক।

শওকত খুশিতে ফেটে পড়ল।

তাই বল। তবে কেন অমন কথা বললি!

সব সময় সব কথা ভাল লাগে না বাপু, বলেই পরী দাওয়া থেকে নেমে গেল।

পরীর মুখ দেখা গেল না। তার পদক্ষেপণে বুঝে নিল, এ ব্যথার অংশীদার মাত্র শওকত নয়। পরীও।

জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে শওকত বোধহয় চলে যাওয়া দিনগুলিকে অন্তরের অন্তঃস্থলে তোলপাড় করে দেখছিল, এমনি সাবধানী শাসন আর উদাসীনতা দিয়ে পরীজান তার হৃদয়ের কতটা অধিকার করে রেখেছে। তারই ওজন বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল মনে মনে। এই শাসন ও উদাসীনতাই বোধহয় শওকতের সারাজীবনের অমূল্য সঞ্চয়।

দশ

বড়ই ব্যস্ততা সর্বত্র। আগে যেমন ইচ্ছামত হাল বলদ নিয়ে মাঠে যেত এখন সে জমানা বদল হয়েছে। ওপারে সকালে ভোঁ বাজলেই যারা জমি বিক্রি করে মজুর হয়েছে তারা ছোটে হাজিরা দিতে।

আখ চাষের ধুম পড়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে। যারা জমি বিকোয়নি তারা আখের কুশী ওঠায় চাষ করতে। ফলন বেশি হলেই পয়সা বেশি। ছ-আনা মন দরে দাদন দিয়ে দুশ আড়াইশ মন ফসল পিঠে বয়ে পেঁাছে দিয়ে আসে কলের গুদামে। যাদের জমি কম তারাই আগাম দাদন নেয় ঘরের আধমরা বলদ ঠেঙ্গিয়ে চাষ করে নগদ কড়ির লোভে।

আখ চাষ করেও শান্তি নেই। রাতে পালা করে পাহারা দিতে হয়। চোরের উৎপাত আর শেয়ালের উৎপাত।

এবার চার বিঘে ধানী জমিতে আখ চাষ করেছে দশা মণ্ডল। দেড় বিঘেতে চাষ দিয়েছে বদন চৌকিদার। কেরেস্তানদের ফল্টু পিটারও আখ লাগিয়েছে প্রায় দু' বিঘেতে। এদের মধ্যে দশারই দশদশা। তার পয়সা না হলেই নয়।

দশার বোন হালিমা।

কেরেস্তানদের এক ছোঁড়ার সঙ্গে ঘর থেকে পালিয়েছিল। এখন সে সাহেববাড়ির আয়া। মাঝে মাঝে দেশে আসে। টাটু ঘোড়ার মত গোড়ালি উঁচু জুতো পায়ে দিয়ে টগ্‌বগ্‌ করে বেড়ায়। দশাকে বুঝিয়েছে, ভাইজান টাকা হল সব কিছু। তোর যদি টাকা থাকে দেখবি রুটি রুজি দৌড়েদৌড়ে তোর ঘর ভর্তি করবে। সাহেবের আয়া শহুরে বোন তার উপদেশ মেনে নিয়ে আখের চাষে নেমেছে।

হালিমাকে জিজ্ঞেস করলে মুখ ঘুরিয়ে বলে, আমার সাহেব খাস ননডন থেকে এসেছে। মেমসাহেব তো ইংরিজি বিনে কথাই বলে না।

অনেকে বলে, আমাদের একটা কাজ করে দিবি হালিমা।

হালিমা মুখ ঘুরিয়ে বলে, পারবি ইংরিজিতে বাতচিৎ করতে।

বদন চৌকিদারের মান্যি কমে গেছে। মন্ত্রী এসে বয়ান দিল। ইস্কুল পাঠশালা। মক্তব, টিউকল আরও কত কি হবে। কাজের বেলায় সব ফাঁকি। তার পিসিডেন বাড়তি মাইনেটা দিল না। লোকে বললেই বলে তোর মোনাতিরির মুখে হাজার

পয়জার। ওরা ভাল লোক নয়। পয়সা থাকলেই ভাল হয় না। বদন যতই সাফাই বলুক, গাঁয়ের লোক আর তার কথা বিশ্বাস করে না। এবার টাকার নেশায় ধরেছে তাকেও।

দাদনের ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর।

সবাই কিন্তু দাদনের প্রতিক্রিয়া জানে, জেনেও অনেকেই কলওলাদের কাছ থেকে দাদন নিয়েছে! বাপ-ঠাকুরদার কাছে অনেকেই শুনেছে নীল চাষের কথা। নীলের দাদনে গাঁকে গাঁ উজাড় হয়ে গিয়েছিল। দাদনের টাকা এক পুরুষে শোধ হয় না কোন কালেই। মহাজনের খত যেমন শোধ হয় না তিন পুরুষেও দাদনের টাকাও শোধ হয় না তিন পুরুষে। শওকত বদনকে দাদন নিতে নিষেধ করেছিল। বদন সোজাসুজি জবাব না দিয়ে শুধুমাত্র বলে গিয়েছিল পরে জবাব দেব। তারপর আর বদন পারঘাটায় আসেনি।

দাদনের টাকা পেয়ে বদনের হালচাল গেল বদলে। বাড়িতে এসে বউকে বলল, সরকারী চাকরি আর করব না। আখের চাষ করব, পাইকার সেজে বেচাকেনা করে পয়সা কামাব। বদনের বউ বাধা দিয়ে বলল, ওকাজ তুমি কর না। তাতে সবাই ডুবব।

বউ বলল, সরকারী চাকরি কেউ পায় না। আর তুমি চাকরি ছেড়ে দেবে।

প্রতিবাদ শুনেই বদন খিঁচিয়ে উঠল। সরকারী মেজাজটাতো আছে। হলই বা চাকরি চৌকিদারেব। রূঢ়ভাবে বলল, মহারানীর চাকরির তুমি কোন খবর রাখ। সাহেবরা নাকি এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, তখন আর মহারানীর চাকরি করতে হবে না। তার চেয়ে আগেই চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ভাল বুঝলে। সময় থাকতে গুছিয়ে নিতে পারব।

বউ অবাক হয়ে বলল, সে আবার কি কথা। এই তো সেদিন তুমিই বলেছিলে মহারানীর চাকরি ছাড়ব বললেই তো ছাড়া যায় না। তাতে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়।

যায়। যায়। তুমি ওসব বুঝবে না।

তাই বলে চাকরি ছাড়বে।

হাঁ ছাড়ব। কাল একটা চাকরি পেয়েছি। মাইনে বেশি। মহারানীর চাকরি করে দু'বেলা পেটের ভাত হয় না, অমন চাকরির মুখে আগুন। ভয় কিসের, নতুন চাকরি তার ওপর তো আখের চাষ রইল।

ওসব কর না বাপু। যেমন চলছে তেমন চলুক। কলের কাজে কারুরই মান থাকে না। তার চেয়ে ছোটখাট কোন ব্যবসা ধান্দা কর। এখনও পাঁচজনে চৌকিদারের বউ বলে মান্য করে। কম্বল পেতে দেয় বসতে। কোথায় সরকারী চাকরি, আর কোথায় কলের কুলি।

বউয়ের সম্মতি না পেয়েও বদন বেরিয়ে পড়ল।

ওপাড়ার নিশিকান্ত আর উমেদমালি আখ চাষ করছে। নগদানগদ পয়সা পাচ্ছে। তারা বেশ আনন্দেই খেয়ে পড়ে আছে। বদন যদি ওরকম কিছু করে তাতে দোষ কিসের। অনেক ভেবে চিন্তে গেল শওকতের কাছে।

খোলসান থেকে মাছ তুলতে তুলতে বদনের বক্তব্য সবটা শুনে নিয়ে শওকত মুখ তুলে একবার হাসল। বলল, ভালই করেছিস। রাতের বেলায় গাঁ পাহারা যখন দিবি তখন আখের ক্ষেতটাও পাহারা দিস, জানিস তো আখের ক্ষেতে শেয়াল পণ্ডিতদের মাদ্রাসা বসে রাতের বেলায়।

বদন হো-হো করে হেসে বলল, ঠিক বলেছ চাচা শেয়াল তাড়াতে না পারলে আখের ক্ষেত রাখা যায় না।

শওকত সেই সাথে বলল, তাই তো ভাবনা। রস খেয়ে ছিবড়ে রেখে না যায়। তোদের যা ভাবসাব দেখছি তাতে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তোদের ছিবড়ে চুষতে না হয়।

এবার বদন বুঝল শওকত তাকে বিদ্রূপ করছে। বদন উঠবার চেষ্টা করতেই বলল, এলি-ই বা কেন আর যাচ্ছিস বা কেন? আসল কথাটা বল।

হাঁটু গেড়ে সোঁতার কিনারায় বসে বলল, এসেছিলাম যুক্তি পরামর্শ করতে।

কোন কিছুই তো বললি না, অথচ রওনা হচ্ছিস। যুক্তি পরামর্শটা করবি কখন। শুনলাম তো দর্মা বেড়েছে আর নতুন খবর কি?

ভাবছি চাকরি ছেড়ে দেব।

ভাল কথা। এবার নিয়ে কতবার চাকরি ছাড়লি। ছেড়ে ছুড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবি না কি। সংসার আছে। কিছু করবি তো।

কলে একটা সুযোগ পেয়েছি।

তাই বল। কলে চাকরি করবি! সেতো ছ'মাসের চাকরি। বাকি ছ'মাস কি করবি। তুই ঘটি বিক্রি করেছিস, করিসনি? দেখছিস তো যারা জমি বিক্রি করেছে, তারা সেই জমিতে মজুর খাটছে। আগে ছিল জমির মালিক। এখন তারা জমির চাকর। তুই কি চাস ওদের মত সব হারিয়ে মেঠো বদ্যি হবি।

তা হলে চাকরি ছাড়ব না।

তাই তো আমি বুঝি।

নিশি-উমোদ ওরা তো পয়সা কামাই করেছে বেশ। আমি কি কম পাব ওদের চেয়ে। ওরা তো সুখেই আছে।

খোলসানটা ভাল করে ভাটির মুখে বসিয়ে শওকত এল ডাঙ্গায়। গামছা দিয়ে গায়ের জল মুছতে মুছতে বলল, সুখ। তা বটে। ওদের ঘরের কথা তুই জানলি কি করে। তবে যাদের পয়সা কম তাদের সুখ বেশি, ওরা বেশি চায় না। পয়সার সুখ তো সব সুখ নয় বদনা, ঘরের সুখ আছে কি না তা কে জানে।

বদন কোন কথা না বলে কল্‌কে তামাক ভর্তি করে নারকেলের ছোবড়ায় আগুন দিয়ে কল্‌কে হুঁকোর ওপর বসিয়ে শওকতের হাতে তুলে দিল। কয়েকটা টান দিয়েই কল্‌কেটা বদনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এখন কোথায় যাবি বদনা?

বদন কল্‌কেটা বাঁ হাতে ধরে বলল, একটা কথা ভাবছি চাচা।

কি কথা রে?

নতুন কাকিকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়? সেইবার নতুন কাকিই সবাইকে

ডেকে মানা করেছিল নইলে এই মাঠের এক ফালি জমিও থাকত না। হুজুগে সব টাকার লোভে জমি বিক্রি করে দিত।

নতুন কাকিমাকে খবর দেবার কথা শওকতও ভেবেছে। কিন্তু খবর দিলেই নতুন কাকি ঘর সংসার ফেলে আসবে কি. এলেও কোন লাভ হবে কি? হাজার হোক নতুন কাকি একটা মেয়েছেলে তার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব কি?

রাস্তা তৈরি করবে সরকার। সরকার জরীপ করে জমি হুকুম দখল করছিল। জরীপের মাপে যার জমি পড়ছিল তাকেই জমি ছাড়তে হচ্ছিল। সরকার বলছে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাস্তার প্রয়োজন, তাই জমি দিতেই হবে। কিন্তু যাদের সম্বল মাত্র পাঁচদশ কাঠার বাস্তু তারা কোথায় যাবে। বাস্তুকে বাদ দিয়ে জরীপ করাটা ছিল নায্য কাজ। নায্য কাজ আর কে করে।

সবাই মিলে গিয়েছিল বড়কর্তার কাছে। বড়কর্তা আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে, আগের মত জোর দিয়ে কোন কাজ করতে পারে না। কিছু বললেই বলে, বুড়ো হয়েছি, আগের মত কাজ করতে পারি না রে। সত্যিই বড়কর্তা বুড়ো হয়েছে। শওকতের বয়েস তো সত্তরের দিকে এগোচ্ছে অথচ সে নিজেকে কোন সময় বুড়ো মনে করে না। আসলে বড়কর্তার মনটাই বুড়িয়ে গেছে। মনের কথা জোর দিয়েও বলতে পারে না, কেমন যেন ইতস্তত ভাব সব সময়। কিন্তু শওকতের কিছু ভরসা ছিল নতুন কাকির ওপর, সে নিজে কিছু না করতে পারলেও সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দিতে পারত। নতুন কাকি তো তার হাতধরা লোক নয়। মনে করলেই তো ডেকে আনা যায় না।

নতুন কাকি লেখাপড়া শিখেছে। চাকরি করে পয়সা উপায় করছে, তার সময় হয়ত নেই কিন্তু তার দরদভরা দিল্ আছে। যা গরীবের জন্য সব সময় ব্যাকুল থাকে। কিন্তু সে থাকে অনেক দূরে। রাস্তা তৈরি করার সময় সামান্য প্রতিবাদও কেউ করেনি। হঠাৎ যুদ্ধের ডামাডোলে রাস্তা তৈরি বন্ধ হওয়াতে শওকত দুর্ভাবনা মুক্ত হয়েছিল। আজ বদনের কথা শুনে আবার নতুন কাকির কথা ভাল করে মনে পড়ল। অন্যমনস্কভাবে বলল, লিখলেও আসবে না রে। অত সময় তার নেই।

বদন হতাশভাবে বলল, তা হলে কি হবে চাচা।

একটা কাজ করতে পারবি?

নতুন কোন পথের সন্ধান পাবার আশায় বদন উৎফুল্লভাবে বলল, সব কাজ পারি চাচা। তোমার কথা বেন্মার কথা বলে মানবো।

শওকত বলল, তুই একা কিছু করতে পারবি না। তবু গাঁয়ের যারা আখ চাষ করে তাদের বল আর আখ চাষ যেন কেউ না করে। যারা চাষ করবে তারা যেন বাজারের নায্য দামের চেয়ে কম দামে আখ বিক্রি না করে। কলওলা দাদন দিয়ে ছ-আনা মন দরে আখ দিতে বাধ্য করছে। এবার থেকে দেড় টাকার কম দামে যেন কেউ কলওলাদের আখ না দেয়। পারবি বলতে? দশজনের রায় নিয়ে আমাকে বলে যাস।

লোকে শুনবে কি? কাঁচা পয়সা।

তাই তো বলছি। ওরা ঠকিয়ে নিচ্ছে, শুনে আয় লোকের কথা, তারপর কি করতে হবে তা সবাই মিলে ঠিক করব।

বদন কলকেতে গোটা কতক সুখটান দিয়ে রওনা হল।

গাঁয়ের বিভিন্ন মানুষদের দুর্ভাবনা শওকত নিজের মাথায় তুলে নিয়ে পথ খুঁজতে থাকে। ওরা তো ধনেপ্রাণে মরতে বসেছে। ওদের বাঁচাবার আর কোন ভাল রাস্তা তো তার চোখে পড়ছে না।

ছ'আনা মন দরে আখ বিক্রির দাসখত লিখে দাদন নিয়ে চাষারা নিজের কপালে আগুন দিয়েছে সে আগুন নেভাবে কে? এই আগুনে চাষা সপরিবারে মরতে বসেছে। যারা জমি হারাল তারা হল মজুর। যাদের জমি রইল তারা লিখল দাদনি খত, গাঁয়ের চাষী আটক হল কলের চাকায়। যারা জমি বিক্রি করেছিল তারা অল্প দিনেই বুঝেছিল কোথায় তাদের ভুল হয়েছে কিন্তু তখনও যাদের জমি ছিল তাদের চোখ খুলতে দেরি হল দাদনের দাসখত লিখে। বাজার দর যতই হোক সেই এক মণ ছ'আনা। যখন তারা বুঝল তখন বিলম্ব হয়ে গেছে, শুধরোবার রাস্তা তখন বন্ধ।

বদন এসে খবর দিয়ে গেছে কলের বাবুরা কলের লাঙ্গলে চাষ আরম্ভ করেছে তাদের খাস জমিতে। এতদিন ক্ষেতমজুরের কাজ পেয়েছে ভূমিহীন চাষীরা, এবার সে পথ বন্ধ, রুজিরোজগার বন্ধ। এতদিন যারা খেটে খেত তারাও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে পা বাড়াল। জমির মালিক মজুর হয়েছে, সেই মজুরিতেও টান পড়েছে এবার। শওকতের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল।

অসহায় মজুররা আবেদন নিবেদন করল. তারা বলল, তোমরা কলে কাজ দেবে বলেছিলে, এখন সে কাজও তো থাকছে না। আমাদের কাজ দাও।

কলের মালিক পক্ষ মুচকি হেসে বলল, কাজ দিতেই তো বসে আছি। তোমরা কাজ করতেই পারছ না, তোমরা পারছ না বলেই কোম্পানির হাজার হাজার টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে, সেইজন্য বাহির থেকে হিন্দুস্থানী মজুর আনতে হয়েছে। আমরা কাজ দেব, তোমরা কাজ করবে না, কোম্পানি তো দানছত্র খুলে রাখেনি তোমাদের জন্য।

সত্যিই তারা কাজ দিতে অস্বীকার করেনি। কলের লাঙ্গল এসেছে, সেই লাঙ্গল চালাতে জানে না গ্রামের এইসব মানুষ, সকাল থেকে সাঁঝ অবধি তেরো আনা মজুরিতে খাটতে খাটতে তাদের দেহই বেচাল হয়ে গেছে, তাদের কাজ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। তারা নিজেরাই কাজ পারেনি বলেই কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, তাদের রুগ্ন দেহ কাজের উপযোগী নয় বলেই তারা মজুরের কাজও পায় না। তবুও এই সব হতভাগ্য ছন্নছাড়া মানুষ আবেদন জানাল, আমরা চাষী আমাদের ক্ষেতে খামারের কাজ দাও।

এমন কাজ দেবার তো কোন উপায় এখন নেই আমরা বড় অফিসে খবর দিচ্ছি। তোমরা অপেক্ষা কর।

অপেক্ষা করতেই হয়। অপেক্ষা না করে উপায়ই বা কোথায়। বড় অফিসের

মজুরি আসতে কত বছর কাটবে তা কেউ জানে না। তারা মাঝে মাঝে খবর নিতে এসে মুখ শুকিয়ে ফিরে যায়। যাতায়াতের পথে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের চোখের সামনে ঘড়্ ঘড়্ করে কলের লাঙ্গল চলছে, হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে হিন্দুস্থানী মজুরেরা বস্তা বস্তা চিনি টেনে তুলছে লরিতে। ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ঘরে ফিরে যায়।

শওকত সবই শোনে, দেখে কিন্তু আজ সে বড়ই অসহায়। সবার মুখে একই কথা, গেল সব গেল। কিন্তু বাঁচাবার উপায় কোথায়, কোন্ পথে গেলে এরা বাঁচবে আর সেই পথ কে দেখাবে। এরই হিসাব নিকাশ শেষ করতে পারেনি শওকত।

শওকত অবাক হয়ে ভাবে, যাদের নিয়ে সে কাজ করবে, যাদের গরজ বেশি তারাই তার কাছে আসে না, অযাচিত ভাবে কি করে সে এগোবে। যা হবার নয় তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। আজ যদি নতুন কাকি থাকত, আজ যদি তার শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলেটা তার পাশে থাকত তা হলে সে মনের জোরে এগোতে পারত। কিন্তু এরা কেউ নেই তার পাশে।

বদন বলেছিল, নতুন কাকিকে চিঠি লিখতে। কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু কোথায় নতুন কাকি থাকে তার ঠিকানাই বা কি, কিছুই সে জানে না।

সন্ধ্যাবেলায় বদন এসে জানাল খত-খেলাপী কাজ করতে কেউ রাজি নয়। তবে নতুন করে খত কেউ দেবে না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। দাওয়াতে সে বসেছিল এখনও খেয়াল নেই কত রাত হল। পরী এসে ডাকতেই সে যেন সম্বিত ফিরে পেল।

অনেক দিন কাম্মু গ্রামে আসেনি। কবে আসবে তা কেউ জানে না। হঠাৎ রাতের প্রথম দিকে একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে কাম্মু এসে হাজির। যদি কখনও কাম্মু আসে সে দিনটা হয় শনিবার। হঠাৎ সে বুধবারে এল কেন। কাম্মু তার সঙ্গী ভদ্রলোককে নিয়ে এসে দাঁড়াল শওকতের সামনে।

ভদ্রলোক বেশ মোলায়েম ভাবে আদাব জানিয়ে শওকতের পাশে বসল। শওকত জিজ্ঞাসা করল, আপনার নিবাস।

শহরে থাকি চাচা। আপনার ছেলের সঙ্গে আপনার কাছে এলাম জরুরী কাজে। আপনি বোধহয় শুনেছেন আমাদের এই বাংলাদেশ ভাগ হচ্ছে। একটা হবে হিন্দুস্তান আর একটা হবে পাকিস্তান।

এসব খবর তো আমাদের অজ গাঁয়ে পেঁছয় না বাপ। তবে খবরটা নতুন নতুন মনে হচ্ছে। সরকার কখন যে কি করে কে জানে।

শুনুন চাচা। ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যাচ্ছে। এবার দেশের লোক হবে দেশের মালিক। আপনার ছেলে আমাকে বলতে এসেছিল সে নাকি পাকিস্তানে যাবে। ওটাই নাকি হবে ওর দেশ!

আপনার কাছে নতুন কথা শুনলাম বাপ্, দেশ আবার ভাগ হয় নাকি বাপদাদার জমি ভাগ হলেও বেটা নাতিপুতিরা পায়। এই ভাগ তো ভাগ নয় বাঁচার জন্য অংশ ভাগ করে। এবার দেশ ভাগ, এটা কেমন কথা।

কাম্মু এগিয়ে এসে বলল, ও তুমি বুঝবে না বা'জান। আমরা মুসলমান, আমরা হিন্দুদের সাথে থাকব না। মুসলমানেরা চাইছে তাদের আলাদা রাজ্য। হিন্দু-মুসলমান আলাদা কওম। আলাদা দেশ চাই।

ভদ্রলোকটি বাধা দিয়ে বলল, একথা আমরা স্বীকার করি না চাচা। কাম্মুকে আমরা যেতে দেব না।

যাব এমন কথা তো বলিনি শ্যামদা, তবে যে ভাবে বাংলা জুড়ে খুনোখুনি চলছে তাতে আমরা গাঁয়ে থাকতে পারব না? তাই ভাবছি, সময় থাকতে পাকিস্তানে চলে যাব। কি বল বা'জান? কথা শেষ করে কাম্মু শওকতের দিকে জবাব পাবার আশায় তাকিয়ে রইল।

শ্যামসুন্দর হাসল। বলল, তুমি যাবে বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে। আমি তুমি অভাগা। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়। বুঝলে ভাই, আমরা নিজেকে বড্ড বেশি ভালবাসি, এই ভালবাসাই আমাদের টেনে নিয়ে চলে মরার রাস্তায়। সেই মরণটাকে সুন্দর করে নিতে পার না ভাই। যদি মরতেই হয় নিজের দেশেই মরব, কি বল চাচা?

কাম্মু কিছু বলার আগেই শওকত বলল, ঠিক বলেছ বেটা, তবে যশাইয়ের মাটি ছেড়ে এক পা-ও যাব না। তার জন্য মরতে হয় মরব। সাড়ে তিন হাত মাটি এখানেই পাব।

এই তো হক্ কথা। দেশ আমরা ছাড়ব না চাচা, সে দেশ হিন্দুস্তানই হোক আর পাকিস্তানই হোক। নয় কি!

হাঁ বাপ। হাত মুখ ধুয়ে নাস্তাপানি করে নাও। নিশ্চয়ই কিছু মনে করে এসেছ। আমি তোমার খেদমত করতে সব সময় রাজি। কি কাজে এসেছ, বল।

কাজ? আছে বইকি। পরে বলব চাচা।

সারারাত ধরে শ্যামসুন্দর আর কাম্মুর সঙ্গে শওকত কত কি যে আলাপ আলোচনা করল। তারপর যে যার মত শুয়েছিল। সকালবেলায় শ্যামসুন্দরকে আর দেখা গেল না কিন্তু শওকত গেল গ্রামের দরজায় দরজায়।

যাবার সময় শ্যামসুন্দর বলে গেছে, ওদের ওপর রাগ করতে হয় না চাচা। ওরা অবোধ মূর্খ, একবার দুবার নয়, দরকার হলে হাজারবার ওদের দরজায় ধরণা দিয়ে ওদের শেখাতে হবে, জানতে দিতে হবে, নইলে ওরা বাঁচবে না; ওরা পথ খুঁজে পাবে না। ওরা ভুল করলে আমরা কি ভুল করতে পারি। আমাদের ধর্ম হল ওদের বাঁচাবার পথ দেখানো, আর সেই পথে পরিচালনা করা।

শওকত মৃদু আপত্তির সুরে বলেছিল, দেশ তো ভাগ হতে চলেছে, ওরা নিরাপদ এলাকা মনে করে পাকিস্তান যাবেই, ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন? সবাই তো নিরাপদে থাকতে চায়।

ওরা হয়ত প্রথমে মানতে চাইবে না তবে মোটেই মানবে না একথা আমি বিশ্বাস করি না। তাড়াতাড়ি দেশ ছেড়ে পাড়ি জমালে শেষ পর্যন্ত সবই পয়মাল হয়ে যাবে। অত্যাচার অবিচারকে ওরা ভগবানের দান মনে করে, সব কিছুই মাথা পেতে নেয়।

মাথা উঁচিয়ে প্রতিবাদ করতে ভরসা পায় না ; স্বার্থপর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষা করতে ওদের বুঝিয়েছে, প্রতিবাদ জানানোর অর্থ হল ভগবানের ইচ্ছাকে অমান্য করা। এদের সঠিক অবস্থা বুঝিয়ে দিতে বিরাট ধৈর্যের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন আমাদের মেটাতে হবে।

কিন্তু!

কিন্তু নেই চাচা। ওদের বোঝাতে হবে খুনোখুনি করে ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হওয়াই আল্লার বদদোয়া ডেকে আনে। আল্লা তো বদ নয়। আমরা বদ কাজ করলে বদদোয়া নেমে আসবে আমাদের মাথায়। হাজার হাজার বছর ধরে স্বার্থান্বেষীরা নানা যন্তর তৈরি করেছে, তুমি আমি সেই যন্তরে গলা দিয়ে যদি হাঁসফাঁস না করি ওদের মতে সেটাই হল আল্লার খেলাপ। এরাই সর্বনাশ ডেকে এনেছে দেশে, সমাজে, পরিবারে। এবার সতর্ক হবার সময় এসেছে। আল্লা হলেন পরম দয়ালু সর্বশক্তিমান। ওরা বিশ্বাস করে না চাচা। ওরা নিজেদের মনের মত আল্লার নির্দেশকে ব্যাখ্যা করে অত্যাচার অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা তোমরা ওদের প্রভাবে আল্লার পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। তাই বোধহয় আমার তোমার আল্লার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ওদের যন্তরের চাপে আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। আমরা আল্লার সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম। সেইজন্যই ওই সব অবোধদের বুঝাতে হবে, শেখাতে হবে আল্লার মহৎ সৃষ্টি রক্ষা করতে তাদের কি করণীয়। অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখাতে হবে।

শ্যামসুন্দরের কথাগুলো শওকতের কানে বার বার কেউ শোনাচ্ছে আর শওকত এই কথা বুঝিয়ে দিতে দ্বারে দ্বারে আবেদন জানাচ্ছে প্রতিদিন। সকালের আলো কবে তমসা ভেদ করে পৃথিবীর বুকে দেখা দেবে তারই প্রতীক্ষা করছে শওকত বেপারি।

এগার

লোকের দরজায় দরজায় ঘুরতে ঘুরতে শওকতের কাছে একটি সত্য স্পষ্ট হয়েছিল। সে সত্যটি অমোঘ। নৌকার হাল ধরা আর মানুষের হাল ধরা এক নয়। এক নৌকার হাল ধরে বাইশজনকে পারাপার করানো যায় কিন্তু বাইশজন লোকের হাল ধরে এক নৌকায় তোলা দুর্ঘট ব্যাপার। যদি কখনও তা সম্ভবও হয় তাতে মজুরি পোষায় না, মেহনত করে তা স্বমতে আনাও সহজ ব্যাপার নয়। কটুকথা, অবমাননা আর ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করার মত মন তৈরি না হলে এই কঠিন কাজ সমাপন করা মোটেই সহজ নয়। শওকত রাগ করতে পারে না। শ্যামসুন্দর তাকে বলে গেছে, এই কঠিন কাজ করতে হলে রাগ করা মানা।

কল বসে, কারখানা বসে, গাঁ উজাড় হয়ে নতুন শহর বসে। চাষী উজাড় হয়ে মজুর সৃষ্টি হয়। সুখের চাল ভেঙে দুঃখের অট্টালিকা গড়ে ওঠে। এ সবই শওকতের চোখের সামনেই ঘটেছে, ক্ষীণ প্রতিবাদ মাথায় নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে শওকত বেপারি

ঘুরে বেড়ায়, মানুষের হৃদয়ের কাছে আবেদন জানায়। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে মানুষ বনমানুষে রূপান্তরিত না হয় সেই উপদেশ দিয়ে গেছে শ্যামসুন্দর। তার নির্দেশ ও উপদেশই হল শওকতের এই অভিযানের মূলমন্ত্র! শওকত আর ঘাটে যায় না, দুয়ারে দুয়ারে যায়, মানুষের বিবেকের কাছে হৃদয়ের কাছে আবেদন জানিয়ে চলেছে।

কাসেমু ঘুরছে পয়সার ধান্ধায়, শওকত ঘুরছে মানুষের ধান্ধায়, পারঘাটার নৌকা রয়েছে চন্দরের হেপাজতে।

সোঁতার ওপারে কলের ভোঁ বাজলেই চন্দর বের হয় প্রথম খেয়া জমাতে। গাঁয়ের চাষীদের কল দানবের গহ্বরে ঠেলে দিতে খেয়া পার করা হল তার কাজ। সোঁতার পরিসর ছোট, অল্প সময়ে পারাপার করার কোন অসুবিধা হয় না।

চন্দর জাতে জেলে, বিশ্বাসে বোষ্টম।

বনেদি বোষ্টম নয়। এক পুরুষে বোষ্টম। তবুও ঠোঁটের ডগায় রাধেশ্যাম আর সব কথেই 'তাঁরই ইচ্ছা' বিনা আর অন্য কথা শোনা যায় না। বনেদি বোষ্টম না হলেও বোষ্টমরাজ।

'তাঁরই ইচ্ছা' বহুকাল কাটিয়ে হঠাৎ তার মতিভ্রম হল। এতকাল যেভাবে তার দিন কাটছিল তাতে বাধা পড়ল। অবশ্য তার ভবতরণী প্রায় বৈতরণীর ধারে নিয়ে এসেছিল এমন সময় মহামুণি পরাশরের মত তারও সাথে দেখা হয়ে গেল হারানীরূপী মৎস্যগন্ধার।

হারানীও চন্দরের মত যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে গেছে। কি করে তাদের পরিচয় ভাব ভালবাসা হয়েছিল তার নেপথ্য কাহিনী কারও জানা নেই। তবে চন্দর অসার সংসারের সার একটু বেশি বয়সে উপলব্ধি করতে পেরে যেমন খুশি হয়েছিল, তেমনি যথাচিতভাবে শওকতের পারঘাটার ঠিকে কাজ পেয়ে পয়সার চিন্তাটা লাঘব হয়েছিল।

হারানী অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে এটা লোক মুখে শোনা কিন্তু চন্দর জানে হারানী অন্তুবোরেগীর বিধবা, বয়স তিরিশের এধারে অথবা ওপারে। চন্দরকে দেখা যেত নামগান করতে, বসে বসে পদাবলীর মাহাত্ম্য শুনতে।

অন্তু বোনেদি বোষ্টম। তার মা বৃন্দাবনের নীলযমুনায় তীর্থস্নান করে এসেছিল। অন্তুর গলা ভারি মিষ্টি, আর তার জুটি হবার যোগ্যতা ছিল একমাত্র বোষ্টম বোষ্টুমির। অন্তু মারা গেল কলেরায়। হারানী কেঁদে ভাসাল অন্তুর চৌকাঠ। পরে দেখা গেল সে একাই কেঁদে ভেসে বেড়ায়নি, পাড়ার জোয়ান ছেলেদেরও সে ভাসাতে আরম্ভ করেছে তার যৌবনের দীপ্তি দিয়ে। অন্তুর ভাঙ্গা খড়ের ছাউনিতে রঙ্গরসের বাজার বসিয়েছে হারানী। অনেকের চোখ জ্বালা করে হারানীর বেহায়াপণায়, অনেকেই হারানীর কৃপা পেতে লালায়িত। কিন্তু জোয়ারের জোর বেশি তাই হারানীর নৌকায় উঠবার সুযোগ না পেয়ে অনেকেই হতাশ হয়েছিল। শেষ অবধি হারানী ভাসতে ভাসতে চন্দরের গাঙে এসে নৌকা বাঁধল। না বেঁধে উপায়ও ছিল না। চন্দর ঘর ছেড়ে উঠল অন্তুর খড়ের চালায়। ভাণ্ডারা দিয়ে কণ্ঠী বদল করে সংসার বাঁধল দুজনে।

দু'কুড়ি বয়স কেটেছে চন্দরের রাধেশ্যামের গুণগান করে। তাঁরই ইচ্ছায় কণ্ঠ বদলের পর বুঝতে পারল, মেয়েমানুষ সংগ্রহ করা খুব কঠিন না হলেও পয়সা ন থাকলে মেয়েমানুষ নিয়ে সংসার পাতা কঠিন কাজ। বন্ধুর বিধবার গতি হলেং নিজের গতি করাই ছিল সমস্যা। উপরন্তু একদিন দ-তেখারিয়ার অন্তুর চালা ছেড়ে হারানীকে নিয়ে যখন ধলাটে নিজের ঘরে হাজির হল তখন সমস্যাটা হল গুরুতর সমাধানের পথও পঙ্কিল।

সংসারের অনেক কিছুই চন্দর জানত না ও বুঝত না। তার অজ্ঞানতাকে দূর করতে হারানী সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। জেলের ছেলে জাল মারা ছেড়ে একতারা বাজিয়ে ভিখ মেঙ্গে এতদিন ভালই কেটেছে, এখন তো সে একা নয়। ভিখ মাঙ্গলে নিজের পেট ভরলেও বউয়ের পেট ভরে না। হারানী সংসার পেতেছে, অনেক কিছুর সম্ভাবনা রয়েছে এর পেছনে। এসব সম্ভাবনার মুখোমুখি হবার ক্ষমতা ছিল না চন্দরের। কিন্তু 'তাঁরই ইচ্ছায়' অযাচিতভাবে শওকত যখন ডেকে পার-ঘাটার কাজ দিল তখন তা হল তার হাতে স্বর্গ পাওয়া। চন্দর পেটের ধান্ধা থেকে রেহাই পেল, শওকতও তাকে কাজ দিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘোরার যথেষ্ট সময় পেল।

কাজ দেবার আগে শওকত চন্দরকে বাজিয়ে নেবার জন্য বলল, তোর ভীমরতি ধরেছে দেখছি।

চন্দর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল, ঠিক বলেছ চাচা। সত্যিই আমা ভীমরতি পেয়ে বসেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সারা জীবন নাম করে কেটে গেল। শেষ বয় 'তাঁরই ইচ্ছায়' সংসারে জড়িয়ে পড়লাম। ছিলাম জোলা, জাল বুনে খেতাম, এখ দায় হয়েছে সর্ষে বুনে। হেঁ-হেঁ। তবে তুমিই রক্ষা করতে পার।

তাই তো ভাবছি। কিন্তু খাবি কি। খাওয়াবি কি? কলে কাজ নিবি নাকি?

কল, বলেই চমকে উঠল চন্দর।

চন্দর যেন আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, কলে কাজ করলে মানু আর মানুষ থাকে না চাচা। কলের কাজে মানুষ কলের মানুষ হয়। আমি বোষ্টম কল আমার সহ্য হবে না চাচা। কদিন থেকে বউ বলছিল, গাঁয়ের লোক তোমা মান্য করে। তুমিই পার আমাদের ব্যবস্থা করতে। তোমার ঘাটের কাজে আমা যদি ঠিকা দাও তা হলে পরাণে বাঁচি।

পারবি তো?

নিশ্চয় পারব। উৎসাহের সঙ্গে চন্দর বলল।

দশ আনা ছ' আনা রাজি?

চন্দর অতটা ভাবেনি, ভাবেওনি। ভেবেছিল চার আনা বার আনা। দশ আন সে পাবে। বেপারি বলে কি।

চন্দর রাজি হয়ে গেল। এমন সুবিধা কখনও সে পাবে না।

বেইমানি করবি না তো?

দুই কানে হাত দিয়ে চন্দর বলল, বোষ্টম বেইমানি করে না চাচা।

করলে কিন্তু অন্যকে ডেকে কাজ দেব। বুঝলি।

চন্দর ভাল করেই বুঝেছিল।

কপালে চন্দনের ছাপ, গলায় তুলসীর মালা, মুখে রাধেশ্যাম, নৌকার গলুইতে বসল বৈঠা আর লগি নিয়ে চন্দর মাঝি।

ভোঁ বাজলেই ঘাটে আসে। সূর্য যখন যশাইয়ের ঝোপে মুখ লুকোয় তখন নৌকা লোহার শেকল দিয়ে খুঁটির সঙ্গে তালা দিয়ে ঘরে ফেরে। অবসর সময় গুণগুণ করে পদাবলী গান গায়। বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে শুকনো নেশায় কয়েক টান দিয়ে এক তারা নিয়ে বসে, দোঁহা আওড়ায়। হারানী মেঝেতে বিছানা করে ঘুমোয়। রাতের এক প্রহর পেরোলে হারানীকে ডেকে তোলে। তেলের কুপি জেবলে দুজনে খেতে বসে। মাঝে মাঝে চন্দর হারানীর মুখে খাবার তুলে দেয়। হারানীও চন্দরের মুখে খাবার তুলে দিয়ে হেসে ওঠে।

রোজ সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার পথে শওকতের বাড়ি গিয়ে পারের কড়ির হিসাব মিলিয়ে দিয়ে আসে পাইতে পাইতে। পুরানো দিনের চন্দর হারানীর খাঁচায় নতুন পড়া শিখছে কিছুকাল থেকে। পুরানোর তলা দিয়ে নতুন চন্দরের চেহারাটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে কারিগর হারানীর নিখুঁত শিল্প সাধনায়।

অনেক ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে হারানী। কাঁচা পয়সার দিকে শ্যেণদৃষ্টি। তার এই শ্যেনদৃষ্টি অন্তুকে পথে বসিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অন্তু মরে বেঁচেছে। কিন্তু কপাল পুড়ল চন্দরের। হারানী চালাক মেয়ে। চন্দর পাইতে-পাইতে হকের পয়সা শওকতকে জমা দেয় এটা হারানী সহ্য করতে পারছিল না। সিকি আধুলি উপরি না পেলে তার মন ওঠে না। তার নানা বায়নাক্কায় চন্দর অস্থির। মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল হারানী, বলল, হক পয়সা চন্দরের, মেহনত করবে আর ঘরে বসে পয়সা পাবে শওকত। এ হতে পারে না, টাকায় এক আনার বেশি শওকত পেতেই পারে না।

পুরুষের পৌরুষ নারীর ছলনার কাছে হার মানতে বাধ্য। ভাগের কড়িতে হাত দিতে আরম্ভ করল চন্দর। হারানীর মুখের যুক্তির চেয়ে তার কটা চোখের বঙ্কিম চাহনি চন্দরের পক্ষে অকাট্য যুক্তি। বেইমানীর প্রথম পাঠ শুরু করল চন্দর।

শওকত না বুঝল এমন নয়। চন্দরকে তাড়িয়ে দিলে চন্দরকে না খেয়ে থাকতে হবে। অভাব তার বৃদ্ধি পেয়েছে তাই স্বভাবে ঘুণ ধরেছে। চন্দরের ওপর রাগ করতে পারেনি। তবুও একদিন নেহাত বলেই ফেলল, ঘাটের কড়ির ঠিক হিসাব রাখিস তো ?

আচমকা কথাটা শুনে চন্দরের মুখের চেহারা সাদা হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, কি কও চাচা। হিসেব, সে আমি ঠিক রেখেছি। বাজার একটু ঢিলা পড়েছে। কলের মজুরদের ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করা কি সহজ।

ঠিকই। তাই তো ভাবনা। একে বাজার ঢিলে, তারপর ট্যাঁক খুলতে পারিস না তার ওপর তুই বোরেগী বোষ্টম মানুষ, পয়সা নিতে ভুল করিস না তো।

কথাটা কঠিন না হলেও অর্থটা খুবই গূঢ়। চন্দর যে না বোঝে এমন নয়। ঘাটের কড়ি বেড়েছে বই কমেনি। আজকাল কলের ভোঁ বাজলেই চাষীরা এপার

ওপার যাতায়াত করে। কলের হাতায় যাতায়াত বেড়েছে। রোজ বিহানে পাখি ডাকার সাথে সাথে তাদের ছুটতে হয়, একথা চন্দর যেমন বোঝে শওকতও তেমনি বোঝে। হিসাবের কড়ি কমবেশি বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয় না।

যাবার সময় শওকত হেসে বলল, ইমান না থাকলে মুসলমান হয় না চন্দর। বোরেগীর গলায় মালা কি বোরেগী করে। মনে বোরেগী হতে হয়। যাক্, তোর ধর্ম তোর।

শওকত চলে যেতেই চন্দর মহা ভাবনায় পড়ে গেল। বিশ্বাস এমন একটা অদৃশ্য বস্তু যাকে আশ্রয় করে মানুষ পরাভোগের হাত থেকে রেহাই পায়, অবিশ্বাসের কণা সাজানো ঘরে আগুন লাগায়। চন্দর যে ইচ্ছা করে ফক্কাবাজি করে তা নয়, পাশের গাঁয়ের মোহান্তের আখড়ার মাতাজির বেগুনি রং-এর শাড়ি দেখে এসে অবধি হারানী বায়না ধরেছিল। দামও সামান্য। এগার টাকা চোদ্দ আনা।

হারানী বার বার তার পৌরুষকে আঘাত দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল, অবশেষে তার আব্দার রক্ষা করতে হয়েছে। এই ভাবে হারানীর নানা আবদার রাখতে শওকতের অংশ থেকে পয়সা হাঁতড়ে নিতে হয়েছে।

হারানীর শাণিত যুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে শওকতের গলায় শাণিত ছুরি বসাতে মোটেই দ্বিধা করেনি। যদিও হারানীর বুদ্ধিতেই সে পরিচালিত হচ্ছিল তবুও তার দায়িত্বটা তো অস্বীকার করবে না। প্রথম প্রথম চন্দরের মনে খোঁচা দিত। তারপর নির্বিকার। তখন সে অভ্যাসের দাস। আর হারানীর দাসানুদাস।

হারানীর পছন্দ ভাল। বেগুনি শাড়িতে তাকে মানিয়েছে ভাল, সখ সৌখিনতা থাকাটা তো অপরাধ নয়। হারানীর বয়স কম, সাজবার ইচ্ছা তার থাকা অনুচিত নয়। হারানীর নিটোল স্বাস্থ্য, মটরের ডালের মত রং বেগুনি শাড়ির আচ্ছাদনে যেন রূপের তরঙ্গ তুলে চন্দরের চোখ ঝলসে দিচ্ছিল।

চন্দর একতারা বাজায়। হারানী গলা ছেড়ে গান গায়।

শওকতের কথাগুলো বিষের ছুরির মত বিঁধলেও চন্দর সতর্ক হল না।

সারাদিন ঘাটে থাকে চন্দর আর ঘরে একা থাকে হারানী। সেদিন পটলা এসে বলল, তোমার ঘরে কুটুম এসেছে গো বাবাজি।

কুটুম! হারানীর তিনকুলে কেউ আছে এতো চন্দরের জানা ছিল না। তার নিজেরও কোন কুটুম নেই। কুটুম আসবে কোথা থেকে। চন্দর কোন উত্তর না দিয়ে সূর্য ডোবার অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে হারানীকে জিজ্ঞেস করল, আজ কে এসেছিল গো?

আমাদের দক্ষের সোয়মী, চেন না তুমি। তালপুকুরের মাসির মেয়ে, এবার মনে পড়েছে তো।

চন্দর শুধু বলল, তা বেশ, বেশ। তা চলে গেল কেন, দু একদিন থেকে যেতেও পারত। কুটুম মানুষ!

আবার কাল আসবে বলে গেছে। দক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

শওকত মিষ্টিমাখা ধারালো কথাগুলো তার কলিজায় ভাল ভাবেই বিঁধেছিল। মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। চন্দর ঘরে ফিরে দেখে হারানী রান্না করেনি।

দাওয়ায় উঠেই হাঁক দিল, কই গো, কোথায় তুমি।

হারানীর বদলে অন্য গলা শোনা গেল, তোর নদের নিমাই এসেছে রে।

হারানী খিল খিল করে হেসে উঠল। গুটি গুটি পায়ে চন্দর এসে রান্না ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল।

হারানী সামনে এসে বলল, কাল বলেছিলাম দক্ষ আসবে, দক্ষ এসেছে। তোমার কুটুম্বও এসেছে। আজ দুজনকেই আটকেছি। দক্ষকে লক্ষ্য করে বলল, গরীব দিদির বাড়িতে যখন এসেছিস তখন দুএকদিন থেকে যেতে হবে। যা পেন্নাম কর বাবাজিকে।

প্রণাম করে সামনে দাঁড়াল দক্ষময়ী। শ্যামবর্ণ, নাকে রসকলি, গলায় তুলসীর মালা, বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। গোরা রং না হলেও বেশ সুশ্রী। চন্দর মনে মনে ভাবছিল, বাবুদের বাড়িতে যখন নতুন বউ আসে সঙ্গে আসে কত যৌতুক। তার বউ এসেছে ন্যাড়া হয়ে, যৌতুক আসেনি সঙ্গে। এই এল প্রথম যৌতুক। বউয়ের সঙ্গে যৌতুক না এসে দেরিতে এসেছে এটাই পরম ভাগ্য। এই যৌতুককে সম্যক মর্যাদা দেবার জন্য কি করা উচিত তা ভেবে না পেয়ে নিজেই হাসল।

পেন্নাম করলাম আশীর্বাদ করলে না তো বাবাজি।

আমি আশীর্বাদ করার কর্তা নই। 'তাঁরই ইচ্ছা' সব, তাঁর আশীর্বাদ তিনিই করবেন। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। রাধেশ্যাম। বুঝলে দক্ষময়ী, তিনি তো তোমার পর নন, তাঁর কাছেই আশীর্বাদ চাও, মঙ্গল হবে।

হারানীকে লক্ষ্য করে বলল, একটা দরকারি কথা আছে।

ঝঙকার দিয়ে বলল, সে পার হবে।

দক্ষ হেসে বলল, সারা রাততো পড়েই আছে বাবাজি, এত তাড়াতাড়ি দরকারি কথা শেষ হলে রাত কাটবে কি করে? না ঘুমিয়ে এপাশ ওপাশ করতে হবে। তা বুঝি জান না?

দক্ষের বাচলামিতে চন্দর মোটেই লজ্জিত হল না। দক্ষকে কোন জবাব না দিয়ে হারানীকে লক্ষ্য করে আবার বলল, কথাটা খুবই দরকারি কিনা।

অনিচ্ছা সত্বেও উনুনে কাঠ ঠেলে দিয়ে হারানী উঠে গেল পাশের ঘরে। চন্দর তার পিছু পিছু গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, শওকত বেপারি সন্দেহ করছে।

বেশিদিন বেইমানী করা যাবে না এটা হারানী ভালই বোঝে অত্তু বোরেগীর ভটেয় ঘুঘু চড়িয়ে সে এসেছে, এমন অবস্থা সামলাবার মত প্রস্তুতি তার ছিল তবুও জজ্ঞেস করল, কি বলল?

বলেনি কিছু, মুখোমুখি বলবেও না কিছু। আঁচ দিয়েছে।

আঁচে গা পুড়ে গেল বুঝি! আহা মোমের পুতুল। ওর ব্যবস্থা আমি করব। তোমাকে ভাবতে হবে না। বলেই হারানী রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। চন্দর তার শাড়ির আঁচল চেপে ধরল।

ছাড়। ছোটবোন বাড়িতে। দেখলে কি মনে করবে বল্লত। বয়স বাড়লে বুদ্ধি বাড়ে কি? পরিবার নিয়ে ঘর করবে। পয়সা থাকবে না ঘরে তা কি হতে পারে। পয়সা না থাকলে পরিবার ছাড়। পরিবার না ছাড়লে পয়সা আন। তুমি জোয়ান মরদ, তোমার কাজ পরিবার রক্ষা করা, কি ভাবে তা করবে তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে।

খাওয়া দাওয়ার পর হারানী এসে বলল, দক্ষের স্বামী মথুর এখনি ফিরে যাবে তার গাঁয়ে। দু-একদিন পরে এসে দক্ষকে নিয়ে যাবে।

প্রস্তাবটা চন্দর সমর্থন করতে পারেনি। তার অনিচ্ছাকে সম্মান না দেখিয়ে মথুর রওনা হল তার গাঁয়ের পথে। নেহাত হারানীর অনুরোধে দক্ষকে রেখে গেল।

শোবার ঘর একখানা।

মেঝেতে দক্ষের বিছানার পাশে হারানী নিজের চাটাই পেতে নিল। চন্দর তার চাটাই পাতলো বারান্দায়।

দক্ষ তখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। হারানী তখনও ঘুমোয়নি। চুপি চুপি বারান্দায় এসে চন্দরকে ডেকে বলল, বাবাজি ঘুমোলে নাকি।

চন্দরের চোখেও ঘুম ছিল না। শওকতের কথাগুলো তখনও কাঁটার মত বিঁধছিল। হারানী ডাকতেই সারা দিল।

ঠিক করলে কিছু?

চন্দর হারানীর কথা বুঝতে না পেরে বলল, কিসের।

হারানী তখন তার বিছানায় চেপে বসে তার হাতের ওপর হাত রেখে বলল, সেই তোমার শওকত মিঞার বিষয়।

শওকত চাচা যখন সন্দেহ করেছে তখন সামাল হতেই হবে। পারঘাটার ইজারা তার। আমি ঠিকে কাজ করি। কাল যদি বলে নৌকা থেকে নেমে যা তখন আমার কিছু করার থাকবে না। তা হলে কলের কাজে যেতে হবে!

হারানী চুপ করে শুনে কোন উচ্যবাচ্য করল না।

তুমি কি বল?

বলবার আর কি আছে, নি-মুরোদ মরদের পরিবার নিয়ে ঘর করা উচিত নয় বাবাজি।

এই ধরনের কটু কাটব্য শুনতে চন্দর অভ্যস্ত হয়ে গেছে। হারানীর অসংযত রসনা কোন রুচি ও সভ্যতাকে মেনে চলে না। এটা তার ভালই জানা আছে। তবুও প্রতিবাদ জানায়, জেনে শুনেই তো এসেছ। মুরোদ থাকলে কণ্ঠী বদল না করে অন্য কাউকে বিয়ে করে আনতাম।

তার প্রতিবাদ যে কঠিন আঘাত করবে জেনেও চন্দর বলার সুযোগ পেয়ে মোক্ষম আঘাত করল। সে জানত এরপর হারানীর জিবের নাগাল পেতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে। চন্দর বলা শেষ করতে না করতেই গরম তেলে কাটা কৈমাছের মত তিড়বিড়িয়ে উঠল হারানী। বেশ চড়া গলায় বলল, তোমার মত মরদের ঘর করার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল।

ভাল যখন জেনেছ তখন দাও না কেন।

চন্দর শওকতকে বঞ্চিত করে পয়সা ঘরে এনেছে। এটা তার মনে শেলের মত বিঁধছে কদিন থেকে, তার ক্ষোভটা আজ ফেটে পড়ল। সেও উত্তেজিত ভাবে বলল, চুরি করে পরিবার পোষার চেয়ে পরিবার না থাকাই ভাল।

হারানীও বোধহয় তাই চায়। মনের মত পুরুষ পাচ্ছে না বলেই না চুপ করে বসে আছে সুযোগের অপেক্ষায়। হারানীর ঘর করার দিন ফুরিয়ে এসেছে, উড়া পাখি গাছের ভাঙ্গা ডালে সাময়িক বসেছে, আবার সে উড়ে যাবে। নতুন বাসা বাঁধতে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হারানী উঠে গেল।

বার

রাতের বেলায় হারানী উঠে গিয়ে ঘরে শুয়েছিল কিন্তু সকালবেলায় চন্দর ঘুম থেকে উঠে দেখল দরজা খোলা। চন্দর ভেতরে এসে দেখল হারানী ঘরে নেই। সকালের মিঠে বাতাসে অঘোরে দক্ষ ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত দক্ষের দেহের কাপড় সরে গেছে, অর্ধনগ্ন উদ্ভিন্ন যৌবনরেখা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে উঠানামা করছে। পলকের দৃষ্টিতে কেঁপে উঠল চন্দরের হৃদ্‌পিন্ড! তার মাথা যেন বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকে। কোনরকমে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে থাকে। চন্দর কোন রকমে বারান্দায় এসে চিৎকার করে ডাকল হারানীকে। চিৎকার করে ডেকে দক্ষের ঘুম ভাঙ্গানো ছিল তার উদ্দেশ্য। চন্দরের গলার শব্দে দক্ষ লাফ দিয়ে উঠে কাপড় সামলে নিল। সলজ্জতার রাঙা আলতায় তার শ্যাম মুখখানা রাঙিয়ে চন্দরের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুরের দিকে গেল।

ডাক শুনে হারানীও এসে গেছে।

চন্দর বলল, সকালবেলায় আমাকে ডেকে দাওনি কেন?

না ডাকাটা যে কোন অপরাধ নয় তা বুঝেই হারানী কোন জবাব না দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চন্দরের দিকে তাকিয়ে উঠোনে নেমে গেল।

চন্দর গাড়ু হাতে করে বেরিয়ে গেল মাঠের দিকে। ঘাটে যাবার সময় হয়ে গেল। দক্ষ পথে দাঁড়িয়ে তারই অপেক্ষা করছিল। চন্দরের পথ আগলে দাঁড়াল।

ও বাবাজি শোন।

চন্দর দাঁড়িয়ে গেল।

মেয়েদের লজ্জার কথা অপরকে ডেকে কেউ শোনায় নাকি। দক্ষের গলার তীক্ষ্ণতায় চন্দর চমকে গেল। এখন সেই সকালের দক্ষ নয়, যার অবিন্যস্ত রূপসম্ভার উন্মাদনার আবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। সকালের সেই রক্তাভ শ্যাম তখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার কপালে অধরে। অথচ তারই এই ভিন্ন চেহারা দেখে চন্দর কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। থতমত খেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দক্ষ বেশ মোলায়েম গলায় বলল, কালরাতে তোমাদের ঝগড়া আমি শুনেছি বাবাজি। নদীর বালির চড়ায় ঘর বাঁধলে সে ঘর থাকে না। বুঝলে বাবাজি।

বুঝলাম না তোমার কথা।

সত্যিই চন্দর বুঝতে পারেনি।

বুঝতে পারনি। অন্তু বোরেগী কি করে মরেছে, জান? সেঁকোর বিষে। তুমি বুঝি ওভাবে মরতে চাও। হারানী ঘর করার বোষ্টুমি নয়। তা হলে অন্তু মরত না। মরেছে হারানীর আবদার রক্ষা করতে না পেরে, আর হারানীর পয়সার খিদে মেটাতে না পেরে। হারানীর অত্যাচারে অন্তু পাগল হবার মত হয়েছিল। সহ্যেরও সীমা থাকে বাবাজি। একদিন অন্তু প্রচণ্ড প্রহার করেছিল হারানীকে। এরপর হারানী অপেক্ষা করছিল সুযোগের। সুযোগ মত একদিন গাঁজার নেশায় যখন অন্তু বিভোর তখনই সেঁকো বিষ সরবত করে খাইয়েছিল। বুঝলে। সাপের ল্যাজে পা দিও না, মাথাটা চেপে ধরার চেষ্টা করলে তবেই সাপ বশ মানে।

দক্ষের কথাগুলো চন্দরের বুকে-পাঁজরায় শক্ত হয়ে বসেছিল। কোন কথা না বলে চন্দর নিজের কাজে চলে গেল।

বিকেলবেলায় মথুরের আসার কথা। চন্দর বাড়ি এসে দেখল সন্ধ্যা পর্যন্ত মথুর আসেনি। দক্ষেরও ফিরে যাওয়া হয়নি।

চন্দর চুপ করে বসে থাকতে থাকতে উঠে গিয়ে একতারাটা নিয়ে বসল বারান্দায়। এক তারায় টুং টাং শব্দ করতে করতে গান ধরল। অনেকদিন পরে গান গাইতে বসে বার বার গলা খ্যাঁকড় দিতে থাকে, তারের আওয়াজ আর গলা সহজে মিলছিল না।

দক্ষ পেছন থেকে এসে বলল, তোমার গলা তো ভারি মিঠে।

কথাটা বলেই দক্ষ হাসল, এ হাসিতে প্রাণ নেই। রয়েছে কি যেন একটা কান্নার ঝিলিক।

আজ অবধি চন্দরের গানের কেউ প্রশংসা করেনি, এটা তার পক্ষে নতুন কথা। সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, তোমার মুখে নতুন কথা শুনলাম। আজ অবধি কেউ আমার গানের প্রশংসা করেনি। তুমি-ই প্রথম। সবই 'তাঁরই ইচ্ছা'। জয় রাধেশ্যাম।

যারা প্রশংসা করেনি তারা তোমার গানও শোনেনি, তারা আওয়াজ শুনেছে। আওয়াজের তলায় থাকে গায়কের প্রাণ, সেই প্রাণের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেনি। যে আওয়াজে প্রাণের পরশ থাকে সে আওয়াজ শোনবার কান তাদের নেই, সে আওয়াজের মূর্ছ'ণা হৃদিতলে তারা ধারণ করতে পারেনি বাবাজি। একটা বিদ্যাপতি গাও বাবাজি।

তুমি বিদ্যাপতির পদাবলী বুঝি জান?

জানি। আমার বাবা ছিলেন পদাবলী কীর্তনীয়া। মাঝে মাঝে নবদ্বীপ যেতেন প্রভু সেবায়। সেখানে বিদ্যাপতির পদাবলী শোনাতেন। তাঁর কাছেই কিছু কিছু শিখেছি।

কিন্তু।

কিন্তু কি ?

ভাবছি মথুর আসেনি তাই বিরহ। তাই বিদ্যাপতি।

মথুর! দক্ষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

তোমার নিজের ঘরের লোককে জান না বুঝি, চেন না বুঝি ?

ওই বিটলের কথা বলছ। ও আমার কোন কালের সোয়ামি। পাশের বাড়ির পিতিবাসী, বাপের বাড়ি পেঁৗছে দিতে এসেছিল, পথে হারানী দিদির সাথে দেখা, ডেকে আনল তোমার ঘরে, বলল, কদিন থেকে যা দক্ষ। মথুর আমাকে পেঁৗছে দিয়ে চলে গেছে। হারানীদিদি বুঝি বলেছে, মথুর আমার সোয়ামি। মুখে আগুন।

তা হলে ?

তা হলে যা শুনেছ তা নয়।

চন্দর এসব ভাবতেও পারছিল না। মানুষ চেনা যে কত কঠিন তা ভাবতে ভাবতে তার অসার হাত থেকে একতারাটা চাটাইয়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। এমন নগ্ন সত্য কথা সে বোধহয় শোনেনি কখনও। বিস্ময়ে সে হতবাক্। কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

দক্ষ তাগাদা দিয়ে বলল, থামলে কেন, গাও।

হাঁ, গাইছি, বলে চন্দর আবার এক তারাটা তুলে নিল। দক্ষকে বলল, তুমি গাও।

গাইতে এখন ভুলে গেছি।

শ্যামের নামগান কেউ ভোলে না, তুমিও ভোলনি। নাও ধর।

অভ্যাস নেই।

নাই বা থাকল। পুরানো অভ্যাসটা একবাব ঝালিয়ে নাও।

দক্ষ জবাব না দিয়ে সিঁড়িতে পা দিল। চন্দর প্রথমে বুঝতে পারেনি! হঠাৎ দক্ষের হাত চেপে ধরে বলল, যেও না। চাপা সুরে দক্ষ বলল, ছিঃ। এতক্ষণে চন্দর বুঝল, কাজটা তার মোটেই ভাল হয়নি, পর নারীর হাত ধরে টানা নীতিসম্মত নয়। শব্দটা শুনেই লজ্জায় চন্দর যেন মাটিতে মিশে গেল। এরপর দক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছিল। তার হাত থেকে দক্ষের হাত আপনা থেকেই আলগা হয়ে খসে গেল।

চন্দর ভূতে পাওয়ার মত নির্বাক হয়ে বসে রইল।

দক্ষ রান্নাঘর ঘুরে এসে বলল, দিদি তো নেই। আমাকেই হেঁসেল ঠেলতে হবে। ওকি বাবাজি, আকাশের তারা গুনছ নাকি ? গান বন্ধ করলে কেন ?

চন্দর আচমকা বলল, তোমার দিদি গেল কোথায় ?

দক্ষ হেসে বলল, সে বলে গেছে, সরকার বাড়ি যাচ্ছি। মানা করলাম। বললাম, রাতের আঁধারে যেও না দিদি, আমার কথা শুনল না, ধান না আনলে নাকি কাল পেটে দানা পড়বে না।

মিছে কথা।

মানে ?

সরকার কর্তারা রাতের বেলায় গোলার তালা খুলে কাউকে ধান দেবে না।

দক্ষ হেসে বলল, সেও তা জানে। ভালই হয়েছে বাপু। একজন ঘোর সংসারী আরেকজন ঘোর বিবাগী। কে জেতে কে হারে তাই দেখব। কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে এমনটা হয়ই।

শেষের কথা কটা কোথায় গিয়ে আঘাত দেবে তা দক্ষ ভাল করেই জানে। যেখানে আঘাত করল সেখানে কাঁপুনি শুরু হয়েছিল। অবস্থাটা উপভোগ করছিল দক্ষ। তার ঠোঁটে দেখা গেল মিষ্টি একটা হাসি।

চন্দর নিরুপায়ের মত বলল, মাপ কর দক্ষ, আর কখনও এমন হবে না।

হাত জোড় কর, বল আর কখনও কোন মেয়ের হাত ধরবে না।

চন্দর হাত জোড় করতেই হো-হো করে হেসে উঠল দক্ষ। বলল, ওমা, সত্যি সত্যি তুমি হাত জোড় করলে, তোমার মত বোকা কখনও দেখিনি। মেয়েদের কাছে হাত জোড় করে থাকলে অন্তু বোরেগীর মত সেঁকো বিষে মরতে হয়। সত্যিই তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।

চন্দর যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে বলল, স্বয়ং ব্রজরাজ ব্রজবালার চরণসেবা করেছিলেন।

ঠিক বলেছ বাবাজি কিন্তু ঘরের কণ্ঠী বদল করা বউয়ের নয়, তার প্রণয় সখীর।

এবার চন্দরের পালা। সে বলল, ঠিক বলেছ দক্ষ। হারানীর কাছে হাত জোড় না করে তোমার সামনে হাত জোড় করেছি, এটাই হল নায্য কাজ।

দক্ষ ধপ্ করে চন্দরের পাশে বসে একতারাটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, তুমি বাজাও, আমি গাইছি।

চন্দর বিশ্বাস করতে পারল না। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলল, একা বাড়িতে পেয়ে মেয়েমানুষের হাত চেপে ধর কোন্ বিশ্বাসে, সেই বিশ্বাসেই আমার গানের সঙ্গে তোমার একতারার সুর মিলিয়ে দাও।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

এখনও।

হাঁ বিশ্বাস হয়েও হবে না।

তা বটে। বাজাও।

একতারার কান মুচড়ে চন্দর সুর দিল তাতে। দক্ষও সুরের সাথে গলা মিলিয়ে দিল।

—হরি গেঁও মধুপুর হম কুলবালা,
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা!

চন্দর অবাক হয়ে শুনছিল। গান শেষ হতেই বলল, তোমার সাথে বাজিয়েও সুখ।

এর বেশি এগিও না বাবাজি। বাজনার পর নাচ, নাচের পর গান। মোহান্তের আখড়ায় সেবাদাসীদের দেখনি বুঝি। তারপরের ঘটনা বলতে হবে কি ?

চন্দর লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেল।

দক্ষ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

চন্দরের মুখে জবাব ফুটল না, দক্ষের হাসির ধাক্কায় চন্দর কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেল।

দক্ষ হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চুপ করে রইলে কেন বাবাজি। হারানীর বিরহে মুখে কথা ফুটছে না বুঝি? বিরহ বড়ই কষ্টের। শ্রীরাধাও কেঁদে ভাসিয়েছিল শ্যাম বিরহে। যমুনার জল উথালপাতাল হয়েছিল শ্রীরাধার মনের বেদনায়। কিন্তু রাধা হারিয়ে শ্যামের ব্যথা। ইস্। আসবে গো আসবে। তার চেয়ে আবার একতারা হাতে তুলে নাও, প্রভুর নামগান করলে সব ব্যথার নিরাময় হবে। এবার তোমার পালা, নতুন কোন গীত শোনাও।

চন্দর ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। মৃদুস্বরে বলল, থাক, আরেকদিন হবে।

দিন আসার আগে রাতটাকে মাতিয়ে তোল বাবাজি।

চন্দর কেমন যেন বেভুল হয়ে দক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দক্ষ খিল-খিল করে হেসে উঠল। অনর্থক এই হাসি চন্দরের পক্ষে মোটেই আনন্দদায়ক হয়নি। তবুও এই গুমোট আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে একতারা হাতে তুলে নিল।

দক্ষ গম্ভীর ভাবে বলল, বাবাজি!

কে?

হারানীর জন্য শওকত বেপারির সঙ্গে বেইমানি করেছ। মেয়েমানুষের জন্য যে বেইমানি করে সে মেয়েমানুষের জন্য সব কিছু করতে পারে।

এই অভিযোগের উত্তর দেবার সামর্থ্য ছিল না চন্দরের।

ওকি! কথা বলছ না কেন? উত্তর দাও।

বলবার মত কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

একটা মেয়েমানুষ হারালে আরেকটা পেতে পার কিন্তু যে বিশ্বাস হারিয়েছ তাকি আর ফিরে পাবে?

আমার মন সায় দেয়নি, কেমন যেন মোহ আমাকে বিপথে টেনে নিয়েছিল।

তুমি তো বোষ্টম। তোমার এমন মোহ জন্মানোটা নিশ্চয়ই রুচি সম্মত নয়। নীতিসম্মতও নয়। তাই বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছ না। আমি উত্তরটা পেয়েছি।

আমার উত্তর তুমি পেয়েছ?

হাঁ। বলেই দক্ষ চন্দরের ডান হাতের ওপর নিজের বাঁ হাতটা রেখে বলল, কণ্ঠীবদলের বাঁধন মোটেই শক্ত নয় বাবাজি। প্রাণের বাঁধন দিতে পারনি। তোমাদের বাঁধনে তুমি ছিলে দেনদার আর হারানী তোমার ছিল মহাজন। মহাজন সুদে আসলে পাওনা বুঝে না পেয়ে তোমার ঘর অন্ধকার করে চলে গেছে। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করতে পারনি, তাই এই অবস্থা।

হতাশ ভাবে চন্দর বলল, হয়ত তাই।

বড্ড ভাবনায় পড়েছ, তাই না?

তাই তো দেখছি।

শোন বাবাজি। দিন কাটে রাত আসে। আবার রাত গড়িয়ে দিন আসবে। আমি কিন্তু তোমাকে অপরাধী মনে করিনি। আমার মনে হয়। তোমার মত সজ্জনের কপালে যে পাপ চেপেছিল তা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ। বিদ্যাপতি বলেছেন, সুজনক কুদিন দিবস দু-চারি। ভুল না যেন। ভাল মানুষ কষ্ট পায়, তা স্থায়ী হয় না। এটা ভুল না।

অনেক রাত অবধি দুজনে বারান্দায় হারানীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় বসেছিল। নিশুতি নেমে এল অথচ হারানী ফিরল না। চন্দর বলল, তুমি বস দক্ষ, আমি একবার সরকার বাড়ির আঙ্গিনা ঘুরে আসি। রাত তো অনেক হল, তার আসবার নাম নেই, কোথাও হয়ত গল্পে বসে গেছে।

দক্ষ কোন জবাব না দিয়ে রান্না ঘরে গেল। চন্দর লণ্ঠন হাতে নিয়ে হারানীর খোঁজে যাবে মনে করে উঠোনে পা দিতেই দক্ষ ডেকে বলল, কোথায় যাচ্ছ বাবাজি।

সরকার বাড়ি।

আর যেতে হবে না। খেয়ে দেয়ে নাও। আসবার হলে সে আসবেই।

মানে?

বুঝলে না। তুমি কি চোখ কান বুজে থাক বাবাজি। তা থাক বইকি। আমি দুদিনে যা বুঝেছি তা তুমি এতদিন ঘর করেও বুঝতে পারনি। সারাদিন থাক পারঘাটায়। বাড়িতে নদের নিমাই এসে ফিরে যায়, সে খবর কি রাখ তুমি!

মানে?

সব কথার মানে বুঝাতে হলে আমাকে রামায়ণ পাঠ করতে হবে বাবাজি। আমি কি পাঠশালার পণ্ডিত যে কথায় কথায় মানে বোঝাব! তোমার ঘরে কে আসে, না আসে তার খবর তুমি রাখ না, আর আমি ভিন গাঁয়ে থেকে সে খবর কতটা রাখব বল। লোক মুখে মাঝে মাঝে শুনেছি। এখানে এসে চোখেও দেখেছি, তাই তোমাকে রাতেরবেলায় গরু খোঁজার মত খুঁজতে মানা করছি। বুঝলে?

চন্দর চমকে উঠল, ব্যস্ত হয়ে বলল, কি খবর? কে আসে?

ঠাট্টা নয় বাবাজি, ঠাট্টা নয়। হাকিমপুরের বোষ্টমরা আমাদের ও তল্লাটে খুবই নামী লোক। ওদের পেতল কাঁসার ব্যবসা। অনেক পয়সা। বোষ্টমদের ঘরের মধ্যে বোষ্টমের বড়ই সুনাম। জোয়ান ছেলে, পয়সা আছে, গণ্ডাখানেক সেবা-দাসীও আছে তার আখড়ায়। তাতেও তার মন ওঠে না। হারানী তার নজরে পড়েছে। এবার সোয়াগণ্ডা হবে।

চন্দর হাতের লণ্ঠন নিচে নামিয়ে বারান্দায় চুপ করে বসে পড়ল।

দক্ষ বলল, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা হবে কেন? তুমি তো ভাব সমাধিতে থাক। আমার কথার কি দাম! তবে যাচাই করতে পার। শোন বাবাজি, ঘর তুমি বাঁধতে পারবে না, যদি পার সেটা হবে তোমার কাছে অমৃত লাভ।

তের

অনেক কথাই মনে পড়ল চন্দরের। বিশেষ করে গতরাতের কথাগুলো বারবার তার মনে ভেসে উঠতেই সব কিছু সহজ সরল হয়ে গেল।

গতরাতের কথা চন্দরের অগ্রাহ্য করার মত নয়। তবুও জোর দিয়ে বলল, এসব কথা সত্যি নয় দক্ষ।

তাই বই কি। পুরুষ মানুষ হয়ে চুরি করে পরিবার পালতে পার না, তুমি হারানীর সঙ্গে ঘর করবে। একেই বলে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। একটু ভাল করে গোঁফে তেল দিয়ে পাকিয়ে যদি রাখতে বাবাজি তা হলে সব পরিষ্কার হয়ে যেত অনেক আগেই। হারানী ভেবেছিল অন্তুকে সেঁকো খাইয়ে সতী সেজে বেড়াবে। কিন্তু ঘটনাটা চাপা পড়লেও লোকে কানাকানি করতে থাকে হারাণীর চাল চলন দেখে। হারানী বোকা মেয়ে নয়। খুঁজতে লাগল নতুন ঘাট যেখানে সে নোঙর ফেলতে পারবে। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝল চন্দর বোষ্টমের ঘাটে শ্যাওলা জমেছে, এঘাটে শালুক পাওয়া যাবে না। তাই নতুন ঘাটের সন্ধানে ছিল, হঠাৎ পয়সার গন্ধ পেল মধুবোষ্টমের আখড়ায়, এখন সে ঘোড়ার মত ছুটছে। আর আসবে না।

এ সব তুমি জানতে।

জানতাম না, আন্দাজ করেছিলাম। আজ সারাদিন মধুর সাথে দোর বন্ধ করে ফিসফিসানি শুনে মনে হয়েছিল একটা কিছু ঘটবে। তবে এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটবে তা ভাবতে পারিনি। মধু যেমন খেলোয়াড় তেমনি পাকা খেলোয়াড় হারানী। তাই ওরা বিলম্ব করতে পারেনি।

হারানী যাবার আগে যদি বলতে তা হলে ওদের পাকড়াও করতাম।

পাকড়াও করলেই কি পোষ মানে বাবাজি। পোষমানা পাখির জাত আলাদা। বেরথা চেষ্টা করে কি হবে বাবাজি। জান তো ভাও দিয়ে পোষাতে হয়, ফাও দিয়ে নয়। অত ভাবতে হবে না। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। কাল সকালে আমিও বাপের ঘরে যাব। আগাম বলে রাখলাম। তোমাকে বন্ধন মুক্ত করে গেছে হারানী। এবার আমি রওনা হলেই তুমি রইবে একলা। এবার চুটিয়ে একতারা বাজিয়ে নামগান করতে পারবে বাবাজি।

চন্দরের মন তখন ছুটছে হারানীর পিছু পিছু। দক্ষের সব কথা তার কানে ভাল করে ঢুকে ছিল কি না সন্দেহ। চন্দর বোধহয় হারানীকে ভালবেসেছে। অথবা কমাস একত্র বসবাস করায় হারানীর নাটকীয় প্রভাব চন্দরের উপর বেশ ভাল ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

হারানীকে সুখে রাখবে বলেই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ঘাটের পার্টনির কাজ নিয়েছিল, হারানীর পরামর্শেই শওকতের প্রাপ্য হক্ টাকা চুরি করতে দ্বিধা করেনি, অথচ সেই হারানী। ভাবতে পারছিল না কি করে হারানী তাকে না বলে না কয়ে ঘর ছেড়ে

পালাবে। এটা বিশ্বাস করাও কঠিন। মেয়েমানুষ তার বুকে দয়া-মায়া-মমতাই নেই এটা ভাবাও যায় না।

দক্ষের নিষেধ না শুনে অত রাতেই চন্দর বেরিয়ে পড়ল লণ্ঠন হাতে নিয়ে। ঘরে একাই রইল দক্ষ। চন্দর না খেয়ে বেরিয়েছে দক্ষও না খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। চন্দরের ডাকে ধরমর করে উঠে বসে বলল, খবর পেলে ?

পেলাম না।

তা তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি।

হুঁ, বলে চন্দর লণ্ঠনটা নিভিয়ে দাওয়াতে বসে পড়ল।

দক্ষ জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ বাবাজি ?

ভাবছি তুমি যাওনি কেন ?

আমার যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু থেকে গেলাম, রাতের বেলায় পথ চলা তো নিরাপদ নয়। কাল যাব। তোমার গলায় শ্যামের নাম আরেকবার শুনে তবেই যাব।

চন্দর যে দক্ষের কথা বুঝতে পারল এমন নয়, তবুও কেমন মাদকতা অনুভব করল দক্ষের বাচনভঙ্গিতে। বলল, তোমার মেয়াদও তো আর কয়েক ঘণ্টা।

মনের মত ঘর না হলে মেয়াদ কমে বই কি। মন হাহাকার করেছে বলেই তো হারানী তার মেয়াদ কমিয়েছে।

হারানীর মত মেয়েদের ঘরের মেয়াদ চিরকালই কম থাকবে। ঘর ওদের কোন দিনই হবে না। মনের মত ঘর তৈরি করতে হয় দক্ষ। সে ঘর তৈরির ক্ষ্যামতা তোমাদের কারও নেই। আশমানে ঘর পয়দা হয় না।

দক্ষ কোন উত্তর না দিয়ে অন্ধকারে আঁট সাঁট হয়ে বসে রইল।

হঠাৎ চন্দর বলল, পুকুরের খোলামকুচি ছুড়লে ঢেউ ওঠে। এটা তো দেখেছ। কতক্ষণ তার আয়ু। আবার যে কে সেই তবুও যা ক্ষণের তা মনের না হলেও, ক্ষণকে মুহূর্তের তরেও স্মরণ করতে হয়। হারানী চিরকাল হারানী থেকে যাবে। আসল মেয়েমানুষটাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আমার আরও ভয় তোমাকে নিয়ে। কাল পর্যন্ত থেকে তুমি আবার দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে না তোল।

শেষের কয়টি কথা বলতে বলতে চন্দরের গলা ভারী হয়ে উঠল। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না, গেলেও দক্ষের মনে হয় চন্দর বোধহয় কেঁদে ফেলেছে হারানীর বিরহে অথবা বঞ্চনায়।

হারানীর চলে যাওয়াটা দক্ষের কাছে কোন মূল্যবান ঘটনা নয়। সে ভাল ভাবেই জানে ভেকধারী বোরেগী-বোষ্টমের ঘরে এমন অনেক সময়ই হয়ে থাকে। দক্ষ তার বাবার কাছে বৈষ্ণব হবার শিক্ষা ও দীক্ষা পেয়েছে ছোটবেলায়, তার চোখের সামনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। যারা সাজের বোষ্টম তারা কখনও কাউকে ভালবাসে না, যৌন আকর্ষণে ছুটে বেড়ায়, তারা ঘর বাঁধে ভোগের, ভালবাসার বাঁধনে যৌবন থিতিয়ে যেতে দেয় না কখনও। ভোগের পরিসমাপ্তি যখন অতৃপ্ত

নিয়ে আসে তখন মাড়াইকলের আখের ছিবড়ের মত ছড়িয়ে পড়ে পথে ঘাটে। এরা পথ খোঁজে ঘর খোঁজে না। রূপ তাদের যেমন হোক রুচির বালাই তাদের কম।

দক্ষ পাকা বোষ্টমের মেয়ে, পাকা বোষ্টমী। ঘর সে বাঁধেনি। কেন? তা হয়ত সে নিজেও বলতে পারবে না। তবুও চন্দরের মৌন দুঃখ সে আন্তরিক ভাবে অনুভব করেছিল। চন্দরকে সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছা থাকলেও স্পষ্ট করে সে কিছু বলতে পারল না। চন্দর নিশ্চয়ই হারানীকে ভালবেসেছিল, নইলে এমন উদাস কেন হবে। দক্ষ বিশ্বাস করে, ভালবাসার মূল সূত্র গাঁথা রয়েছে দেহের প্রতি ভোগের আকর্ষণে। চন্দরের মনে কোন সময় ভোগের বাসনা প্রবল হবেই তখন হারানীর প্রতি ভালবাসাকে সে ভুলে যাবে। চন্দর বোরেগী কিন্তু বিবাগী নয়। চন্দরের বাহ্যিক বোরেগীর ভূষণ তার অন্তরে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। দক্ষ বিশ্বাস করে বোরেগী হলেও বৈরাগ্য নিয়ে চিরকাল বাস করা সম্ভব নয়। সংসারে জড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

চন্দর অবশ্য মুখে বলে বোরেগীর ভেতর-বাহির সমান হবে, তা কি হয়? ভোগ-বিলাসী মানুষদের বৈরাগ্যের ভূষণ একটা বিলাস। এই বিলাসের অন্তরালে থাকে ভোগের প্রবল লালসা।

ভোগের বেসাতিকে জয় করে সংসারের সার যারা খোঁজে তাদের মত আহাম্মককে দক্ষের সহ্য হয় না। তবুও চন্দরের দুঃখকে সে যেন সবটা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল। দক্ষের মুখোশপরা মনের গোপন কোনে চন্দর সম্বন্ধে বোধহয় কিছু দুর্বলতা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। নিজেকে সংযত করতে দক্ষ দেহ ও মনকে প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওঠ বাবাজি, খেয়ে নাও। রাত অনেক হয়েছে।

চন্দর ওকথার কান না দিয়ে উদাসভাবে বলল, ভালই হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা নয় যে সংসারে আমি জড়িয়ে পড়ে, তাই হারানী পালিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। চল দুটো খেতে দাও, কাল থেকে তো আবার নিজে ফুটিয়ে নিতে হবে। আজ অবধি তো তোমাদের কৃপা পেলাম। জয় গুরু।

পিঁড়ি পেতে ভাতের থালা সামনে রেখে দক্ষ বারান্দায় চন্দরের বিছানা পেতে দিল। খেয়ে উঠে উদাসভাবে চন্দর গিয়ে বসল বিছানায়।

দক্ষও নিজে খেয়ে হেঁসেল গুটিয়ে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। চন্দরও বারান্দায় শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল নানা চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল। শেষ রাতে দক্ষ এসে দেখল চন্দর এপাশ ওপাশ করছে, তখনও ঘুমোয়নি।

ঠাট্টার সুরে বলল, বাবাজির কি শয্যাকণ্টক হয়েছে।

অনেকটা।

তা হবে, অনেকদিন বিছানায় শোওনি। এবার চোখে মুখে জল দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর। পিত্তির জ্বালা হয়েছে।

গাড়ু গামছা এগিয়ে দিয়ে দক্ষ অন্ধকারে উঠোনে নেমে গেল। চন্দর হাতে মুখে

জল দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ল।

দক্ষ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, বাতাস দেব কি?

না। তুমি শোও গিয়ে। সকালবেলায় তোমাকে আবার বের হতে হবে।

দক্ষ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে কি যেন ভাবল। অন্ধকারে তার মুখের চেহারা দেখা গেল না কিন্তু গলার শব্দে চন্দর চমকে উঠল।

কাল যদি না যাই।

না গেলে যেতে বলব না। আমি জানি তোমরা যাবার জন্যই আস। কাল না হলে তারপর যে কোনদিন তুমি যাবেই।

ঠিক বিবাগীর মত কথা হল না বাবাজি। পাকা সংসারীর মত কথা বলছ।

সংসার না করেও অনেকে সংসারী হয়। চার মাস হারানীর সঙ্গে ঘর করে অনেক কিছুই শিখেছি। ভাল করে একটা কথা জেনেছি, আমরা কিছুই শিখিনি, শেখার শেষ নেই। যা যা বাকি আছে তার কণিকা ধীরে ধীরে শিখতে হয়।

চন্দরের কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে দক্ষ দরজা বন্ধ করতেই চন্দর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সকাল বেলায় ঘুমন্ত চোখে পারঘাটায় এসে চন্দর সবে বৈঠা হাতে তুলেছে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে পটলা এসে বলল, হয়ে গেছে বাবাজি।

অবাক হয়ে চন্দর তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তাকিয়ে কি দেখছিস, এটা এখন হিঁদুর দেশ আর পদ্মার ওপারটা মোছলমানের। নদী পেরিয়ে দলে দলে বউবাচ্চা ঘটিবাটি নিয়ে এদিকে আসছে। আর মোছলমানেরা যাচ্ছে নদী পেরিয়ে ওপারে। আমাদের দেশ হল হিন্দুস্তান। আর মোছলমানদের দেশ হল পাকিস্তান। হাঁ করে কি ভাবছিস চন্দর, একথা শুনিসনি?

চন্দর দুনিয়ার কোন খবরই রাখে না। এতকাল সে নামগান করেছে, কিছুকাল জপ করেছে হারানীর নাম, চেনে তার ঘর আর পারঘাটা। এই সমাচারটা ভালভাবে জানবার জন্য জিজ্ঞেস করল, তা হলে!

তা হলে সব মিঞাকে শানকি-বদনা নিয়ে বিবির হাত ধরে হাঁটতে হবে। সরকারী হুকুম এসে গেছে। থানার পুলিশ-দারোগা বদল হয়ে গেছে।

খবরটা দিয়েই পটলা ছুটল। তার এলাকায় ঢোল সহরত করতে হবে। মিটিং হবে গাঁয়ে গাঁয়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। চন্দর কিছু না বুঝে চুপ করেই ছিল। হঠাৎ মনে হল শওকত বেপারিকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়।

শওকতের উঠোনে এসে দেখে গাঁয়ের প্রায় সব মুসলমান বসে কি যেন শলা পরামর্শ করছে। তাকে দেখেই সবাই চুপ করে গেল। কি যেন ভীতির ছাপ সবার চোখে মুখে। কিছু সহজ করে বলতেও পারছে না।

চন্দর ডাকল, চাচা!

শওকত উত্তর দিল, কেন?

পটলা একটা খবর দিয়ে গেল।

শওকত সব সংবাদই জানে। হঠাৎ শওকত উত্তেজিত ভাবে বলল, মোছলমানরা

এদেশে থাকবে না, তোর কি তাই চাস। আমরা সবাই চলে গেলে তোরা খুব খুশি হোস।

তুমি রাগছ কেন চাচা। আমি ওসব তো বলছি না, জানতে এলাম পটলা যা বলল তাকি সত্যি? পটলা হল সরকারী লোক, তাই তোমার কাছেই জানতে এলাম।

সত্যি বই কি। ওরা ঘোঁট পাকাচ্ছে, কিন্তু চন্দর আমবা এদেশ থেকে কোথাও যাব না যতদিন যশাই ততদিন আমরা রইব। জান কবুল, মান কবুল, এক কদম হাঁটব না। তোরা কি বলিস মকসেদ। পাঁচজনে যা বলবে তাই তো হক কথা।

যারা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, তারা মাথা নেড়ে শওকতকে সমর্থন করল।

চন্দর নিশ্চিন্ত হল, তা হলে পটলার কথাই সত্যি। সে ভাবতেও পারছিল না, দেশ দুভাগ হয়ে গেল, তারা জানল না, আর আজ সকাল থেকে ওরা হয়ে গেল মোছলমান আর চন্দররা হয়ে গেল হিন্দু। ওরা আর কেউ ধলাটেব সুখ-দুখভরা জীবনের বাঙ্গালী নয়। আশ্চর্য!

শওকতের কথা শুনে মনে হল, কত বেশি মাটির মায়া থাকলে শওকতের মত জোর গলায় বলা যায় আমরা যাব না। এরা ঘর ছাড়তে চায়না অথচ হারানী ঘর ভেঙ্গে পালিয়ে গেল।

আজ পারঘাটায় খুবই ভিড়।

ওপার থেকে অনেকে এসেছে। তারা সোজা হাঁটছে শহরের দিকে। এপারের মানুষ মায়ার বাঁধনে আটকে আছে, তারা নড়তে চাইছে না।

সন্ধ্যাবেলায় নৌকায় তালা দিয়ে বারান্দায় চাটাই পেতে বসল। চিরকালের অভ্যাসমত একতারাটা হাতে তুলে নিয়ে টুং টাং আওয়াজ তুলল! সকালে পান্তা আর পেঁয়াজ খেয়ে বেরিয়েছে। সে সময় দক্ষকে বাড়িতে দেখে গেছে, হয়ত সে ফিরে গেছে তার বাপের বাড়িতে। বন্ধনমুক্ত বড়ই নিঃসঙ্গ আজ।

দক্ষ ফিরে যায়নি।

ঘাটে গিয়েছিল। ফিরে এসে চন্দরকে ও-অবস্থায় দেখে বলল, আজ তোমার বিরহ গান শোনাও বাবাজি।

চন্দর অবাক হয়ে দক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাওনি?

তাড়াতে চাও বুঝি?

না, তা বলছি না. ভাবছি আবার চাল ডাল আনাজ কেনার ধান্দায় আটকে যাব। তার চেয়ে তুমি যদি নিজের পথ দেখতে তাহলে পুরানো দিন ফিরে পেতাম।

প্রদীপের সলতে কাঠি দিয়ে উস্কে দিতে দিতে দক্ষ বলল, সেইদিন ফিরে পাবে বলেই তো যেতে পারিনি। একা তুমি সবটা দেখতে পাবে না বলেই আমি রয়েছি তোমার সাথে আমিও পুরানো দিনগুলো পরখ করব বলে।

চন্দর হাসল।

হাসির শব্দ শুনে দক্ষ বলল, হেস না বাবাজি। চল দুজনে বৃন্দাবনের পথে বেরিয়ে পড়ি। সেখানে দু'মুঠো জুটেও যাবে, চাল ডাল আনাজের ঝামেলাও থাকবে না। প্রভুর চরণ দর্শন তো করতে পারব সকাল সন্ধ্যায়।

চন্দর আবার হাসল।

হাসির কথা নয় বাবাজি, সংসারে বাস করলে ঝামেলার পর ঝামেলা। এই চাল আছে তো ডাল নেই, ডাল আছে তো নুন নেই ; আজ পরিবারের শাড়ি চাই, কাল চাই নাকের নথ। কয়েক মাস এসব পরাভোগ তো সহ্য করলে। তার চেয়ে বৃন্দা বনের যমুনার কিনারায় ঝুপড়ি বেঁধে থাকা অনেক সুখের।

জবাব না দিয়ে চন্দর একতারাটা হাতে তুলে নিল।

আমার কথাটা ভাল লাগল না বুঝি ?

নির্বিকার ভাবে চন্দর একতারা বাজিয়ে চলল, জবাব দেবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কথা বলছ না কেন বাবাজি ?

অন্ধকারে প্রদীপের আলো মাঝে মাঝে চন্দরের মুখে আলোছায়া এঁকে দিচ্ছিল। তার মুখখানা দেখা গেলেও তা থেকে মনের কথা বোঝা যাচ্ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে চন্দর বলল, হুঁ।

চন্দর গান ধরল। দক্ষ বিরক্তির সঙ্গে বলল, থাম বাবাজি। আজ আমি গাইব।

দক্ষ গান ধরল, বিপথে পড়িল যৈছে মালতী মালা।

নিশুতি রাত।

জন মানবের সাড়া নেই। গোটা গ্রাম তখন ঘুমিয়ে।

প্রকৃতির এই নিস্তব্ধতার মাঝ দিয়ে দক্ষের করুণ অথচ সুমধুর কণ্ঠস্বর পদাবলী সুর অমৃতময় মূর্ছনা নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল বাতাসে।

চন্দর অবাক হয়ে তা শুনতে শুনতে কখন একতারা হাত থেকে নামিয়ে রেখেছিল অসারে তা মনে পড়ল যখন দক্ষ গান শেষ করে মৃদু হাসল।

বেশ গলা তো তোমার।

দক্ষ আবার হাসল। হাসির ঝাপটায় চন্দর সঙ্কোচ বোধ করতে থাকে। বলল হাসির কথা নয়, তোমার গানে প্রাণ আছে দক্ষ। অনুযোগের সুরে কথা শেষ করল, তবুও তুমি হারানীর জাত।

চন্দর মনে করেছিল দক্ষ বোধহয় তার কথার প্রতিবাদ করবে কিন্তু তার বাক্যবাণ দক্ষের হৃদয়স্পর্শ করতে পারল না। হারানীর মত যারা তাদের সম্বন্ধে ওসব কথা নতুন নয়, পুরানো কথা নতুন করে শোনা। হারানীর পলায়ন দক্ষকে মোটেই চিন্তিত অথবা দুঃখিত করেনি কেবল মাত্র প্রত্যাখ্যাত চন্দরের কথা ভেবে সে ভেতরে ভেতরে দুঃখিত হয়েছিল। মনের কথা বলে নিজেকে ছোট করতে পারেনি দক্ষ, শুধু মাত্র একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

দক্ষ উঠে দাঁড়াতেই চন্দর জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললে ?

দেখি খাবার জোগাড় করি। হারানীর সংসার দেখতে থেকেই গেলাম যখন তখন তোমাকে না খাইয়ে রাখি কি করে!

রান্নাঘরের দিকে যাবার সময় দক্ষ চন্দরকে বলে গেল, আজ চন্দরের বিছানা ঘা

করা হয়েছে। দক্ষ রইবে বাইরের বারান্দায়।

খেয়ে দেয়ে চন্দর গিয়ে বসল তার বারান্দার চাটাইতে। দক্ষ এসে তাগাদা দিল, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় বাবাজি।

তুমি অতিথি, নারায়ণ। উপরন্তু তুমি মেয়েছেলে। তোমাকে বাইরে রেখে আমি ঘরে শুতে পারব না বাপু। তুমি ভেতরে যাও বাপু। তখন কি যেন বলছিলে, বৃন্দাবন যাবার কথা।

দক্ষ দাঁড়িয়েছিল। খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে বলল, সে কথা কাল হবে। তুমি ঘরে যাও। আমার ঘুম পেয়েছে বাবাজি, তুমি আমার বিছানা ছাড়।

এরপর আর বসে থাকা উচিত নয় তবুও চন্দর বসেই রইল।

উঠবে কিনা? নইলে আমি রান্নাঘরে গিয়ে শোব।

না, না, রাগ কর না। আমি যাচ্ছি।

চন্দর উঠে ভেতরে যাবার সময় বলল, দরজাটা খোলাই থাকবে, দরকার হলেই ডাকবে। অন্ধকারে বাইরে যাবার আগে সাড়া দিও।

দক্ষ কোন কথা না বলে চাটাইয়ে গা এলিয়ে দিল।

দুজনের চোখেই ঘুম নেই, অথচ কেউ কোন সারা শব্দ দিচ্ছে না। দুজনেই চুপটি করে শুয়েছিল। রাত ক্রমেই শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় শেষ প্রহরের মুর্গির ডাক কানে যেতেই দক্ষকে উঠতে হল। শেষরাতেই নেয়ে ধুয়ে তুলসীতলায় গোবর দিয়ে ভোর না হতেই চন্দরের জন্য ফেনা ভাত করতে হবে। হারানীকে ফেনা ভাত করতে দেখেছে। চন্দর পারঘাটায় যাবে তারই ব্যবস্থা।

চন্দর গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে? দক্ষ, রাত থাকতেই যে উঠেছ, ব্যাপার কি?

তোমার মালসা ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে তো?

চন্দর পাশ ফিরে শুয়ে বলল, ও কাজ তো তোমার নয়, ভাবনাও তোমার নয়। 'তাঁর ইচ্ছায়' মুখের অন্ন আপনা থেকেই জুটেছে। তোমাকে ভাবতে হবে না, শুয়ে পড় গিয়ে।

আমি তোমার কাজ করি। এটা তুমি চাও না।

চন্দর মুখ ফুটে বলতে পারল না, খুব চাই।

দক্ষও কোন কথা না বলে শাড়ি গামছা দড়িতে রেখে নিঃশব্দেই চলে যাচ্ছিল। চন্দর ডাকল, দক্ষ শোন।

দক্ষ চৌকাটে দাঁড়িয়ে বলল, বল।

আমার মালসা ভোগের ব্যবস্থা করতে কে বলল?

তার কৈফিয়ত দিতে হবে কি!

তা নয়। কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার কি আমার আছে। ভাবছি। এ দরদ কত দিনের?

বাবাজি দেখছি পাকা জহুরী হয়ে গেছ। হীরে মোতির ব্যবসা করলেই ভাল হত।

হীরে মোতি চিনতে পারিনি বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।

দক্ষ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কি যেন বলল, বোঝা গেল না। হঠাৎ চন্দরে পায়ের কাছে বসে, বলল, অত কথার কাজ কি। চল বাবাজি আমরা বেন্দাবনে যাই কাল সকালে তুমিও মুখ দেখাতে পারবে না। আমিও না। তার চেয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

আমরা তো এমন কোন অপরাধ করিনি দক্ষ। মুখ দেখাতে পারব না কেন।

অপরাধ করিনি বললেই লোকে শুনবে কেন! খালি বাড়িতে অন্যের পরিবার নিয়ে বাস করলে তোমাকে কিম্বা আমাকে সাধুসজ্জন বলবে কি! অপরাধ না করেও অনেকে অপরাধী বলে গণ্য হয়। এটা কি বোঝ না!

চন্দর কেমন ঘাবড়ে গেল, বলল, তা হলে।

যা বলছি তাই কর।

দক্ষ কিন্তু পাকা জহুরী। চন্দরের কোথায় দুর্বলতা তা দক্ষের কাছে স্পষ্ট হয়েছে সামান্য কয়েকদিনেই। দক্ষ বুঝে ছিল। এ মাছ খেলিয়ে তুলবার মত নয়। হ্যাঁচ্কা টানে ডাঙ্গায় তুলতে হবে। অনুযোগ অনুরোধ জানিয়ে চন্দরের মন ভেজানো যাবে না। তার চেয়ে হুকুম করে কাজ উদ্ধার হল সহজ পথ! চন্দর যতই দ্বিধাগ্রস্থ হতে থাকে ততই কঠোর অনুশাসন জারি করতে থাকে দক্ষ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির এটাই তার সহজ উপায়।

সকাল না হতেই একতারা ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিজস্ব জিনিস পোঁটলা ভর্তি করে দক্ষের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল চন্দর। তখনও স্থির হয়নি গন্তব্যস্থলের।

আবছা আলোতে চন্দর একবার বোধহয় পেছনে তাকিয়ে দেখছিল। চন্দরের দ্বিধা দক্ষ লক্ষ্য করে শক্ত মুঠিতে তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, বাবাজি মরা ছেলে কোলে নিয়ে কাঁদতে নেই। ওতে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হয়। ফেলে এসে ফিরে দেখতে হয় না। আলো ফুটবার আগেই তিনটে গাঁ পেরোতে হবে। জোরে পা চালাও।

পারঘাটায় সকালবেলায় ভিড় জমেছে, ওপারে ভোঁ শোনা গেছে কিন্তু পার করার পাটনির দেখা নেই। খবর পেয়ে শওকত গেল চন্দরের খোঁজে। দরজা খোলা। জন-মানুষের চিহ্নও নাই, আশেপাশের কেউ বলতে পারল না চন্দর কোথায় গেছে মাঝরাতে অনেকেই ওদের গান শুনেছে। সকালে উঠে সবাই দেখেছে ঘর খালি ঘরের বাসিন্দারা নিখোঁজ।

অনেক দিন পরে ঘাটে এসে শওকত তার পরিচিত নৌকার গলুইতে বসেছে। লগি শক্ত করে ধরে সোয়ারি উঠিয়ে বৈঠার ধাক্কায় নৌকা পারাপার করছে। দুনিয়ার চেহারা বদল হয়েছে। শওকতের দেহটা অশক্ত হয়েছে, বদল হয়নি তার মনটা। মন তাকে আবার নৌকার হাল ধরতে টেনে এনেছে।

চোদ্দ

মুসলমান পাড়ায় বেশ চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন যাবত। সবাই ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। কানঘুষা শোনা যাচ্ছে এদেশে মুসলমানদের আর থাকা সম্ভব হবে না। ওপার থেকে যে সব হিন্দুরা সব কিছু হারিয়ে এপারে আসছে তাদের কোপ এপারের মুসলমানদের ওপর। কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা তাদের চোখে। কেউ কেউ জবরদখল করতে চেষ্টা করছে মুসলমানদের ভিটেমাটি। আতংক তাই সবার চোখে। গাঁয়ের ও ভিন গাঁয়ের মুসলমানরা শওকতের কাছে এসে বার বার জিজ্ঞেস করছে তারা কি করবে। যাদের পয়সা ছিল তারা সুযোগ বুঝে আগেই পাড়ি জমিয়েছে। আয়েনুদ্দিন তার এক বিবিকে তার সন্তানসহ এপারে রেখে আরেক বিবি নিয়ে ওপারে গেছে। এপারের জমিজমা দেখার আর ভোগ করার কাজ এক বিবির আর ওপারে হিন্দুদের বেওয়ারিশ জমি দখল করতে আয়েনুদ্দিন গেছে ওপারে। শুধু আয়েনুদ্দিন নয়। এরকম দুই বা ততোধিক বিবি যাদের তারা দেশ ভাগের সু-ফসল ভোগ করতে একই পথ নিয়েছে।

শওকত ওদের কথা শুনে ঘৃণার সঙ্গে বলেছে, ওরা হারামি।

কিন্তু যে সব গরীব মুসলমান এদেশে আছে, যাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ তারা বলির পাঁঠার মত বাক্যহীন ভীতিতে বাস করছে।

শওকত সরকার বাড়ির আঙ্গিনায় এসে বড়কর্তাকে জিজ্ঞেস করল, তা হলে কি করব কাকা ?

তোরা যাবি না। যেতে চাইলেও তোদের যেতে দেব না। যদি কারুর হিম্মত থাকে আসে যেন লড়তে। মণি সরকার এখনও বেঁচে আছে। তার দু'হাতে দুটো দোনলা বন্দুক কখনও শিকার ভুল করে না। বুঝলি!

শওকত কোন সময়ই ভয় পায়নি। গাঁয়ের আর ভিন্ গাঁয়ের লোকেরা তাকে ব্যস্ত করে তুলেছে। তাদের মাঝে মাঝেই বলছে, হায়াত আর মৌত মানুষের জীবনে আছেই। এতে ভয় পাস না কেন!

সেদিন সন্ধ্যার মজলিশে বড়কর্তার কথা সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে শওকত বলল, আমরা সমবেতভাবে বলব, এদেশ আমাদের আমরা এদেশ ছেড়ে যাব না।

আজকাল শওকত আর সকালবেলায় আগের মত গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। কেমন অবসাদ তার সারা দেহকে আচ্ছন্ন করে সময় সময়। পরী বুঝতে পেরেছে শওকতের অবস্থা। তার মন আর দেহ কোনটাই আগের মত সবল নয়। তবুও সাত সকালে পরী তাকে যখন পারঘাটায় যাবার জন্য তাগাদা দেয় তখন তার ইচ্ছে হয় আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারলে সে যেন বাঁচে। চন্দর বিশ্বাসযোগ্য না হলেও যে কমাস চন্দর পারঘাটায় কাজ করেছে সেই কয়মাস শওকত কিছুটা অবসর পেয়েছে।

চন্দরের হদিস খুঁজে পায়নি শওকত অথচ বুড়ো বয়সে হাল ধরার শক্তি ধীরে ধীরে উপে যাচ্ছে তা সে ভালভাবেই বুঝেছে। অনেক দিনের ইজরাদারিটা এখন বোঝার

মত হয়েছে, এখন ছাড়তে পারলে বাঁচে। কিন্তু বড় মায়া! যশাইয়ের এই পারঘাটা কিছুতেই সে ছাড়তে পারছে না। হিন্দুস্তানে মুসলমানদের কোতল হতে হবে শুনেও সে স্থির হয়ে নৌকায় বসে থাকে। যারা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল তারা বার বার বলেছে, চাচা,জান প্রাণের মায়া থাকলে ওপারে চল। এখানে আর পোষাবে না চাচা।

পরীকে একদিন বলল, সবাই বলছে পাকিস্তানে চল। তুই কি বলিস পরী?

পরী উঠোনে ধান শুকোতে দিচ্ছিল। শওকতের কথা শুনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের ধান বিছানোর ঝাঁটাটা সোজা করে ধরে বলল, এখানে সাড়ে তিন হাত মাটির অভাব হবে না মিঞা। ওখানে গেলেও সাড়ে তিন হাত, এখানেও সাড়ে তিন হাত। এর বেশি তো নয়। তার জন্য ঘরবাড়ি জমিজমা ফেলে অচেনা মুল্লুকে যারা যায় যাক। আমরা মোটেই আহাম্মক নই।

পদ্মার চর ভেঙ্গে সেবার সোঁতার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখনও সে ভয় পায়নি, জিজ্ঞেস করলে বলত, পদ্মার চর ভাঙ্গলে চর গজায়। এপারের মাটি ওপারে যায় কিন্তু পদ্মা তখনও পদ্মাই থাকে। সোঁতা শুকিয়ে পারঘাটা বন্ধ হলেও যশাইয়ের দোয়া তো বন্ধ হবে না।

আজকাল কাম্মু সহজে বাড়ি আসে না। শহরে সব সময় উত্তেজনা। গ্রামের গরীব মানুষরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। পরী সব সময়ই ভাবে কাম্মু ঠিক মত কাজকর্ম করছে কিনা। ও আবার ভেলেন্টারী করছে। ওর ওপর হিন্দুদের নজর থাকাও আশ্চর্য নয়। কাম্মুই বলেছিল ভারতবর্ষের শতকরা নব্বইজন মুসলমান পাকিস্তান চায়। পাকিস্তান হয়েছে, এবার সব মুসলমানকে পাকিস্তানে যেতেই হবে। তাদের এদেশে থাকার মত মনোভাব না থাকলে, সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকার মত মন না থাকলে যে কোন সময় হাঙ্গামা হতে পারে। তার ছেলে ছোটখাট নেতা হয়েছিল, এখন তার জন্যই যত ভয়।

হঠাৎ কাম্মু এল শহর থেকে।

কাম্মুর আগের জোস আর নেই। কেমন হতাশার সুর তার গলার শব্দে।

অনুযোগের সুরে পরী বলল, অনেক তো হল, এবার নিজের বাপের দিকে একটু নজর দে ব্যাটা, সারা জীবন মেহনত করল এখনও পারঘাটায় যেতে হয় রোজ দিন।

মায়ের অনুযোগে প্রথমে কান দিত না কাম্মু। শেষে বিরক্তির সঙ্গে বলল, বাপজান পারঘাটায় না গেলে বাঁচবে না মা। পয়সার জন্য ঘাটে যায় না। ঘাট হল বাপজানের জানের সমান। পয়সার খাঁকতি কতই বা আছে। খোদার ফজলে যা আনছি তাতে বাপজানের ঘাটে যাওয়ার দরকারই হয় না। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যে অভ্যাস তা ছাড়তে পারবে না। ঘাটের ডিঙি তার বেশি পেয়ারের। বুঝলে মা। তবে আমি সাহায্য করব মাঝে মাঝে, কিছু বিশ্রাম পাবে তাতে।

পরী অবুঝ নয়। সে বুঝল। শওকতকে বুঝিয়ে বললে তা অমান্য করবে না। দু-একদিন বসে থাকবে। তারপরই সুর-সুর করে আবার গিয়ে বসবে ডিঙিতে। আজকাল সকালবেলায় ঘুম না ভাঙ্গলে পরী তাকে ডেকে দেয় না।

রবিবারে কল বন্ধ। সোয়ারির হাঙ্গামা কম।

শওকত কদিন থেকে ভাবছে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। খেয়া দিতে হয় অনেক বার। তার চেয়ে বড় একটা নৌকা বাঁধতে পারলে এক এক খেয়াতে বেশি লোক পারাপার করতে পারবে।

শওকতের আজ ঘাটে আসতে দেরি হয়েছে।

বারোহাটের গদাধর ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখেই বলল, চাচা আজ তোমার দেরি হয়ে গেছে।

গদাধরের কথা শুনে শওকতের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, আজ রবিবার কল বন্ধ, সোয়ারী কম। বয়সটাও এগিয়ে যাচ্ছে গদাই।

ডিঙিতে উঠে শওকত বদরপীরের নামে হাঁক দিল, বদর বদর। তারপর হাত জোড় করে যশাইকে দোয়া মানল। রোজ নৌকায় যাত্রী তুলেই এই কাজটি সে করে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

শুনেছ চাচা, বলেই গদাধর কাছে এসে বসল।

শওকত শুধু মুখ তুলে তাকাল।

আমাদের বদনা তোমায় খুঁজছিল।

সে তো সরকারের চৌকিদারের কাজে ইস্তফা দিয়ে কলে কাজ নিয়েছে।

তাই তো বলছি। কলে জান দেবার সামিল হয়েছে। খুবই বেমার।

আছে কোথায়?

কলের বস্তিতে। কথা শেষ করেই সোঁতার ওপারের ডাঙ্গায় লাফ দিয়ে নামল গদাধর। নামতে নামতে বলল, সে বলছিল, তোমার কথা অমান্য করেই তার এই বেহাল হয়েছে। সে মাপ চেয়েছে চাচা।

শওকতের গম্ভীর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। এ হাসিতে কত বড় দুঃখের প্রলেপ ছিল তা গদাধর বুঝতে পারেনি। বুঝবার মত মনও তার ছিল না। ডিঙিতে নতুন যাত্রী উঠতেই শওকত জোরে একটা ঠেলা দিয়ে অপর পারের দিকে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

বদন চৌকিদার মাপ চেয়েছে। তার কঠিন বেমার। শওকতের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বিকেলবেলায় ওপারে নৌকা বেঁধে কলের দিকে রওনা হল। পথে শুধু বদনের কথাই ভেবেছে। বদন ক্ষমা চেয়েছে, ডেকে পাঠায়নি। ডেকে পাঠালে সে নিশ্চয়ই যেত না। ডাকেনি বলেই তার পা'দুটো তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে কলের বস্তির দিকে। বদন ভুল বুঝেছে। খুব দেরি হয়ে গেছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে বদনের আস্তানা খুঁজে পেয়েছিল। অন্ধকার ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকতে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করছিল। বস্তি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল গোঙ্গানির শব্দ। ভ্যাপসা গন্ধে তার নাক বন্ধ হবার মত। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। আন্দাজে এগোতে এগোতে বলল, কোথায় রে বদনা।

মাটি লেপা ছেঁচার দেওয়াল, মাথার কাছে ছোট্ট ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির আলোতে আন্দাজ করে নিল নিচে বাঁশের মাচার ওপর কে যেন কাঁথা মুড়ি দিয়ে গোঙ্গাচ্ছে।

এই বদনা, কেমন আছিস?

বদন ভাবতেও পারেনি শওকত তার খোঁজে আসবে। উৎসুক ভাবে বলল, চাচা? ওঃ। তুমি যে আসবে তা ভাবতেও পারিনি কখনও।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আছড়ে পড়ল শওকতের কানে। কানের দুটো পর্দা বোধহয় অব্যক্ত বেদনায় বিষিয়ে উঠল। এই আলো বাতাস হীন খোলার ছাউনীতে কোন মানুষেরই বাঁচার সম্ভাবনা নেই তা শওকত বুঝতে পেরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

কেমন আছিস? অনেকক্ষণ বাদে শওকত জিজ্ঞাসা করল।

ভাল না। বড়ই ব্যথা।

ফোঁস ফোঁসানি শব্দে শওকত চমকে উঠল, বলল, সাপের মত ফোঁসাচ্ছিস কেন? কোথায় ব্যথা? বুকে। তোর বউ কোথায়?

বউ! হতাশভাবে বদন বলল, সে চলে গেছে।

তোর অসুখ, তোকে ফেলে তোর বউ গেল কি করে। তার প্রাণে দয়ামায়া কি নেই! মানা করলি না কেন?

বদন মৃদুস্বরে বলল, কলে বেশি পয়সা। বউ সুখে থাকবে। তাই চৌকিদারি কাজ ছেড়ে দিলাম। ছেলেমেয়ে নেই, দুজন সুখেই থাকব। কপাল চাচা, কপাল। বউয়ের সুখ সহ্য হল না।

কোথায় গেছে? কবে আসবে?

বউ আর আসবে না চাচা। যখন গাঁয়ে ছিলাম তখন ওর দয়ামায়া ছিল। কলের বস্তিতে এসে দয়ামায়া আর ছিল না। আমি কলে কাজ করি আর ও কলের মত পাক খায়। পাক খেতে খেতে ঝামেলা পাকিয়ে তুলে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কলে যেমন আখ মাড়াই হয়, তা ছিবড়ে হয়, বস্তির মেয়েরাও প্রলোভনে মাড়াই হয়ে এমন ছিবড়ে হয় যাতে দয়াময়া থাকে না। মিস্তিরির বউরা সেজেগুজে বের হয়, জনমজুরদের বউদের তো তা জোটে না, তার চাহিদা আছে, যা পয়সা ছিল তা ফুঁকে গেছে খারাপ ব্যারামের ওষুধ কিনতে। কাজকর্ম করতে পারি না, ঘরে পয়সা আসে না। ভালই করেছে, শুকিয়ে মরার চেয়ে বাঁচার রাস্তা পেয়েছে।

নগদানগদ ভুলের মাশুল দিয়ে বদন বিকারহীন হয়ে গেছে।

হ্যারিকেন আছে রে?

কুপি আছে। ম্যাচ্‌ বাক্স বালিসের তলায় কুপিটা জেবলে নাও চাচা। শওকত যখন কুপি জ্বালছিল তখন বদন বলল, গাঁয়ে একটা সমাজ ছিল আর ছিল সমাজের শাসন আর এই বস্তির কুলিজীবনে না আছে কোন সমাজ না আছে কোন সমাজ শাসন। সবাই দাঁড়ছেঁড়া গরু, মাঠে মাঠে চড়ে বেড়ায়।

কুপি জ্বালতেই শওকতের চোখে পড়ল লম্বা প্রস্থে ছ'হাত অন্ধকূপ। বাঁশের মাচাং-এ জীর্ণনোংরা বিছানায় বদন শুয়ে পরকালের চিন্তা করছে, বিছানার চেয়েও জীর্ণশীর্ণ বদন তাতে শুয়ে, অর্ধনিমিলীত তার দুটো চোখ যেন কত কথা বলতে চাইছে।

এই ঘরের ভাড়া দিতে হয়।

হাঁ, তিন টাকা, কোম্পানির ঘর, কাজ না থাকলে ঘর ছাড়তে হয়। ভাড়াও দেই না তিন চার মাস, খোট্টার মেজাজ, দারোয়ান নয় যেন লাটসাহেব, আমি সরকারের চাকর ছিলাম, এত রোয়াব আমাদের ছিল না। কড়-মড় করে কত যে গাল দেয়, ভাবছি মরাই ভাল।

বউ গেল কোথায়?

জাহান্নমের দক্ষিণ দুয়ারে, বয়স রয়েছে, চোখ মুখ খুলেছে, সে কেন রইবে যক্ষ্মারুগী নিয়ে।

যক্ষ্মা! বলিস কিরে?

হাঁ চাচা, গলা দিয়ে রক্ত উঠল, কাজেও ছুটি হল। গাঁয়ে ফিরে যাব ভেবেছিলাম। কারও কথা শুনিনি, ফসলী জমিও বেচে দিলাম, ভেবেছিলাম, ছেলেপুলে যখন নেই, দুজনের ভালই কাটবে কলের চাকরিতে। গাঁয়ে গিয়ে হবেই বা কি। তোমার কথাই ঠিক আমরা ছিবড়ে হয়ে গেছি। তারপর বউ থাকে, পেটটা হল বড় কথা। ইদু মিস্তিরি দুনম্বর কলে গেল, যাবার সময় বউটাকে নিয়ে গেল। কপাল চাচা।

হাঁপাতে হাঁপাতে বদন চুপ করে গেল। হঠাৎ বলে উঠল, কলের ধর্মই এই রকম, ঘর সংসার করা বড় কঠিন। ক'মাস আগে মধু পালাল আলাবক্সের বউকে নিয়ে। কদিন একটু সোরগোল হল তারপর সব চুপচাপ। আর বাবুদের নজর, তা আর বলতে চাই না। নিত্য নতুন মেয়েমানুষ খোঁজে কুলি বস্তি থেকে। ভগবান ওদের ভাল করুক। আমরা ততদিনে শেষ হয়ে যাব।

শওকত বাধা দিয়ে বলল, আর শুনতে চাই না বদনা। গাঁয়ে ফিরে চল।

ও মুখো আর হব না চাচা, আর দু-একদিন হয়ত বাঁচব, কালো মুখ নিয়ে গাঁয়ে যেতে পারব না। একটু জল দাও চাচা। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে।

জল খেয়ে বদন হাঁপাতে থাকে।

আর কথা বলিস না বদনা। আমি তোকে গাঁয়ে নিয়ে যাব। মরতে হলে শাইয়ের মাটিতে মরবি। এই নোংরা বস্তিতে নয়।

আমাকে বলতে দাও চাচা, আমি আর বাঁচব না। যাকে খুশি করতে সরকারী াকরি ছেড়ে কলে এসেছিলাম, সেও পালিয়েছে এবার আমার ছুটি।

জোর দিয়ে শওকত বলল, তা হবে না বদন। গাঁয়ে তোকে যেতেই হবে। গাঁয়ের াটিতে বড় হলি, মরতে হলে ওই গাঁয়ের মাটিতে মরবি। যশাইয়ের ঘাটেই তোকে ড়তে হবে। কাল গাড়ি পাঠাব, কোন আপত্তি না করে তুই গাড়িতে বসে গাঁয়ে রে আসবি।

অনেক কর্জ হয়েছে চাচা।

আমি শোধ দেব, গাঁয়ে গিয়ে আরাম হবি, আবার সরকারী চাকরি করবি। শেষ তে তোর হাঁক শুনিনি অনেক দিন। সেই 'জাগো জাগো' হাঁক যেন শুনতে পাই। ুধপত্র হচ্ছে কিছু?

ক্ষীণ হাসিতে মুখ রাঙ্গা করে বদন বলল, কোথায় পাব, কে দেবে এখন।

শওকত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

ঘরের মধ্যে বসে শওকতের মনে হচ্ছিল অনেক রাত হয়ে গেছে। বাইরে এসে দেখল তখনও পশ্চিমের আকাশে সামান্য দিনের আলো উঁকি দিচ্ছে।

পরের দিন সকালে ওসমানের গাড়ি ঠিক করে মোকসেদকে পাঠাল বদনকে আনতে। কিছু টাকা দিল বদনের কর্জা শোধ করতে।

গাড়ির বলদ দুটোকে জোয়াল ছাড়া করে ওসমান ঢুকল বদনের ঘরে। ঝাঁপ খোলার শব্দে বদন মুখ তুলে দেখল। সে সময় বদনের প্রায় বাক্‌রোধ অবস্থা রাতের বেলায় কয়েকবার রক্ত বমি করে পাশ ফেরার ক্ষমতা প্রায় লোপ পেয়েছিল।

শওকত যে তাকে গাঁয়ে নিয়ে যাবার জন্য তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করবে তা ভাবেওনি।

ওসমান বলল, বদনভাই, গাড়ি এনেছি। গাঁয়ে যেতে হবে।

বদন শুধু হুঁ বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওসমানের দিকে। ওসমান আর দেরি করল না, দুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়িতে শুইয়ে দিল। বদন অতি ক্ষীণ স্বরে বলল, তাহলে আমি বাঁচব, কি বল মোকসেদভাই!

মোকসেদ গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলছিল। বদনের কথা কানে যেতেই বলল আল্লার রহম।

তাই তো। নইলে তোমরা বা আসবে কেন?

ঘাট তো বেশি দূরে নয়। ঘাটে গাড়ি আসতেই শওকত ছুটে এল।

বদন ফ্যাল ফ্যাল করে শওকতের দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না। আঙুল উঁচিয়ে আকাশ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল আর সময় নেই।

বদনা, ডাকল শওকত।

কোন জবাব দিতে পারল না বদন। গালের পাশ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি ওসমান আর মোকসেদ বদনের গতায়ু প্রায় দেহটাকে চাংদোলা করে নৌকায় তুলল। সোঁতা পেরিয়ে বদনের দেহটা শুইয়ে দিল যশাইয়ের ছায়াতে।

বদনের গলায় তখন ঘর্‌-ঘর্‌ শব্দ। কি যেন বলতে চাইছে, বলতে পারছে না অসারে ডান হাতখানা কোনরকমে নেড়ে ইশারায় জানাল তার শেষ ইচ্ছা। কি যে ইচ্ছা তা কেউ বুঝল না। তখন কস্‌ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, তার মধ্যে বহু কষ্টে অতি ক্ষীণ সুরে বলল, জল। চাচা জল।

শওকত চিৎকার করে উঠল, ওসমান পানি, জলদি পানি নিয়ে আয়।

জল পেঁছিবার আগেই তার দেহটা নিথর হয়ে গিয়েছিল, শওকত কোনরকমে কয়েক ফোঁটা জল তার ঠোঁট ফাঁক করে মুখে দিল। যশাইয়ের মাটিতে গা-এলিয়ে দিল বদন চৌকিদার। তার পেটি পাগড়ির হিসাব নেবার কেউ ছিল না। যশাইয়ের জামগাছতলায় খড়ের বোঁদায় বদন চিরবিশ্রাম পেল। শেষবেলায় পানীয় দিল শওকত, এতেই বুঝি তার সারা জীবনের ঋণ মুক্তি ঘটল।

শওকত এই করুণ মৃত্যুতে অভিভূত। তার চোখেও জল। ওসমান ও মোকসেদ গামছা দিয়ে চোখ মুছল।

শোন্ ওসমান, বদনা হিন্দু। তার শেষ কাজ গাঁয়ের হিন্দুরা যাতে করে সে ব্যবস্থা করিস। তোরা গিয়ে লোকজন ডেকে আন, আমি লাশ পাহারা দিচ্ছি।

সূর্যাস্তের আগেই বদনের চিতা নিভিয়ে ফিরে গেল গাঁয়ের মানুষরা। শওকত সেই সকাল থেকে নৌকার গলুইতে যেমন বসেছিল তেমনিই বসেছিল। মাঝে মাঝে যাত্রী পারাপার করছিল আর তামাক টানছিল। দুপুরে বাড়িতে খেতেও যায়নি, পরীজানও খাবার পাঠায়নি।

শওকত ভাবছিল, মৃত্যুই সত্য। কিন্তু অপমৃত্যু! মুরুব্বিদের কাছে শুনেছে হায়াত মৌত কারও তোয়াক্কা করে না। রোজ কিয়ামত পর্যন্ত কবরে বান্দারা ভিড় করবে আল্লার হুকুম শুনতে। ইহজন্মে আল্লার হুকুম মানতে মানতে দুনিয়া পয়মাল হয়ে গেল, পরজন্মে কি হবে কে জানে।

ছিলিম বদলে আবার হুঁকোটা হাতে করে এসে বসল গলুইতে।

যশাইয়ের ঝোপ আঁধারে ঢাকা পড়ল। মোকসেদ এসে বলল, চাচী তোমার ভাত নিয়ে বসে আছে চাচা।

শওকত বলল, ভাতটা ঘাটেই নিয়ে আয় মোকসেদ।

রাত নামতেই ছইয়ের তলায় শুয়ে ভাবছিল বদনের পরিণতি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষরাতে সোয়ারি এসে না ডাকলে তার ঘুম ভাঙত না। খুব বিপদে না পড়লে এত রাতে কোন যাত্রী সোঁতা পার হতে আসে না। শওকত ধর-মরিয়ে উঠে বসল।

ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখল, ঘোমটা টানা বউ আর সঙ্গে ক'জন জোয়ান মরদ। এই রকম বহু যাত্রী আসে যাদের চলা ফেরা বেশ সন্দেহজনক। ঘর পালানো মেয়েদের জীবনধরে মাঝে মাঝে সোঁতা পার করতে হয়েছে। আগে প্রশ্ন করত, আজকাল কোন প্রশ্ন করে না, এসব গা সওয়া হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ তার সন্দেহ হল। কেন বা মনে হল এরা দোজকের পথে এমনিভাবে নেমে যায় সবার অজান্তে।

জিজ্ঞেস করল, কোথাকার গো তোমরা?

পিরজিপাড়ার।

যাবে কোথায়?

নাটুরা।

ওঃ। ঘর ভেঙ্গে চলছ।

নাটুরার হাটের বড়ই দুর্নাম। সেখানে নাকি মেয়েমানুষ বিক্রি হয়। এখবর সে অনেকের কাছে শুনেছে।

কেউ কোন জবাব দিল না। মেয়েটা কেমন যেন জড়সড় হয়ে পিছিয়ে পড়ল।

কার ঘরের বউ?

জোয়ান মরদ দুটোর মুখও শুকিয়ে গেল।

পয়সাওলার ঘরে নিজের ঘরের মেয়ে বিক্রি করতে চলেছ। পেশাকর হবে, তাই না। ফিরছ কেন? জবাব দাও। শওকত পাটনীর নাম শোনেনি বুঝি!

শওকতের কথা শেষ হতেই সঙ্গী দুজন মাঠের আল ধরে দৌড় দিল। রইল শুধু

ঘোমটা টানা বউটা।

শওকত লাফিয়ে গিয়ে তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও। পালাবার চেষ্টা করলে বৈঠার ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দেব।

মেয়েটার ঘোমটা খুলে গেছে। শওকত জ্যোৎস্নার ফিকে রোশনাইতে তার মুখের দিকে তাকাতেই মনে হল, তাকে যেন সে চেনে।

তুমি হারানী, তাই না। চন্দরের পরিবার। কথা বলছ না কেন! শুনেছিলাম তুমি নাকি মধুবোরেগীর আখড়ায় গিয়েছ। মন উঠছে না বুঝি তাই নাটুরার হাটতলায় ঘর বাঁধতে চলেছ।

হারানী ভয়ে কেঁদে ফেলল। অনেক ঘর বদল করেছে, কোথাও বাধা পায়নি। শওকতের কথায় হারানীর সব পরিকল্পনা যেন ভেস্তে গেল। শওকত বেপারিকে সে ভাল করেই জানে, শওকতের নায্য পাওনা থেকে সে বঞ্চিত করেছে এটাও কারও অজানা নেই।

কতজনের ঘরে আগুন দেবে তুমি। অন্তুকে মেরেছ, চন্দরকে ঘরছাড়া করেছ। মধুর তোষাখানাও বোধহয় শূন্য করেছ। আর কেন, মতিগতি বদল করে কোন আখড়ায় যাও, বাবাজির কাছে নয়।

হারানী কথা বলে না কেবল কাঁদে।

কান্নার শব্দে শওকত একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, যাও ফিরে যাও। যশাইয়ের মাটিতে পাপ সয় না, যাও ফিরে যাও।

ঘরভাঙানী হারানী আজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন, সে ভাবেনি এই ভাবে বাধা পেয়ে তার জীবন ধারা বদল করতে হবে।

যাও ফিরে যাও হারানী। দুনিয়াতে তোমার মত আরও হারানী আছে, তবে ভাল মানুষও আছে, না হলে খোদার সৃষ্টি বরবাদ হয়ে যেত।

হারানীর মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

শওকত রাগ করতে পারছিল না। শ্যামসুন্দরের কথা মনে পড়ল, ওরা দায়ী নয় চাচা, ওদের ওপর রাগ করে লাভ নেই। ওরা চলবার মত শিক্ষা পায়নি। ওদের ভালভাবে চলতে শেখানো হয়নি। আমাদের কাজ ওদের সংশোধন করে মানুষ গড়ে তোলা। তখনই ওরা নিজেদের চলবার পথ খুঁজে পাবে।

হারানী কখন যে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছিল তা শওকত টের পায়নি, যখন টের পেল তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পনর

হারানকর্তার কর্মস্থল ছিল বাংলার বাইরে এমন জায়গায় যা ভারতের অঙ্গরাজ্যের অংশ নয়। তাই দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থান বদল করতে হয়েছে প্রশাসনিক নীতিতে। কিছুকাল উত্তর ভারতে থাকার পর তাকে সরকার বদলি করে এনেছে বাংলাদেশে।

নতুন বউ কাঁকনমালা এখন ঘরণী গৃহিনী। অনেকদিন পর কাঁকনমালা গ্রামে এসেছে। আসাটা স্বেচ্ছায় নয়। না এসে উপায় ছিল না। হারানকর্তা বদলি হয়ে এসেছে বাংলা মুলুকে। নিজের পৈত্রিক বাসস্থানে হারানকর্তা এসেছে সপরিবারে। তাই কাঁকনমালা এসেছে। কদিন থাকবে ঠিক নেই, সে নিজেও তো চাকরি করে।

খবর পেয়ে শওকত এসেছিল সরকার বাড়িতে।

কাঁকনমালাকে দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, তা হলে তুমি এলে নিজের ঘরে। বাপ্রে, কত বছর আগে সেই যে এসেছিলে।

কাঁকনমালা হাসল। শওকতের মনে হল সে কাঁকনমালা আর নেই। চেহারা বদলে গেছে, আগে ছিল দোহারা চেহারা এখন বেশ মুটিয়ে গেছে। প্রথম দিনে যে হাসি দেখেছে নতুন কাকির মুখে সে হাসিটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

বয়স বেড়েছে, পরিবর্তন হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে। শওকত মাঝে মাঝে আরসিতে নিজের চেহারা দেখেছে। আরসিতে যে চেহারা শওকত নিজেকে দেখেছে সে চেহারা সে নিজেই চিনতে পারে না। তারও মাথাটা সাদা চুলে ঢেকে গেছে, দাড়ি কাঁচাপাকাতে ভর্তি।

কাঁকনমালার পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। তবুও কাঁকনমালার দিকে তাকিয়ে পুরানো দিনের কাঁকনমালাকে সে খুঁজছিল।

শওকত বলল, দেশের সব খবরটা তো তোমরা জান। আমাদের খবরও ভাল নয়। ভাবছিলাম, আমাদের নতুন কাকি থাকলে অনেকটা সুরাহা হবে।

কাঁকনমালার আজ খবর শোনার অবসর ছিল না। বলল, কি খবর?

গ্রাম যে ফোঁত হয়ে গেল।

কি যেন ভেবে কাঁকনমালা বলল, ও বেলায় এস পাটনী ছেলে। এবেলায় কোন কিছু শোনার সময় নেই।

এমন শীতল উত্তর শওকত আশা করেনি। কেমন হতাশা বোধ করল শওকত। অনেক আশা করে এসেছিল। কিন্তু নতুন কাকির উদাস উত্তর তার মুখে কে যেন কালি লেপে দিল। এতদিন সে মনে করেছে তাদের এই বিপন্ন অবস্থায় একমাত্র নতুন কাকিই পথের সন্ধান দিতে পারবে। নিমেষে সে আশা চূর্ণ হয়ে গেল। কোথায় শওকতকে ডেকে পাশে বসিয়ে বুড়ো ছেলের কথা শুনবে, গাঁয়ের সুখ-দুঃখ হালচালের কথা শুনবে, তা নয়। যেন কত বদলে গেছে নতুন কাকি। গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। এমন হতাশা কখনও বোধ করেনি।

সরকারকর্তারা হিন্দু। এটা হিন্দুর দেশ, তাকে অবহেলাটা বোধহয় এই কারণেই। আবার ভাবল, তা হতেই পারে না। সরকারকর্তারাই জোর করে তাদের দেশ না-ছাড়তে বাধ্য করছে। এমন নিচে তো সরকার পরিবার কখনই নামবে না।

বাড়িতে এসে পরীকে বলল, নতুন কাকি এসেছে পরী।

পরী কোন গরজ দেখাল না, শুধু বলল, ভাল কথা।

তা বলতে পারিস। তবে ভাল নয় রে। তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম সে ভাল করে কথাই বলল, না। বলল, বিকেলে এস।

খারাপ কথা তো নয়। অনেকদিন পর এসেছে, অনেক কাজ হয়ত আছে অবসর সময়ে যেতে বলেছে। এতেই তুই মুষড়ে পড়লি। আশ্চর্য। তোর মনটা বড়ই ঠুনকো। এতে মন খারাপ করতে হয় না। সেবার তো তুই নতু কাকির গুণ-গান করেছিস। আজ সব উল্টে গেল। ওসব ভাবিস না। যা ঘাটে যা

শওকত ধীরে ধীরে বলল, জানিস পরী, দুনিয়াটাই বদলে গেছে। বদল হয়নি তোর আর আমার। খোদার দয়া, বুঝলি।

পরী কথার মোড় ঘোরাতে বলল, আরেকটা খবর শোন্। তোর পুত্তুর এসেছে সেই বিহানে।

আজ তো তার আসার দিন নয়। তোকে কিছু বলেছে কি ?

অনেক কথাই বলেছে। বেশি করে বলেছে বাপজান যেন ইজারাদারীতে ইস্তফা দেয়। তোর দেহ নাকি কাবু হয়ে গেছে।

শওকত অনেকবার পরীর কাছেও শুনেছে। কথাটা কাসুর নয় পরীর। বার বার একই কথা কাসুর মুখ থেকে শুনতে শওকত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শওকত হেসে বলল, আর কিছু বলেনি তোর ব্যাটা। তিরিশ প'য়ত্রিশ বছর এক কথাই শুনছি আর কোন নতুন কথা বুঝি নেই ?

আছে, কাসুর বে দাও। ছেলের বয়স দেড় কুড়ি হয়ে গেল। এদিকে নজর দিয়েছ কি কখনও।

কাসুর বিয়ের কথা শওকত অনেক দিন-ই ভেবেছি, কিন্তু কাসু রাজি হয়নি নইলে অনেক আগেই বিয়ে দিতাম। তোর ব্যাটা ভেলেণ্টারি করল। তাই বিয়ে করার সময় পেল না এখন এলেমদার ছেলে এলেমদার মেয়ে না পেলে বিয়ে করবে না। শেতলবাড়ির নৈমুদ্দিন শেখের মেয়ের সাথে বিয়ের কথা একরকম পাকা হয়েও বিয়ে হয়নি। নৈমুদ্দিন আর এদেশে নেই, ওপারে চলে গেছে। ক্ষেতখামার যা ছিল তা নাকি বিনিময় করেছে।

এরপর কাসুকে কখনও জিজ্ঞেস করেনি। পরীকেও বলেনি কাসুর বিয়ের কথা। আজ হঠাৎ পরীর কথায় তার টনক নড়ল। সত্যিই তো কাসুর বিয়ে দেওয়া দরকার।

দুপুরবেলায় পাশাপাশি খেতে বসে কাসুকে বলল, আমার তো বয়স বাড়ছে দেশের অবস্থাও রোজ বদল হচ্ছে। এবার তোমাকে সব বুঝে নিতে হবে ব্যাটা আমি তো কবরের দিকে পা বাড়িয়েই আছি।

কাসু মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল, বুঝবার মত কি আছে বাপজান ?

জমিজমা, হাল-বদল, ইজারা।

ও তো, তোমার, আমার বুঝবার কি আছে। যা আমার তা আমি বুঝে নিয়েছি।

আমরা মরলে ওসব তো তোমারই থাকবে।

আইন তাই বলে, যোগ্য ছেলে বাপের দৌলতে চায় কি ? সে নিজে দৌলত পয়দা করে নেয়। তোমার ওসব তুমি দান করে হেবানামা করে যেও।

মানে ?

মানে আমার কিছু দরকার নেই। তোমাদের স্নেহ আর দোয়া নিয়েই জীবন কাটিয়ে যেতে পারব। ওসব ঝামেলা আমি সহ্য করতে পারব না। আমি একা মানুষ, আমার অত দরকার কি ?

চিরকাল তো কেউ একা থাকে না। ঘর সংসার করতে হয় সবাইকে।

সরল ভাবে কথাগুলো আলোচনা করতে করতে শওকতের শেষের কথায় কাম্মু সম্বিত ফিরে পেল। কি যে উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। সুযোগ বুঝে শওকত বলল, তোমার মায়ের ইচ্ছা তোমার বিয়ে দেবার। এবার ঘর সংসার কর। সব কিছু বুঝে নাও। আমরাও শান্তিতে মরতে পারব।

কাম্মু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতেই শওকত গম্ভীর ভাবে বলল, কোন আপত্তি শুনতে চাই না ব্যাটা। দুনিয়াটা তোমার বাবা মা নিয়ে শেষ হয় না। আজকের ছেলে কালকের বাবা পরশুর দাদা-ঠাকুরদাদা। এটাই দুনিয়া সৃষ্টির দিন থেকে সমানে চলে আসছে। বাবা আদম যা খেলাপ করতে পারেনি সেই খেলাপ আমরা করতে পারি কি ?

অসহায়ের মত কাম্মু বলল, বা'জান।

তোমার যা বলার তা বল কিন্তু বুড়ো বাবা-মায়েরও তো একটা ইচ্ছা আছে, সেটা পূরণ করাও তোমার নেক কাজ। তুমি বড় হয়েছে। তোমার কথাও অগ্রাহ্য করতে পারব না। আমার কথা ভাল করে ভেবে দেখ।

এখন আমার এমন ক্ষমতা নেই বিবি বাচ্চা পালন করি।

কথাটা অনায্য নয় কিন্তু ন্যায্য কথা হল এত বয়স পর্যন্ত মোটামুটি লেখাপড়া শিখে তুমি শুধু ভেলেণ্টারি করলে আর লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান জিগীর দিলে অথচ নিজের রুটিরুজির জন্য চেষ্টা করলে না। পাকিস্তান তো হল কিন্তু কাম্মুর স্থান তো হল না সেখানে।

শওকত বিরক্তির সঙ্গে বলল, তোমার বাবা শওকত বেপারি ছোটবেলায় রাখালি করত সরকার বাড়িতে। শুধু মেহনত আর আল্লার নাম ভরসা করে এতটা বয়স কাটিয়ে কিছু জমিজমাও হয়েছে। দুটো পয়সার মুখও দেখেছি। তুমি পারবে না কেন ? ভয় পাবার মত কিছু নেই। আমার পয়সা নিতে না চাও, ভাল কথা, নিজেই নিজের দৌলত কামাই কর। বউ আসবে ভয়ে তুমি সিঁটকে গেলে কেউ তোমাকে মান্য করবে না। বিপদ হবে এই ভয়ে যে পালিয়ে বেড়ায় তাকে তো আর পুরুষ মানুষ বলা যায় না।

কাম্মু ভেবেই পেল না তার বাবা এত কথা কি করে শিখল। তার বাবা যে যুক্তি দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে বলার কিছুই ছিল না। অবশেষে বলল, আমাকে কিছুটা সময় দাও। আমি ভেবে যা করার তা করব। কথাটা মাকে বলব।

বেশ কদিন ভেবেই দেখ। কিন্তু একটা জবাব দিও। জবাবের জবাব যেন আমাকে খুঁজতে না হয়। বুঝলে বাবা।

খাওয়া শেষ করে কাম্মু উঠে গিয়ে রান্নাঘরে পরীর কাছে বসল।

তোর বা'জান কি বলল রে কাস্মু?

তোমার সেই পুরানো কথা। বিয়ে কর।

তুই কি বললি?

বললাম মাকে জিজ্ঞেস করে বলব। আচ্ছা মা, তোমাদের যে বিয়ে হয়েছিল সে বিয়েতে—না থাক।

বল না। আমাদের বিয়েতে কি হয়েছিল জানতে চাস?

না থাক, বলেই কাস্মু বেরিয়ে পড়ল।

বয়স বাড়লে দেহের ক্ষমতা কমে। শওকতও ধীরে ধীরে স্থবির হতে থাকে। আজকাল সে খেয়া জমাতে দেরি করে, ঠিক মনমত লোক না পেয়ে পারঘাটার কাজ কাউকে দিতেও পারছে না।

আজও খেয়ে দেয়ে ঘাটে এসেছে। এমন সময় কাস্মু এসে বলল, আজ থেকে শহরে যাব না বা'জান। তোমার ডিঙি আমার হেপাজতে থাকবে। খেয়া পারাপার আমিই করব।

শওকত অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাস্মুর মনোভাব এভাবে বদলাবে তা ভাবতেও পারিনি।

কি ভাবছ বা'জান? বুড়ো বয়সে তুমি নাও ঠেলবে আমি তোমার জোয়ান ছেলে হয়ে টেরিকেটে শহরে ঘুরে বেড়াব, তাতো ভাল নয়। এতে জাতব্যবসা বজায় থাকবে, তোমাদের খেদমতও করা হবে।

ওঃ। এই কথা। তুমিও তো কিছু কামাই কর। কামাই করার ধরণ তো সবার এক হয় না। কেউ টেরি বাগিয়ে কামাই করে, কেউ নৌকার বৈঠা হাতে নিয়ে কামাই করে তা বলে টেরিকাটার দল বৈঠা ধরে কামাই করতে চায় না, আবার বৈঠা ধরার দল টেরিকেটে বেড়াতে চায় না। এটাই নিয়ম, বেনিয়মও হয়। নিয়মে চলে বলেই দুনিয়ার চাকা ঘুরছে।

কাস্মু বিষন্ন হয়ে ফিরে গেল।

নৌকা যাত্রী বোঝাই হতেই শওকত নৌকা ওপারে নিয়ে চলল। তার মনটা তখন কাস্মুর পেছন ধাওয়া করছিল। কাস্মু যে তার হাতের কাজ নিজের হাতে তুলে নিতে চায় এটা জেনেও তার আনন্দ।

যাত্রী নিয়ে আবার যশাইয়ের ঘাটে এসে শওকত নৌকার গলুইতে চুপ করে বসেছিল এমন সময় ডাক শুনল পাটনি ছেলে।

নতুন কাকি ঘাটে এসে তাকে ডাকবে এটা ছিল অভাবিত। কাঁকনমালাকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

শওকত নতুন কাকির সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি এখানে কেন নতুন কাকি। খবর দিলে আমি-ই যেতাম।

সরকার বাড়ির আঙ্গিনায় সব কথা হয় না। তাই তোমার খোঁজে যশাইয়ের ঘাটে এলাম।

ডিঙিতে উঠে বস কাকি। রোদের বড় তাপ। উঠে এস।

নতুন কাকি নৌকাতে উঠে বসল।

শওকতের সুপ্ত অভিমান কাঁকনমালার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উপে গেল। একটা করুণ আবেদন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আর বাঁচানো গেল না নতুন কাকি। যেদিন তুমি প্রথম এসেছিলে সেদিন থেকে যদি উঠে পড়ে লাগতে তা হলে এতগুলো গ্রাম ফৌত হত না। গ্রামের পর গ্রাম খালি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঘরের মানুষ পর হয়ে যাচ্ছে। আজ বড়ই দেরি হয়ে গেছে। একটা প্রহরে কত ওলট পালট হয়ে যায়। এতো কত বছরের কথা।

এসব রুখবার ক্ষমতা আমার নেই। এটা রাজনীতির খেলা। এটা মেনে নিতেই হবে পাটনী ছেলে। লড়াই গেল, আকাল গেল। ভাই ভাইয়ে কাটাকাটি গেল। দেশ ভাগ হল, এতগুলো পাপের নদী সাঁতরে এখনও যারা বেঁচে আছে তারাই তো শক্ত মানুষ। তাদের পথ দেখাতে হবে। মানুষ যে এখনও জানোয়ার হয়ে যায়নি তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। মানুষের জীবনে দুপাঁচ বছর তো কিছু নয়। মানুষ মরে না, মরি আমরা তোমরা। হাজার হাজার বছর মানুষে লড়াই করে আসছে। তবুও মানুষ শেষ হয়নি। মানুষ রইবে তবে কতটা সভ্য ভদ্র হবে সেটাই ভাববার বিষয়।

শওকত চুপ করে শুনছিল। কাঁকনমালা বোধহয় আরও কিছু বলত কিন্তু বাধা পড়ল ছিচরণের আগমনে।

পেন্নাম হই বউঠান। বলেই শওকতের দিকে তাকিয়ে বলল, চাচা, কলে বড়ই গোলমাল হয়ে গেছে।

গোলমাল কেন রে?

কেউ কাজ করছে না। বলছে ধর্মঘট, কাজ করব না। মাইনে বাড়াও, ঘর দাও, বাড়ি দাও, আরও কত কি দাও, নইলে কাজ করব না।

শওকত বলল চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি হবে।

কাঁকনমালা বলল, কথাটা ঠিক হল না।

ওরা কল বন্ধ করে দেবে। তোদের জমিও গেছে, যা পাচ্ছিলি তাও যাবে। পেটে গামছা বেঁধে থাকবি বুঝি।

কাঁকনমালা হেসে বলল, অত সহজ নয়। কল বন্ধ ওরা রাখবে না। ওটা যে ওদেরও রুটি রুজি জোগায়। তবে ওদের টাকা আছে। কল বন্ধ থাকলেও ওরা মরবে না। কষ্ট পাবে কলের কুলি মজুররা। চোদ্দ পয়সার চিনি ষোল আনায় যারা বিক্রি করে তাদের চারগুণ লাভ। এই লাভটা তুলতে কুলি মজুরদের শোষণ ওরা করবে। ধর্মঘট হলে ওরা সহজে হার মানবে না ঠিক, তবে হার মানতেই হবে। তাতে কুলি মজুরদের কিছুটা সুবিধা হবেই। প্রথম চেষ্টা করবে বাহির থেকে বেশি পয়সা দিয়েও লোক আনিয়ে কাজ করাতে। তাতে হাঙ্গামা হবে।

শওকত কাঁকনমালার যুক্তি মনে মনে মেনে নিতে পারছিল না, অথচ মুখ ফুটে কিছুই বলল না।

কাঁকনমালার কথাই ঠিক। কলওলারা কল বন্ধ করল না পুলিশ মোতায়েন করে

দিল কলের দরজায়। বাহির থেকে মজুর আনতে আরম্ভ করল। হাঙ্গামার আশংকা থাকলেও পুলিসের প্রহরায় বাইরের লোক দিয়ে কল চালু হল কদিন পরেই।

শওকত সবই শুনেছে, দেখছে।

শ্যামসুন্দর এসেছিল অনেক দিন পরে।

সেলাম চাচা, চিনতে পারেন চাচা?

ভাল করে নজর দিয়ে বলল, হাঁ, কোথায় যাচ্ছ বাবা।

আপনার কাছেই এসেছি। কলের খবর শুনেছেন তো?

শওকত মাথা নাড়ল।

মজুররা কাজ বন্ধ করেছে, মালিকরা ভাড়াটে লোক এনেছে, আজ তাই নিয়ে মারপিট হয়ে গেল।

মারপিটের চোট যেন শওকতের বুকে লাগল। করুণ কণ্ঠে বলল, মারপিট না করলেই কি হত না। মিটিয়ে ফেললেই তো হত।

মালিকদের ভাড়াটিয়া লোক আর পুলিশ মিলে গেটে যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের পিটিয়েছে। তাই নয়, ক'জনকে গ্রেপ্তারও করেছে। কিন্তু কে মেটাবে বলতে পারেন চাচা? চিনির দাম বেড়েছে চারগুণ, আর মজুরি বেড়েছে তের আনা থেকে পাঁচ সিকে। এও সহ্য করবে মজুররা? যদি জিনিসপত্তর মাগ্গী না হত তা হলে মানিয়ে নেওয়া যেত। দিনরাত বারঘণ্টা কাজ করে যদি পেটপুরে খেতে না পায় তা হলে মানুষ ঠিক থাকতে পারে কি!

তা তো বুঝলাম। পুলিশের হাঙ্গামা কে মেটাবে?

হাঙ্গামা। হাঁ, হাঙ্গামা না থাকলে জীবনের কোন দামই থাকে না চাচা। অশান্তির আগুন অশান্তি দিয়েই নেভাতে হয়। শান্তির বুকে যারা অশান্তি কায়েম রেখে পকেট ভারি করে তাদের সঙ্গে হাঙ্গামা করলে ভবিষ্যতের মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচবে চাচা। সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

শ্যামসুন্দরের কথাগুলো শওকত ঠিক মত মেনে নিতে পারে না। তবে সে বুঝল, তাদের শান্তির কেন্দ্র গ্রামের বুকেও কলের ধোঁয়ার সাথে সাথে অশান্তির ধোঁয়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আগে সমাজ ছিল। সমাজে সহজ সরল মানুষ ছিল কল দানব আজ সমাজকে গ্রাস করেছে, গ্রাস করেছে সহজ সরল মানুষদের শান্ত জীবন যাত্রাকে। এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে মুক্তি সম্ভব কিনা। এর মীমাংসা কোনদিন হবে কিনা, এই সমস্যার কবে সমাধান হবে তা কে জানে। নতুন কাকি বলেছে একে মেনে নিতে হবে। আর কোন পথ নেই।

শ্যামসুন্দর উঠে চলে গেলে শওকত সরকার বাড়ির আঙ্গিনায় এসে বসল।

খবর গেল কাঁকনমালার কাছে। কাঁকনমালা আসতেই শওকত বলল, শুনেছ নতুন কাকি কলে মারপিট হয়ে গেছে, পুলিশ নেমেছে।

কাঁকনমালা বলল, এইটেই স্বাভাবিক। যারা জমি দিল কল গড়ে তুলল, তাদের বুকের রক্ত শুষে মালিকরা টাকার পাহাড় রচনা করেছে, তাদের বাদ দিয়ে বাহির

থেকে লোক আনলেই এই সব দুর্ঘটনা ঘটে। আগামী দিনেও ঘটবে। শুধু এদেশেই নয় পৃথিবীর সব দেশেই বণিকদের স্বার্থ এভাবে রক্ষা করে থাকে দেশের প্রশাসন। আপশোষ করে লাভ নেই পাটনী ছেলে নিশ্চয়ই মনে আছে সবাইকে ডেকে এনে বলেছিলাম জমি বিক্রি কর না। কজন শুনল? লোভের বশবর্তী হয়ে ওরা যা করেছে তারই বিষ ওদের খেতে হচ্ছে। এসব বলেও লাভ নেই। এখন দেখতে হবে ওদের কি করে বাঁচানো যায়।

তাই তো ভাবছি নতুন কাকি। সেইজন্যই তো এসেছি তোমার পরামর্শ নিতে।

শওকতের কথা শেষ হতে না হতেই বাহির থেকে জসিম ডাকল, চাচা।

ভেতরে আয় জসিম।

ভেতরে এসেই বলল, সর্বনাশ হয়েছে চাচা। কলের ধারে ময়নাডাঙ্গার সেই ডাঙ্গা জমিটা যেটা তুমি কলওলাদের বিক্রি করনি সেই জমি বেদখল হয়ে গেছে। সকালবেলায় মাঠে গিয়ে দেখি দু-তিনশো লোক বাঁশ দিয়ে রাতারাতি কয়েক গণ্ডা ছাপড়া তুলেছে তোমার জমিতে। আমি মানা করতেই ওরা তেড়ে এল। হায় আল্লা, এদেশে আর বাস করা যাবে না চাচা।

বিরক্তির সঙ্গে শওকত বলল ওরা কি বলল?

ওরা বলল, আমাদের ভিটেমাটি গেছে, তোদের জাতভাই আমাদের ফকির করেছে। তোদের ভিটে মাটি আমরা চাই। তোরা তোদের দেশে যা। এদেশ তোদের নয়।

বললি না কেন, এটাই আমাদের দেশ।

বলেছিলাম চাচা, ওরা বলল তোরা পাকিস্তানী, যা তোদের দেশে।

শওকত হেসে বলল, আমাদের তর্কসাহেব বলেছিল, পাক মানে পবিত্র। পাকিস্তান হল পবিত্রস্থান। যে দেশে মানুষ জন্মায়, বড় হয়, যে দেশের মাটিতে হামাগুড়ি দেয়, যে দেশের মাটিতে মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যে দেশের মাটিতে বাবা দাদার এন্তেকাল হয় সেই দেশই পবিত্র দেশ পাকিস্তান। তাদের বললি না কেন, আমরা যাব না, এটাই আমাদের পাকিস্তান। ভয় পেয়েছিস জসিম। বাংলার মাটি, জল, আলো, বাতাস সব আমাদের কাছে পবিত্র. যারা দেশভাগ করেছে তারা দেশকে কোনদিন ভালবাসেনি। আবার যা ওদের কাছে, বলবি তোমাদের ঘরবাড়ি নেই, আমরা তোমাদের মাটি দেব। তোমরা মেহমান আমরা তোমাদের খেদমত করব তবে জুলুম জবরদস্তি করে দাঙ্গা হাঙ্গামা কর না। যার আছে সে দেবে বই কি। আমাদের শরিয়তী বিধান।

কাঁকনমালা শওকতের শেষের কথাগুলো ভাল করে লক্ষ্য করে বলল, অতিথিদের জন্যই বুঝি তুমি এদেশ কামড়ে পড়ে আছ?

এদেশ সেদেশ জানি না নতুন কাকি, যশাইয়ের মাটি ছেড়ে এক পা-ও যাব না। যতদিন যশাই ততদিন বশটা গাঁয়ের মঙ্গল, যশাই যেদিন দেশছাড়া হবে সেদিন আমরাও দেশ ছাড়ব। তার আগে নয়। ওরা এসেছে হিংসুটে জানোয়ারদের তাড়নায়, তাই ওরা হিতাহিত ভুলে গেছে। ওরা যেদিন বুঝবে গরীবদের পাকিস্তান তার মাটি, সে মাটির মাপও সাড়ে তিন হাত, সেদিন ওই সব হিংসুটে জানোয়াররা নিজেদের মধ্যে

লড়াই করে মরবে, সেদিনের খুব বেশি দেরি নেই। জাতের দোহাই দিয়ে জমির মাপ হয় না, যারা স্বার্থপর বেওকুফ তারাই জাত দিয়ে দেশ ঠিক করে।

কাঁকনমালা হাসল।

হাসছ কাকি। আমার কথা বুঝি তামাসার কথা?

না পার্টান ছেলে। আগে মনে করতাম আমরা লেখাপড়া শিখেছি, আমরা অন্যের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উঁচুতে থাকি, আজ বুঝলাম ওটা ভুল ধারণা। তুমি জানতে এসেছিলে কি করে এদের বাঁচানো যায়, আজ ভাবছি আমার চেয়ে তুমি সে পথটা ভাল করে চিনতে পেরেছ। তোমার কাছেই আমার শিখবার আছে।

শওকত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বলল, না কাকি তা নয়, বয়স বাড়লে অনেক দেখেশুনে মানুষ শেখে, সেই শিক্ষাটা পেয়েছি।

তাই তো বলছি, পৃথিবীর কাছ থেকে যারা শেখে তাদের শিক্ষা বই-কেতাবী শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি দামী।

জসিমের দিকে তাকিয়ে বলল, যা জসিম, ওদের বলে আয় তোমাদের জবরদখল নিতে হবে না, আমি ওদের আপনা থেকেই জমি দেব।

জসিম ইতস্তত করে বলল, আমি যেতে পারব না চাচা। ওখানে যদি আমাকে খুন করে লাশ পুঁতে গুম করে দেয় তাহলে কেউ কিছু করতে পারবে না চাচা।

তোমাকে যেতে হবে না জসিম আমি-ই যাব, বলে কাঁকনমালা শওকতের দিকে চেয়ে বলল, জমি তুমি দেবে দাও, কিন্তু ওরা জবরদস্তি করে মুসলমানের জমি নেবে, তা হতে দেব না। আমাদের এটা হিন্দু-মুসলমানের গ্রাম। আমরা হিন্দুরা বাধা দেব। শওকত বেপারি দেশ ভাগ করেনি যারা দেশ ভাগ করেছে তাদের কাছে গিয়ে ওরা বোঝাপড়া করুক। তাদের কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করুক।

শওকত বাধা দিয়ে বলল, আল্লার মাল, ওদের ওপর রাগ করতে হয় না কাকি।

আল্লা বুঝি জুলুমবাজি করতে বলেছে?

শওকত ক্ষুন্নভাবে বলল, আল্লার কথা ক'জন শোনে কাকি? আল্লা আমার, তোমার, জসিমের, ছিচরণের-সবাইয়ের, কিন্তু যাদের পয়সা আছে তারা মনে করে আল্লা যেন তাদের। আল্লা যেন ঘরের বিবি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখবে। ওদের ওপর আল্লার গজব পড়বে। আমরা জন্মেছি শুধু আল্লার হুকুম শুনতে, ওদের হুকুম শুনতে নয়। আমরা জন্মেছি আল্লার ইচ্ছাপূরণ করতে ওরা জন্মেছে আল্লার নামে দুনিয়াকে ভোগ করতে। তাই আমরা গরীবরা মনে করি, আল্লা আমাদের নয়। আল্লা পয়সওলা লোকের তালুকে স্থায়ীভাবে বন্দী। ওদের কাছে গিয়ে কাজ নেই। আমিই ফয়শালা করব।

তোমার কথা মানতে পারছি না পার্টান ছেলে। আমি যাবই, তুমি মানা করলেও যাব। যারা অন্যায় করল তারা শাস্তি পাবে না, শাস্তি পাবে যারা অন্যায়কে ভয় করে। ঈশ্বরের দরবারে এর বিচারের অপেক্ষা না করে মানুষের দরবারে এর বিচার হওয়াই প্রয়োজন। আমি প্রতিবাদ করব, তোমরা আমার সঙ্গে থাকলে প্রতিরোধ করব। আমি যাবই।

সেটা তোমার ইচ্ছা তবে সুফল কিছু হবে না কাকি।

শওকতের কথার কোন জবাব না দিলেও পরেরদিন সকালবেলায় ছিচরণ আর ...লাকে সঙ্গে করে ময়নাডাঙ্গার মাঠে উপস্থিত হল কাঁকনমালা। দেড় মাইল পথ ...রিয়ে ময়নাডাঙ্গায় পেঁাছে দেখল সেখানে বাঁশ, দর্মা খড়ের গাদা লেগে গেছে। ...তে গেলে বাজার বসে গেছে।

অনেক কষ্টে তাদের মুরুব্বিদের দুচারজনকে খুঁজে বার করল। ধীরে ধীরে ভিড় ...ল চার পাশে।

কাঁকনমালার মাথায় সিঁদুর দেখে ওরাও বুঝল জমিটা বোধহয় মুসলমানের নয়। ...তে কি, তাদের জমি চাই, জবরদখল যারা করে তারা জাতধর্মের তোয়াক্কা করে ...। তবুও তারা মনে করল, এভাবে দখল করলে তা রাখা যাবে না।

কাঁকনমালা প্রশ্ন করল, এ জমিতে আপনারা ঘর তুলছেন কোন অধিকারে?

সামান্য প্রশ্ন। উত্তরটাও সহজ। কিন্তু কাঁকনমালার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে ...ধহয় মুরুব্বিরা ঘাবড়ে গিয়েছিল।

কাঁকনমালার তীক্ষ্ণ অথচ সহানুভূতিপূর্ণ যুক্তির কাছে ওরা হার মানল।

জবরদখলকারিরা স্বীকার করল বাস্তুজমি বন্দোবস্ত নিতে অথবা খরিদ করতে। ...তে ওদেরই লাভ। ভবিষ্যতে কোন হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকে না। নিশ্চিন্তে বউ ...লেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারবে ওরা।

জবরদখলকারিদের সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে কাঁকনমালা ফিরে এল। বিরাট ...ধ জয়েব আনন্দে সে উৎফুল্ল। শওকতের কাছে সংবাদ পেঁাছতে দেরি হল না।

শওকত এসে কাঁকনমালাকে বলল, কাকি তুমি তো সবই করলে কিন্তু আমাদের ...নর ভয় কাটেনি। এক দেশে ঘরের চালে চাল দিয়ে বাস করতে হলে শান্তি বজায় ...কবে কি!

শান্তি আসবে পার্টনি ছেলে তবে দেরিতে। শান্তি আপনা থেকে আসে না ...র্টনি ছেলে, শান্তি আনতে হয়। তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। বড় ...কত যুদ্ধ হয়েছে, তারপর উভয় পক্ষ যখন ক্লান্ত হয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘটায় তখন ...রম্ভ হয় লাভ লোকসানের খতিয়ান তৈরি। তখন আসে শান্তি। উভয় পক্ষই ...জেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য আপশোষ করে।

শওকত এসব বিষয় নিয়ে কোন দিন ভাবনাচিন্তা করেনি। গাঁয়ের পর গাঁ খালি ...র যখন অনেক লোক চলে গেল তখনও শওকত তার অনুগামীদের নিয়ে নিশ্চিন্তে ...ল, এবার কিন্তু সে চিন্তিত। এতদিন বাঘের ডাক শুনেছে। এবার বাঘ দোরগোড়ায়।

সন্ধ্যাবেলায় এল শ্যামসুন্দর।

তার চেহারা দেখে শওকত উদ্বিগ্নভাবে বলল, একি তোমার মুখ শুকনো, উসকো ...কো চুল। কি ব্যাপার। কল নিয়ে বড়ই ব্যস্ত। আসার ফুরসত মেলে না বুঝি।

পরীকে ডেকে বলল, শ্যামসুন্দরের কিছু খাবার ব্যবস্থা কর পরী।

খাওয়া পরে হবে চাচা। বলতে এসেছি কাসুর কথা, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে ...ছ।

শওকত স্তম্ভিতভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তার অপরাধ কলের গেটে মজুরদের কাজ করতে মানা করছিল।

শওকত চমকে উঠল। শ্যামসুন্দরের কথাটা বারবার তার কানে এসে ধাক্কা দিচ্ছিল, ভাবছিল, নতুন কাকির কথাই সত্যি। শান্তিকে আনতে হয় ত্যাগ স্বীকার করে। বৃদ্ধের সবল মনের ওপর কাস্মুর গ্রেপ্তারী সংবাদ যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাকে দমন করে বলে উঠল, জামানত হয়নি।

সেজন্যই তো এসেছি।

শ্যামসুন্দরকে খেতে দিয়ে পরী চলে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বলল, শুনেছিস তোর কাস্মুর কথা।

কথাটা এমনভাবে বলল, যেন কিছুই হয়নি। পরী ফিরে দাঁড়াল।

শওকত আবার বলল, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

পরী চিৎকার করে উঠল। তার হাত থেকে কাঁসার সানকি খনখন শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে খুঁটিটা চেপে ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল

কাঁদিস না পরী, আগে সব কথা শুনে নে তারপর কাঁদিস। শুনলে বুঝবি কাস্মু কোন ছোট কাজ করেনি। সব শুনলে তোরও রক্ত গরম হয়ে উঠবে। কাস্মুর বাপ যে কাজ করতে পারেনি, সেই কাজ তোর ছেলে করেছে অবোধ মজুরদের স্বার্থরক্ষা করতে, তাদের বাঁচাতে। ফল কিন্তু একই, একজনের বুকের ভেতর পুড়ে যাচ্ছে আরেকজন পুলিশের হাজতে বিনা অপরাধে বাস করছে।

হো-হো করে হেসে উঠল শওকত।

শ্যামসুন্দর ডাকল, চাচা।

না, কিছু হয়নি বাপ। শওকত বেপারির কলিজা অত নরম নয়। তবে ভয় পেয়েছিলাম সেই দিন যেদিন আল্লার নাম নিয়ে আমার কাস্মু মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে উসকে দিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে আল্লার আসল হুকুম সে শুনতে পেয়েছে মানুষের প্রতি তার দরদ জেগেছে, আর ভয় পাই না পরী। মানুষের দুখদরদকে যে নিজের মনে করতে পারে সেই তো আল্লার আসল বান্দা। কাস্মু তো এই পথে পা দিয়েছে।

শওকতের মত মনের জোর নেই পরীর। সারারাত সে কেঁদেছিল কিন্তু তার মুখের শব্দ শওকত শুনতে পায়নি। কান্নার শব্দে যদি শওকতের ঘুম ভেঙে যায় তা হলে শওকতও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

বিহানের মুর্গি ডাকতেই শওকত বেরিয়ে পড়ল। সারারাত্রি জাগরণের পর পরী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। পরীর ঘুম ভাঙাতে কেমন মায়া বোধ করল।

পরী ঘুম থেকে উঠে শওকতকে না দেখে চিন্তিত হল। দুবার সরকার বাড়ি গিয়ে খবর করে এল। কেউ বলতে পারল না শওকত কোথায় গেছে। পরী দুবার মশাইয়ের ঘাটে গিয়েও ফিরে এল। সেখানেও শওকত যায়নি। সারাদিনে জল মুখে দেবার সময়ও পায়নি। সারাদিনে রান্না করার মত মন তার ছিল না। এ-পাড়া

ও-পাড়া ঘুরে বিকেলবেলায় কোনরকমে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেল।

এ কি কাণ্ড! শওকত উনুন ধরিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করছে আর কাম্মু ধুচুনিতে চাল ধুচ্ছে।

শওকত এক গাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, কোথায় গিয়েছিলি পরী?

তোর পাত্তা করতে। সারাদিন না বলে কোথায় যাস! বলেই পরী আঁচল তুলে মুখ ঢাকল।

তোর ছেলের পাত্তা করতে, বুঝলি, এবার ছেলে তো ফিরে পেলি। ঘুমোচ্ছিলি তাই ডাকিনি, আসল কাজটা করতে শহরে গিয়েছিলাম।

তখনও পরী আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকেই ছিল।

শওকত উঠে এসে পরীর মুখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিল।

ষোল

জবরদখলকারিদের সমস্যা মিটিয়ে শওকত কিছুটা হালকা বোধ করেছিল।

কলের গোলমালও শেষ হয়েছে। মালিকরা মজুরদের আংশিক দাবী স্বীকার করে সাময়িক ভাবে সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছে। কাম্মুও ছাড়া পেয়েছে।

শওকত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার খেয়াঘাটে গিয়ে বসছে। কাম্মুও বাপকে সাহায্য করতে মাঝে মাঝে খেয়া পারাপার করছে। শওকত আপত্তি করলেও তা শুনতে চাইছে না।

কাঁকনমালা এবার কয়েক মাস গ্রামে বাস করেছে। ফেরার দিন এগিয়ে আসতেই শওকতকে ডেকে তার পরিকল্পনাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে সেও নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেছে তার কর্মস্থলে।

সবাই ধীরে ধীরে নিজের নিজের কাজে চলে গেলে শওকত বড়ই নিসঙ্গ বোধ করত। বয়স বাড়ছে, দেহটা অশক্ত হচ্ছে, মনটাও কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে, মন ও দেহ দুটোই ক্লান্ত।

খেয়া পারাপার ছাড়তে বললে সে হেসে ওঠে। এতদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করলে সে আর বাঁচবে না। পারঘাটার সঙ্গে তার জীবনধারা এমনভাবে জড়িত যে শওকতকে মনে হলেই পারঘাটার কথা মনে হয়। শওকতকে বাদ দিয়ে পারঘাটা কেউ ভাবতেও পারে না।

সকালবেলা হলেই যশাইয়ের ঘাটে যাবার জন্য মন ছটফট করে। পরী বাধা দেয় কাম্মুকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে পাঠায় ফেরীর কাজে। তবু বেলা পড়লে একবার ঘাটে না গিয়ে পারে না। দু'একটা খেপ না দিলে সে হাঁপিয়ে ওঠে।

কাম্মুর তাড়নায় নৌকা থেকে নেমে সোঁতার ভাটিতে একটা ছিপ নিয়ে বসে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে সরকার বাড়ির আঙ্গিনায় গ্রামের আরও দশজনের সঙ্গে বসে গপ্পগুজব করে একপ্রহর রাত পেরিয়ে বাড়িতে আসে।

পরীও আজকাল নড়াচড়া করতে পারে না। কোমরের ব্যথায় মাঝে মাঝেই

বিছানা থেকে উঠতে পারে না।

পরী অসুস্থ হলে শওকত কাজ পায়। ঘাটে না গেলেও বাড়ির কাজ বেশ আয়েসে সঙ্গে করে। কখনও বাসন মাজে, কখনও রান্না করে, কখনও ধান ঝাড়াই করে, পরী সেবাও করে মনপ্রাণে।

পরী অনুযোগ করে, আমি তো অকম্মা হয়ে গেছি, এইভাবে মেহনত করলে তুই নড়তে পারবি না, তখন কি হবে।

পরীর কথা শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, আল্লা আছে।

কাম্মুর বিয়ে দিলে ঘর সংসার রক্ষা হয় কিন্তু ছেলে তো কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। আর যে বউ আসবে সে যে মনের মত হবে এমন ভরসা কোথায়। বউ এলে কাম্মুর অনেক কিছুর দরকার হবে। খেয়াঘাটে আর বসবে না, বউ নিয়ে হয়ত শহরে চলে যাবে। তখন তারা যেমন নিঃসঙ্গ আছে তেমনি থাকতে হবে।

এখন কাম্মুকে বললে সে বলে, আমি মানুষের খেদমত করছি মা, এখন বিয়ে করে সংসারে জড়াতে চাই না।

জানিস কাম্মু, আমাদের হাদিসের হুকুম জোয়ান ছেলেমেয়ে বিয়ে করবে।

শওকত রাতের বেলায় কবিরাজী মালিশ গরম করে পরীর কোমরে মালিশ করে আর বলে, আমি এখনও শক্ত সমর্থ আছি রে। কে মরবে তা কে বলতে পারে।

তোকে যদি আমার মত বাতে পঙ্গু করে।

যখন হবে তখন ভাবব। এখনও তো হয়নি।

পরী বুঝল শওকত স্বেচ্ছায় কাম্মু সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে চায় না।

হঠাৎ শওকত বলল, জানিস পরী আমাদের ময়নাডাঙ্গার রিফুরা বলছে, চাচা এবার তোমাকে পিসিডেন করে দিতে চাই। পঞ্চায়েতের ভোট হবে তাতে আমার নাম দিতে চায়।

পরী জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই ওসব কামে যাস না মিঞা। তুই বুড়ো হয়েছিস, আবার কোন্ হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বি। কাম্মুর নামটা দিয়ে দে লড়তে পারবে, জোয়ান ছেলে, দেশের কাজে মনও আছে।

আমিও তাই বলেছি। মানুষের লোভ বেশি। আমিও মানুষ। লোভ বাড়লে কোন কুকাজে ফেঁসেও যেতে পারি। কি বলিস। আমি গররাজি।

তুই কি আমার চেয়ে কম বুঝিস।

একটা কাজ করলে কেমন হয়। চল আমরা দুজন হজ করে আসি।

কাজটা তো ভাল। অত টাকা কোথায় পাবি।

তাই তো। একা একা ভাল লাগে না পরী। তোকে গাঁটে বেঁধে সংসার করতে বসেছিলাম। কত ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে, রয়ে গেছে এই শুকনো দেহটা আর আছিস তুই আমার পাশে।

পরী কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যাই রসুই শেষ করে আসি। কাম্মুর আসতে দেরি হবে। ঘরে এসে দুটো গরম ভাত তো পাবে।

শওকত উঠোনে পা দিতেই মোহনের সাথে দেখা।

শওকত কিছু বলার আগেই মোহন বলল, জমিন জরীপ হচ্ছে চাচা। সরকার আমিন পাঠিয়েছে। নতুন সড়ক হবে। সোঁতার ওপর সাঁকো হবে। রাস্তা যাবে তেবাড়িয়া পর্যন্ত। শুনলাম, শহর থেকে বাস চলবে।

ভালই তো। রাস্তাঘাটের অভাবে চলাচলের কষ্ট, তার ওপর যদি মোটর বাস চলে তাহলে লোকের কষ্ট কম হবে। সরকার যদি রাস্তা করেই দেয় এতো ভাল কথা।

না চাচা ভাল হয়নি। জরীপের মাপে আমার ভিটে পড়েছে।

তোর ভিটে? বললি না কেন গাঁয়ের বাইরে দিয়ে রাস্তা হোক।

বলেছিলাম। আমিন বলল সরকারী হুকুম।

সরকারী হুকুম, চল দেখি কোথায় জরীপ হচ্ছে।

শওকত মোহনের সাথে বেরিয়ে পড়ল। আমিন তখন যশাইয়ের ঘাটে খুঁটো মেরে চেন টানছে। শওকত জিজ্ঞেস করল, কি হবে কত্তা?

আমিন মুখ তুলে দেখবার অবসর পেল না। অবহেলার সঙ্গে বলল, রাস্তা।

কিন্তু এদিক দিয়ে রাস্তা করলে আমাদের অসুবিধা হবে কত্তা।

সেটা সরকারকে বলবে।

সরকার তো আপনি কত্তা। যে দিক দিয়ে চেন টানিয়েছেন সেদিক দিয়ে রাস্তা হবে না।

আমিন বিরক্তির সঙ্গে বলল, রাস্তা তোমার ইচ্ছায় হবে না মিঞা। আমার ম্যাপে যেমন নির্দেশ আছে সেই ভাবে রাস্তা হবে।

কিন্তু ঘাটের পাশে ওই যে ঝোপ ওটা যশাইতলা। আপনার চেনের মাপে যশাইতলাও পড়ছে। ওটা হিন্দু-মুসলমানের পবিত্র জায়গা। ওটা পীঠস্থান—আমাদের দরগা। ওর ওপর দিয়ে রাস্তা হবে না। আপনি চেন ঘুরিয়ে নিন।

আমিনের ভ্রূটা একবার বেঁকে আবার সোজা হল।

ও কথা শহরে গিয়ে হাকিমের কাছে বল মিঞা। আমরা সরকারের হুকুমের চাকর। রাস্তা সোজা যাবে তেবাড়িয়া। রাস্তা করতে অনেকের ঘরবাড়ি জমিজমা দখল করতেই হবে। আমার কাজ হল চেন টেনে ম্যাপ তৈরি। মাটি ফেলা আমার কাজ নয়।

আপনি একবার মেপে নিয়ে ম্যাপ করলে তা রদ করা কঠিন হবে কত্তা। আপনি আমাদের আপত্তিটা শুনেই পয়লাই যদি মিটিয়ে দেন কত্তা তাহলে যশাইও বাঁচবে, গাঁয়ের লোকেরাও খুশি হবে। দুশ বছরের পীঠস্থান দরগা।

তোমার কথা মনে থাকবে মিঞা। দেখি কি করতে পারি।

আমিন কিছুই মনে রাখল না, কিছুই দেখল না, কিছুই করল না। বড়কর্তার কাছে শুনল রাস্তার ম্যাপ হয়ে গেছে, যশাইয়ের গাছের ওপর দিয়েই রাস্তা যাবে। সরকারও অনুমোদন করেছে।

শওকত গ্রামশুদ্ধ লোককে হাজির করল সরকার বাড়ির বৈঠকখানায়। সবাই মিলে শলাপরামর্শ করে দরখাস্ত লেখা হল, গ্রামশুদ্ধ লোকের সহি আর টিপসহি নিয়ে

দরখাস্ত জমা দিল মহকুমা অফিসে।

মহকুমা হাকিম দরখাস্ত কোথায় পাঠাল কেউ জানে না।

সবাই বলল, তা হলে কি হবে চাচা।

তোরা আমার সঙ্গে যাবি জেলার হাকিমের কাছে। দেখি হুজুর কি করে।

হাকিমের নাম শুনে অনেকেই ভয় পেল। পুলিশ আর হাকিমকে গাঁয়ের মানুষ মোটেই বিশ্বাস করে না। থানায় দারোগার সামনে যেতেই ওরা ভয় পায়। এতো জেলার হাকিম। হয়ত তাদের হাজতেই বন্ধ করে দেবে।

শওকত বলল, তা হলে তোরা যাবি তো?

তুমি গেলে আমরাও যাব।

পরদিন সকালে দল বেঁধে তারা চলল জেলা শহরে। বড়কর্তা তাদের জন্য জেলা শহরে অপেক্ষা করছিল।

সারাদিন হাকিমের অফিসের সামনে বসে থাকার পর বিকেলবেলায় শওকত আর বড়কর্তাকে ডেকে নিল হাকিম।

অনেক যুক্তি দিয়ে অনেক ভাবে হাকিমকে বুঝিয়ে বলেও হাকিমকে রাজি করাতে পারল না। হাকিমের যুক্তি হল ওখানে যখন কোন মন্দির অথবা মসজিদ নেই তখন ওখান দিয়েই রাস্তা যাবে। কোন্ এক গাছতলায় কে কবে সিন্নি দিল, মাটির ঘোড়া সাজালো তাতে সেটা পীঠস্থান হয় না, দরগাও হয় না। তবুও বলল দরখাস্ত দিতে বিবেচনার জন্য।

বড়কর্তা বলল, ওই গাছতলায় পুজো হয় বছর বছর। হিন্দু-মুসলমান সবাই ওই গাছের ঝোপকে পীঠস্থান বলে মানে।

গাছতলায় পুজো দিলেই তো গাছ ভগবান হয় না। ওরকম গাছ পুজো আমাদের দেশে অনেক হয়। সে সব গাছকে বাদ দিয়ে কাজ করতে হলে কোন উন্নয়ন-মূলক কাজই করা যাবে না।

জেলার হাকিমকে বুঝাতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরতে হল। ফেরবার আগে শওকত শেষ চেষ্টা করেছিল কিন্তু হাকিম সোজাসুজি বলে দিল, রাস্তার ম্যাপ বদল করলে অনেক কিছু বদল করতে হবে, এক মাইল বেশি রাস্তা তৈরি করতে হবে, তাতে সরকারের কয়েক লাখ টাকা লোকসান হবে। শওকত হাত জোড় করে বলেছিল, হুজুর টাকা বড় না মানুষ বড়। আইন মানুষের জন্য। মানুষ আইনের জন্য নয়। মানুষের বুকে দরদ বাড়িয়ে কোন উন্নতি হয় না হুজুর। আবার এ বিষয়ে ভেবে আমাদের বিশ্বাস অটুট রাখুন।

গ্রামের একটা চাষীর মুখে নীতিবাক্য শুনতে হাকিমরা অভ্যস্ত নয়। হাকিমের ধৈর্যচ্যুতি হবার উপক্রম, হতেই অতি শান্তভাবে তাদের চলে যেতে বলল। হাকিম কোন যুক্তিই শুনতে রাজি হল না। অগত্যা বড়কর্তার হাত ধরে বৃদ্ধ শওকত বেপারিকে ফিরে আসতে হল।

বাইরে এসে বড়কর্তা বলল, ভয় পাসনে শওকত! আমি তো রইলাম, দেখি কোন উপায় করা যায় কিনা! সরকারের কাজ। আরও দু'বছর দেরি।

দু'বছর পরেও তো হবে।

অতদিন বেঁচেবর্তে যদি থাকি তা হলে যশাইয়ের অপমান নিজেদের চোখে দেখতে হবে। মরে যদি যাই তা হলে তো কথাই নাই।

বড়কর্তা যাই বলুক শওকত নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কিছু করার ক্ষমতাও তার ছিল না। কলের ভোজপুরীর হাতভাঙ্গা যত সহজ সরকারের নীতি ভেঙ্গে দেওয়া তত সহজ নয়। সরকার তো মানুষ নয়, যন্ত্র। চিনির কলে আখ পেষাই করে ছিবড়ে বের করে। সরকারী কলেও তেমনি আইনের দোহাই দিয়ে মানুষের বিশ্বাস, ভালবাসা, মমতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে।

তারই চোখের সামনে যশাইয়ের গাছ কেটে ফেলবে তা সে সহ্য করতে পারবে না, এর চেয়ে মৃত্যু তার কাছে বেশি কাম্য।

কাম্মুকে বলল, শ্যামকে ডেকে আনতে পারিস।

সে তো শহরে থাকে, দরকার হলে তাকে ডেকে আনব।

শ্যামের সঙ্গে পরামর্শ করব যশাইকে যাতে বাঁচান যায়।

শ্যামসুন্দরকে ডেকে অনেক পরামর্শ করেও সমাধান কিছু হল না।

যশাইয়ের গাছ বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিল, আধুনিকতার ছোঁয়ায় যশাইও নতুন সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়েই ছিল। যশাই বোধহয় জানতে পারেনি তার বুকের ওপর দিয়ে যন্ত্রসভ্যতার রোলার গড়গড় করে ছুটবে।

শওকত বাড়ি এসে অবধি ঝিমিয়ে পড়েছে।

পরীর কোমরের ব্যথা কমেছে, আজকাল কিছুটা কাজকর্ম করতে পারে। ঘরের কাজ কম, তাই শওকত গাঁয়ের মানুষের দোরে দোরে ঘোরে প্রতিকারের পথ খুঁজতে।

শ্যামসুন্দর বলেছিল, একা কিছু করা যায় না চাচা। যা করবে সবাই মিলে করবে। জান তো দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

ঠিকই তো।

সবার আগে জসিম এসে বলল, আমরা যশাইয়ের গাছ কাটতে দেব না চাচা। গাছের গায়ে কুড়ুলের কোপ দেবার আগে আমাদের গায়ে কোপ দিতে হবে। আমাদের রক্তেই যশাইয়ের মাটি লাল হবে।

তবুও গাছ রাখা যাবে না রে জসিম। এ দেশে বিচার নাই। দুশো বছর ধরে মানুষ যাকে ভালবেসেছে সরকারী একটা কলমের খোঁচায় সেই ভালবাসা নস্যাৎ হয়ে যাবে, এতো ভাবতেও পারছি না। তোরা ওদিক দিয়ে হাঁটিস না। বড় যন্ত্রণা হবে।

জসিম ছিচরণের দল শওকতের যুক্তি মেনে নিতে রাজি নয়। তারা যশাইয়ের গায়ে কাউকে হাত দিতে দেবে না।

ছ'মাসের মধ্যে সেঁতোর উপর লোহার সাঁকো তৈরি হল। শওকতের পারঘাটের ইজারাদারি শেষ হল। ঠিকাদারের মজুররা মাটি কাটা আরম্ভ করল। গ্রামের লোক বিনা প্রতিবাদে সব কিছু দেখছিল।

ইজারাদারি থেকে মুক্তি পেয়ে শওকত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। একটা

বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে অনবদ্য আনন্দ লাভ করলেও যশাইগাছকে রক্ষা করার চিন্তা সে অস্থির হতে থাকে।

জীবনের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় কর্মযোগীর প্রসন্নতায় সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। পেছনে রেখে আসা ষাট বছরের গ্লানি ও অভিজ্ঞতা তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিল তরুণের উৎসাহ নিয়ে শওকত ছুটতে থাকে দুয়ারে দুয়ারে যশাইয়ের মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে। আবেদন নিবেদন নিয়ে সবাইকে একমতে আনার চেষ্টা করতে থাকে অহোরাত্র।

বৃদ্ধের আবেদনে সাড়া দিল অনেকেই। সবাই যেন তেজিয়ান, সমস্যা মেটাবার শান্তিপূর্ণ কোন পথ নেই স্থির করে যারা নবীন তারা প্রতিরোধের পথকে বেছে নিতে চাইল। সবারই চোখে আতঙ্ক আর সরকারের নীতির প্রতি ঘৃণা। সবাই যেন দেখতে পেল যশাইয়ের মূল উৎপাটন করে সরকারী জুলুমবাজির নিদর্শন পাকা সড়ক যশাইয়ের বুকের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। সেই সড়কের ধুলোয় মিশে যাচ্ছে যশাইয়ের মহিমা।

তরুণের দল বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। শওকত জানে বুকের রক্ত দিয়ে সরকারী রাস্তা নির্মাণ বন্ধ করা যাবে না। বাধা দিতে গিয়ে রক্তদান বৃথা কিন্তু কি যে উপায় তা স্থির করা গেল না কোন ক্রমেই।

শওকতের রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে। পরী জেগে বসে সারারাত পাখার বাতাস দেয় শওকতকে ঘুম পাড়াতে। প্রবোধ দেয় তবুও ঝিমিয়ে পড়ে শওকত। চিৎকার করে ওঠে, জয় যশাইয়ের জয়।

দিন এগিয়ে এল। আবেদন নিবেদন সব শেষ।

এবার যশাইয়ের ঘাটে শুয়ে শুয়ে লোক এসে বাধা দিল। সকালবেলায় কুড়ুলের ঘা পড়তেই দশখানা গাঁয়ের মানুষ জড় হল। সেদিন ঠিকাদারদের জনমজুরের সংখ্যা কম থাকায় তারা ফিরে গেল।

শওকত জানে এরপরই বলপ্রয়োগ করবে সরকার।

পরদিন এক দঙ্গল পুলিশ নিয়ে হাজির হল ঠিকাদারদের লোক।

খবর পেয়ে শওকত ছুটে এল। আজ যদি গ্রামের লোক বাধা দেয় তা হলে খুনোখুনি হতে পারে। সে হাত জোড় করে ছুটে গেল দারোগার কাছে।

একটু শুনুন হুজুর। এরা সবাই যশাইকে ভালবাসে, ভক্তি করে। ওরা যশাইয়ের গাছ কাটতে দিতে চায় না। আপনারা যদি মাথা গরম করেন তা হলে ভয়ানক রক্তপাত হতে পারে। আপনি একটা দিন সময় আমাকে দিন। আমি ওদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নইলে খুন খারাপি হবে হুজুর।

শ্যামসুন্দর খবর পেয়ে যথা সময়ে এসেছিল। সেও এগিয়ে এসে অনুরোধ করল।

কিন্তু আইন!—দারোগা আইন চেনে।

আইন তো অনেক আছে। বে-আইনী কাজও তো আপনারা হজম করেন হুজুর আপনাদের আইনে ঘর ভাঙ্গা যায়। ঘর গড়া যায় না। আপনাদের আইন

শান্তির নামে অন্যের ঘরে অশান্তি আনে। যে আইন গড়তে পারে না, ভাঙতে পারে, সে আইন বে-আইন। আইন চাই না হুজুর। আইন তো মর্জি, মানুষ তো মর্জির গোলাম নয়। হুজুর আমরা আইন চাই না, আমরা চাই একটা দিন সময়। আমি বুড়ো মানুষ, বেশি কিছু বলার মত আমার জ্ঞান বুদ্ধিও নেই। কাল সকালেই—

কিন্তু আমার ওপর হুকুম আছে।

আইনের হুকুম হুজুর। আল্লার হুকুম নেই। হুকুম আসে কলের চাকা থেকে, মানুষের কলিজা থেকে নয়। আইন উচ্ছেদ করে, ঘর দেয় না। আমাদের এই হতভাগা দেশে ঘর ভাঙলে ঘর দেবার কোন আইন নেই। এ আইন কি আইন ? তবুও হুজুর মনে রাখবেন, এরপর আইন আছে। সে আইনে মানুষ সবার সামনে মানুষ বলেই পরিচয় দিতে পারে। তারা জানোয়ার নয়, তাড়িয়ে দিলে বনবাদারে আশ্রয় নেয় না। আল্লার আইনকে মান্য করুন। এই আমার নিবেদন।

দারোগার বুকে মায়ার প্রলেপ পড়ল। এতগুলো লোকের এই সামান্য আবেদন অগ্রাহ্য করতে না পেরে বলল, বেশ, কালকেই জঙ্গল সাফ করবে। কিন্তু আমাদের পাহারা এইখানে বসবে।

তাই করুন। কিন্তু মাত্র একটা দিন সময় দিন।

সেদিনের মত ঠিকাদারের জনমজুর হাত গুটিয়ে বসে রইল।

শওকত গেল সবার কাছে। বলল, বন্দুকের মুখে প্রতিবাদ জানাবার গুরুতর পরিণতি কি হতে পারে ! কেউ বুঝল, কেউ বুঝল না কিন্তু সবাই বুঝল যশাইয়ের বুকের ওপর দিয়েই নতুন সড়কের পত্তন হবেই। সবাই নিশ্চিত ভাবে জানল দুই শতাধিক বৎসরের হিন্দু-মুসলমানের পীঠস্থান যশাইয়ের থান তাদের চোখের সামনে থেকে চিরকালের জন্য লোপ পাবে। অর্থবহ হলেও কেউ আর সাহস পেল না গোলমালে জড়াতে।

বিকেলের আগেই মাঠ খালি হয়ে গেল।

বাড়িতে ফিরে শওকত জসিমকে ডেকে বলল, আজ রাত বারটা নাগাদ তিনখানা গরুর গাড়ি নিয়ে আসিস।

কেন চাচা ?

তা নাই বা শুনলি।

তেরশ উনষাট সালের এক আঁধারি রাত।

শওকত তার সংসারের সব জিনিসপত্র দুখানা গরুর গাড়িতে বোঝাই দিতে দিতে কেঁদে ফেলল।

জসিম।

জসিম বাড়ি গেছে চাচা। আমি ছিচরণ রয়েছি।

তোর সাথে আর কে আছে ?

আমার পরিবার।

তোর পরিবার কেন ?

যশাইয়ের মাটি অশুদ্ধ হবে। সে মাটিতে আর বাস করব না চাচা। তোমার সঙ্গে চলে যাব। কাল পটলা, নৈমুদ্দিও যাবে।

কোথায় যাবি তোরা ?

যেখানে তুমি যাবে সেখানে। জসিমও আসছে তার মালপত্তর আর বিবি বাচ্চা নিয়ে।

কিন্তু আমার তো যাওয়ার জায়গা কিছু ঠিক নেই বাপ। আমার বাড়ি রইল, রইল কাম্মু। তোদের কি রইবে।

কিছুরই দরকার নেই চাচা। তোমার সঙ্গে যেতে যেতে যেখানে সকাল হবে সেখানেই আমরা ঘর বাঁধব।

শুকতারা আকাশে দেখা দিতেই শওকত বলল, এবার গাড়ি ছেড়ে দে ছিচরণ, জসিম, তোর চাচিকে ভাল করে গাড়িতে বসিয়ে নে।

জসিম বলল, গাড়ি যাবে কোথায় ? পাকিস্তানে ?

পাকিস্তানে ? বলিস কিরে জসিম, যশাই আমাদের স্থান না দিলেও, যশাইয়ের মাটি অভিমানে ছেড়ে এলেও কোন অভিমানে আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাব ? কেন যাব বলতে পারিস। আমরা দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না। ওপারে পদ্মার চরে পাকিস্তান এপারে ভাগীরথীর মোহনায় আমাদের দেশ। আমরা ভাগীরথীর মোহনায় গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধব, ভুলে যাব বাপদাদার যশাইকে। যশাইয়ের মাটি ছাড়তে হবে তা তো কোনদিন ভাবতে পারিনি। যশাই যখন লোপ পাচ্ছে তখন তার মাটির ওপর আর থাকা উচিত নয় ছিচরণ। তাই নতুন করে ঘর বাঁধব।

মাল বোঝাই গাড়িগুলো চলতে আরম্ভ করল। পরীদের গাড়িতে সবে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন সময় এসে দাঁড়াল বড়কর্তা। তার সঙ্গেই বড়কর্ত্রী।

পাগল হ'লি নাকি শওকত ? বলতে বলতে এগিয়ে এল বড়কর্তা।

হইনি কাকা, আর একদিন থাকলে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব।

তোর যাওয়া হবে না। যশাই না থাকলেও যশাইয়ের মাটি তো থাকবে। সেখানে আমরা পাশাপাশি বাস করব। আমরা থাকব আর তুই থাকবি না এতো ঠিক কথা নয়।

না কাকা, যেতে আমাকে হবেই হবে। যে জায়গায় ইনসাফ্ নেই, বিচার নেই সে দেশে বাস করা আর সাপের লেজে পা দেওয়া একই কথা। যেখানে আইন সব সময় চোখ রাঙ্গায় সেখানে বাস করব না। আমি তো দেশ ছেড়ে যাচ্ছি না। শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে যশাই থাকতে থাকতে অন্য জায়গা খুঁজে নিতে বের হয়েছি। এখানে আমি থাকব না, থাকব না।

শওকত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি এখানে থাকব না কাকা। যশাইয়ের ঘাটে ষাটটা বছর কেটে গেল। হিন্দু-মুসলমানের পীঠস্থান যশাইকে অসম্মান কোনদিন কেউ করেনি, কিন্তু এতদিন পর তাই হচ্ছে। আমরা স্বাধীন। হাঁ স্বাধীন বটে। তাই মানুষের মানসিকতাকে অসম্মান করার স্বাধীনতা রয়েছে সরকারের। ভেবে

ছিলাম চুপি চুপি চলে যাব। তা আর হল না। ভালই হল। সরকার বাড়ির অনেক নিমক খেয়েছি সাত পুরুষ ধরে। দেখা না করে গেলে গুনাহ্ হত। তা থেকে বাঁচলাম। নে জসিম, তোর চাচির গাড়ি ছেড়ে দে। হাঁরে ওই গাড়িতে ছিচরণের বউ বাচ্চা উঠেছে তো। বেশ, বেশ।

বড়কর্তা বলল, তা হলে সত্যিই যাবি।

হাঁ কাকা। ঘুণ ধরা ঘর আর মেরামত করব না। আবার নতুন করে সম্বন্ধ পাতিয়ে ঘর বাঁধব। রইল আমার জমিজমা, ঘর দরজা, আর রইল কাম্মু তারা তোমার হেপাজতেই থাকল।

বড়কর্ত্রী শুধু শওকেটা বলেই কেঁদে ফেলল।

বড়কর্তা পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সম্মুখ দিয়ে একে একে গাড়িগুলো অন্ধকারে মিশে গেল।

জসিম আর ছিচরণের হাত ধরে শওকত ধীরে ধীরে এগোতে থাকে গাড়ির পেছন পেছন। অবিচারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে চলল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাহিনী।

যশাইতলা পেরিয়ে সোজা পদ্মার কিনারা বরাবর যাবে তাদের গাড়ি। যশাই-তলায় আসতে আসতেই আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এল, আকাশের পূর্বদিকে লালের আভা। এমন সকাল তো রোজই হয় কিন্তু শওকতের মনে হল এমন সকাল বোধহয় এর আগে কখনও হয়নি। শওকত চোখ কচলে পেছন ফিরে ধলাট গাঁয়ের শেষ সকাল প্রাণভরে দেখল। এমন সকাল আর বোধহয় সে আর কখনও দেখতে পাবে না। যশাইয়ের ঝোপের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছল শওকত। দুই হাত তুলে জসিম আর ছিচরণ শ্রদ্ধা জানাল যশাইকে। চারখানা গরুর গাড়ি চলেছে আগে আগে, পেছনে চলেছে শওকত, জসিম, পটলা আর ছিচরণের দল। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। পুতুল নাচের পুতুলের মত অদৃশ্য সুতোর টানে তারা গ্রাম ছেড়ে চলেছে অজানার পথে।

যশাইতলায় এসে শওকত হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। জসিম তাকে কোনরকমে শান্ত করে পথ পেরোতে থাকে।

শওকত কিছুটা এগিয়ে ফিরে দাঁড়াল। মৌন ব্যথার কোন অভিব্যক্তি নেই, শুধু জসিমকে বলল, আজ বেলা আটটায়—বলেই হাত তুলে সেলাম করল।

যশাইতলার ঘাটের পাটনি শওকত বেপারির শেষ সেলাম যশাইয়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল কিনা কেউ জানে না। দুশ বৎসরের বহু স্মৃতিমাখা যশাইয়ের অপমৃত্যু দেখার জন্য শওকত অপেক্ষা করতে পারে না। পেছনে পড়ে রইল হাজারো স্মৃতি, সব কিছু মন থেকে টেনে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে সবার সঙ্গে এগিয়ে চলল। জীবনের কালো কেতাবের একখানা পৃষ্ঠা সবার অলক্ষ্যে ফেরেস্তা বোধহয় উল্টে দিল।

সতী যশোমতী তলাপাত্রদের ছোট বউ, আসমত চৌধুরীর বিবি নুরী বেগম বাংলার নবাব নাজিম, সব অধ্যায়ের শেষ অধ্যায় যশাইয়ের গায়ে কুঠারের কঠিন আঘাত। ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এই নিষ্ঠুর হননের কথা হয়ত লেখা হবে না।

ভবিষ্যতে মানুষ হয়ত বিস্মৃত হবে যশোমতী আর আসমত চৌধুরীর শোকাবহ পরিণতি। কিন্তু যশাই, তাকে কি ভুলে যাবে সাধারণ মানুষরা।

যশাই তো কয়েকটি জামগাছের সমষ্টি, কুঠারের আঘাতে রক্তপাত ঘটবে না কিন্তু দেশের মানুষের বিশ্বাসের মূলটা চৌচির হবে সভ্যতার অগ্রগতিতে। কেউ কি ক'কিয়ে কে'দে উঠেছিল। কোন শিশু কি আঁতকে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরেছিল—কে জানে!

পদ্মার কিনারা ধরে আসতে আসতে সূর্য অস্ত যাবার আগেই গাড়িগুলো পে'ছিল ভাগীরথীর মোহনায়। গ্রামের নাম ফতুল্লাপুর। এখান থেকেই গঙ্গা দু'ভাগ হয়ে একভাগ পদ্মা নাম বুকে করে এগিয়ে চলেছে মেঘনার দিকে, আরেক ভাগ ভাগীরথী হয়ে ধীর গতিতে এগিয়েছে সাগরের দিকে। সংযোগ স্থলে বালির চর। বর্ষায় ভাগীরথী বহমান গ্রীষ্মে তার বুক শুকনো। এই চরে এসে থামল শওকতের কাফেলা।

এখানে গড়তে হবে আমাদের নতুন উপনিবেশ।

সবাই প্রস্তুত হল।

সামনে গঙ্গার ঘাট। ভাঙা ডিঙি কখানা পড়ে আছে সেই ঘাটে। শওকত বিকেলবেলায় এসে ঘাটে বসে। তাকিয়ে দেখে ভাঙ্গা নৌকাগুলো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সাঁঝের আঁধার নামলে ফিরে আসে তার ছোট্ট খড়ের ছাউনিতে। খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে কেরাসিনের কুপি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে পরীর পাশে।

পরী শওকতের মতিগতি লক্ষ্য করে বিশেষ চিন্তিত কিন্তু শওকতের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রলেপ দেবার মত কোন ওষুধ সে জানে না।

আজও মাঝরাতে পরীকে ডেকে তোলে।

ফিস ফিস করে বলে, দেখতে পাচ্ছিস পরী কত রক্ত। শুধু রক্ত চুইয়ে আসছে যশাইয়ের গা বেয়ে।

কোনদিন চিৎকার করে ওঠে, শুনছিস ওই যে মড়মড়িয়ে যশাইয়ের গাছ ভেঙ্গে পড়ছে। বর্গীর লাঠির খোঁচায় আসমত চৌধুরীর লাশ গড়িয়ে পড়ছে। সতী যশমতী কে'দে উঠছে। উঃ। সহ্য হয় না। শুনতে পাচ্ছিস পরী?

পরী আলগোছে শওকতের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। শওকতকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা সে খুঁজে পায় না।